॥ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭
॥ ৭ই আশ্বিন, ১৩৬৪

॥ প্রচ্ছদ ॥
পূর্ণেন্দু পত্রী

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্ঞানোদয় প্রেস (১২, মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীঅমৃত লাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত ॥

উৎসর্গ

ছায়া দেবীকে

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

নানা পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ যাবৎ আমার অনেক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এগুলি লেখা। এইসব প্রবন্ধ অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত, কিন্তু বিষয় ও সুরের দিক থেকে তাদের মধ্যে একটা সংযোগ এবং বিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করা যায়।

এই কারণে বিভিন্ন পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিল, সেই গুলোকে একত্র করাই আমার উদ্দেশ্য। কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে চিন্তার উদয় হয়েছে এবং সেই সব চিন্তার সূত্রে কি ধরনের প্রতিপাদ্য তৈরী হয়ে উঠেছে, প্রবন্ধগুলির শিরোনামা থেকে তা বোঝা যাবে। তাই বইখানার নাম দিয়েছি 'বক্তব্য'। অর্থাৎ যা বলতে চাই। এখন বক্তব্য যথার্থভাবে ব্যক্ত হয়েছে কি না, তার বিচারের ভার সেই সব পাঠকের উপর, যাঁরা পড়েন এবং ভাবেন।

বইখানা দু'টো স্তবকে ভাগ করা হয়েছে: একটি সমাজ, অপরটি সংস্কৃতি-সংক্রান্ত চিন্তা নিয়ে; তবে বক্তব্যের মধ্যে তিনটি মোটা সূত্র রয়েছে। প্রথমটি ইতিহাস, এবং তারই চারপাশে আরো গুটি কয়েক লেখা দানা বেঁধেছে। দ্বিতীয় সূত্রে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে, এবং তাঁরই সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর সঙ্গীত ও সমাজ-চেতনা নিয়ে, কয়েকটি প্রবন্ধ গড়ে উঠেছে।

শেষ সূত্রটি হল 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' এবং তারই সংক্রান্ত আরো কয়েকটি প্রবন্ধ। প্রথম ও তৃতীয় সূত্র কার্ল্ মার্ক্সের অজুহাতে। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সমাজতত্ত্বকে ঘিরে। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মন্তব্য অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।

'বক্তব্যে' এমন একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে, যা নিয়ে তর্ক বহুদূর চলে। কিন্তু তর্কের সীমা নেই। যেখানে সেটা থেমেছে, সেখানে তাকে থামতে দেওয়াই উচিত। গন্তব্যেরও শেষ নেই। যেটা চলছে, তাকে চলতে দেওয়াই উচিত। প্রবন্ধকে সংশোধিত অথবা পরিবর্ধিত করছি না। শুধু প্রবন্ধের শেষে রচনা-কাল উল্লেখ করলাম।

দেশ ছেড়ে বহুদিন বাইরে রয়েছি, তায় অসুস্থ শরীর। এ অবস্থায়, বই ছাপার সময়ে নিজে দেখতে পারিনি। তাই কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া সম্ভব। তবে 'বক্তব্য' প্রকাশের ব্যাপারে দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলেখক সুশীল জানা এবং আমার ছোট ভাই বিমলাপ্রসাদ অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করেছেন। সেজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রী ছায়া দেবী একাধিক প্রবন্ধের উদ্ধার করেছেন। তাঁকে এ বই উৎসর্গ করলাম।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭
আলিগড়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সমাজ-চিন্তা

নব্য সমাজদর্শনের ভূমিকা ॥ ১ ॥

নব্য ভারতের জন্য বহু জিনিসের প্রয়োজন। নব নব দ্রব্য-সম্ভারের কথাই সকলের মুখে; এটা স্বাভাবিক ও সামাজিক। নতুন আগ্রহ, এমন কি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখও পাওয়া যায়; তবে অল্প পরিমাণে। ইংরেজ তাড়াবার পর কি হবে আমরা ভাবিনি, এবং যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁরা চিন্তা ও যুক্তি অপেক্ষা জাতির অনাহত, অকৃত্রিম, আদিম, সহজাত শক্তির ওপরই আস্থাবান ছিলেন বলে জনসাধারণের সামনে ভবিষ্যৎ ভারতের কোনো রূপ ফোটাতে পারেননি; এটাও স্বাভাবিক কিন্তু অ-সামাজিক। মহাত্মাজীর কল্পিত রূপ ক্ষণিকের জন্য জনসাধারণের না হলেও জনকয়েকের মানসপটে ভেসে উঠেছিল নিশ্চয়, কিন্তু কালো মেঘ পাশেই ছিল, দিল তাকে ঢেকে। সে রূপ সম্বন্ধে একাধিক বই, দেশে সেই অনুযায়ী একাধিক অনুষ্ঠান, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত একাধিক সজ্জন, মহাজন থাকলেও নানা কারণে দেশ তার প্রতি আগ্রহহীন। ভক্তির জোরে ভোট দেওয়া কি সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু দেশ যতদিন পর্যন্ত কর্তাভজার দলে পরিণত না হচ্ছে ততদিন নাম জপের কার্যকারিতা কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। বামমার্গী দলের প্রয়োজন এইখানে। এখনও কিন্তু দেশে বামমার্গের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তার বহর কম। আমরা অনেকেই মার্ক্‌সের ও বিদেশী

মার্ক্স্বাদীদের লেখার সঙ্গে পরিচিত ; আমরা কত রকমেরই না সোশিয়ালিস্ট দল তৈরি করছি, মাতৃভাষায় প্রবন্ধ লিখছি, পড়ছি ; কিন্তু যে পরিমাণে চিন্তার ক্ষিপ্রতা, গভীরতা ও বিশ্লেষণ থাকলে ভারতের গণপ্রধান রূপ জনগণের সামনে প্রকট হতে পারে, তার নিদর্শন মেলা দুর্ঘট। কমিউনিজ্‌ম্ ঘেঁষা সাহিত্যের প্রচার সব চেয়ে বেশী ; কিন্তু সেখানে নতুন তথ্য কিছু থাকলেও তার তত্ত্বকথা ভক্তির আড়ম্বরে চাপা ও তার বিচার যান্ত্রিক। সোশিয়ালিস্ট সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রচনা ভিন্ন অন্যত্র চিন্তার সাক্ষাৎ বড় বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। এই সুযোগেই গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রের জন্মলাভ। এটা হয়তো সুবিধাবাদের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধীবাদীরা বুঝেছেন যে সমাজতন্ত্র বা সোশিয়ালিজ্‌ম্ কথাটি গ্রহণ করাই সঙ্গত ; এবং কংগ্রেসের প্রতি বহু রুষ্ট, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা দেখছেন যে, কার্যকলাপে কংগ্রেস-নীতি থেকে দূরে সরে এলেও গান্ধীজির নাম পরিত্যাগ করা এখনও অ-সমীচীন। কিন্তু আজ পর্যন্ত গান্ধীবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মূলগত পার্থক্যের বিচার হয়নি, কেবল নাম নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। তাই মনে হয় নব্য ভারতের পক্ষে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন নব্য সমাজদর্শন।

ইংরেজীতে যাকে মেটাফিজিক্স (metaphysics) বলা হয় তার সৃষ্টির ভার বিশেষজ্ঞের ওপর ন্যস্ত করলেও দেখা যায় যে সাধারণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতিটাই পরিবর্তনের অনুকূল। ইয়ুরেনীয়াম যুগ লোহা-ইস্পাত যুগের দ্বারে ধাক্কা দিচ্ছে, ভারতবর্ষের আত্মশক্তির পরীক্ষা শুরু হয়েছে, দ্রুতগতিতে কৃষিপ্রধান জীবনযাত্রা যান্ত্রিক সভ্যতার সামনে হঠে যাচ্ছে, সামন্ত শাসন মুমূর্ষুপ্রায়, ধনিকতন্ত্র জাগ্রত ও জীবন্ত, পুরাতন সমাজবিন্যাসের শক্তি হ্রাস পেয়েছে ও সেই সুযোগে নতুন সমাজবিন্যাসের ছায়া পড়ছে জনসাধারণেব মনের পর্দার উপর। অবশ্য, আনুকূল্যের সুযোগ হারাবার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ছড়ানো। বহু জাতি পারিপার্শ্বিকের আহ্বান শুনতে না পেয়ে

চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েই রইল। আবার বহু জাতির পক্ষে ক্ষুদ্র সুবিধার ক্ষীণ কণ্ঠই যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তপ্রাচুর্যে বিভ্রান্ত হওয়া কিংবা তার সাহায্যে নিষ্কাম ধ্যানবিলাস যখন নব্য ভারতের কাম্য নয় তখন জ্ঞানতঃ সামাজিক সুবিধা-সুযোগকে আপন কাজে লাগানো ছাড়া তার অন্য গতি নেই। অন্যথা ভারতবর্ষ স্বাধীনতারূপ স্বপ্ন দেখে পাশ মুড়েই শুয়ে থাকবে। অর্থাৎ আমাদের ভূয়োদর্শন কর্মশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই—এই হল নব্য সমাজদর্শনের প্রথম প্রতিজ্ঞা। কর্মশীলতার যত প্রকার প্রকাশ পশ্চিমী-দর্শনের ইতিহাসে আছে তার বিচারের স্থান অন্যত্র। এখানে মাত্র তার দু'টি মূল তত্ত্বের উল্লেখ সম্ভব: অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষতা ও পরীক্ষা-নির্ভরতা। শ্রুতি স্মৃতি অনুযায়ী কর্মের মধ্যে আদেশ পালনের অংশই বেশি, এবং উদ্যোগ ও স্ব-অধীনতার অংশ কম। কিন্তু নানা কারণে নতুন কর্মপদ্ধতি শীঘ্রই নিত্যকর্ম ও আচারে পরিণত হয়; সেজন্য পরীক্ষার প্রবৃত্তিকে সদা জাগ্রত রাখতেই হয়। সৌভাগ্যের কথা এই যে, বিজ্ঞানপ্রসারের ফলে পরীক্ষাবিমুখতা কিছু কমে আসছে। ওধারে জগৎ এতই জটিল হয়ে পড়ছে যে, পুরাতন আদর্শবাদের কর্মপ্রেরণা এখন আর যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থত্যাগের আবেদন দুর্বল হয়েছে কে না জানে! স্বেচ্ছাসেবক এখন কর্মচারী।

আদর্শবাদের ভিত্তি ভগবানে বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এখনও অক্ষুণ্ণ আছে কি নেই তা প্রমাণসাপেক্ষ। এ বিষয়ে গ্যালপ্ পোল্ নেওয়া যায় না। গির্জায় এখন কম লোক যায় যদি কেউ বলেন তবে তার উত্তরে রাশিয়ার গির্জাভিমুখে যাত্রার উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যাথলিক্ য়ুরোপে, এশিয়ায়, আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় এখনও ভগবানে বিশ্বাস বর্তমান শুনেছি। অতএব ব্যাপারটি সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। তার নিরিখ সমাজের প্রধান ও উগ্র কর্ম-ধারার দ্বারাই বাঁধা সম্ভব। সে কর্মধারাতে বিশ্বাস এতই বর্তমান যে, তাকে ভগবৎবিশ্বাসের মতনই মনে হয়। ঠিক যতটা বিশ্বাসের

ঘনতা মধ্যযুগের সাধু, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুদের (monks and friars) ব্যবহারে ছিল বলে আমরা জানি ঠিক ততটা, কি তার চেয়েও বেশি, একাগ্রচিত্ততা, সুখত্যাগ বর্তমান যুগের ধনিক-সম্প্রদায়ের ব্যবহারে দেখতে পাই। কৃচ্ছ্রসাধন (asceticism) ধনিকতন্ত্রের একটি প্রধান মনোভঙ্গী এবং ঐতিহাসিক মূল। তার প্রথমযুগে দু'টি বিশ্বাসের পার্থক্য ধরা পড়ে না, কারণ ধনীর দল ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মপ্রাণ। ক্রমে ভগবৎবিশ্বাস যতই দুর্বল হতে থাকে ততই বাড়ে দান খয়রাতের পালা। পরে পিঁজরাপোল, মেয়ে হাসপাতাল, মন্দির নির্মাণেও চলে না, বিশ্বাস উব্‌ছে পড়ে গুরু কিংবা কোনো মহামানবের উপর; আরো পরে রক্ষণশীল, রাজকীয় দল, এমন কি গবেষণা-সমিতির উপর পর্যন্ত। মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করে, তাঁর নাম ভাঙিয়ে ধনিকতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি আমাদের দেশে নতুন হলেও অন্যত্র পন্থাটি পুরাতন। ঠিক উক্ত উপায়েই য়ুরোপের ধনিকতন্ত্র গড়ে উঠেছে, এবং তার অজস্র দৃষ্টান্ত হ্বেবার, ট'নি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ মধ্যযুগের শেষ ভাগের ইতিহাস থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু দু'টি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। রিনেসাঁর পর যে রিফর্মেশন য়ুরোপে আসে তার প্রধান কীর্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; এবং তারও পূর্বে যে হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি (accounting) মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য আবিষ্কৃত হয় তার প্রধান ফল, সম্‌বার্ট্‌ যাকে বলেছেন, rational outlook—যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এই দু'টি বস্তুই সনাতন ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতিকূল। আমাদের দেশের ব্যবসা ইংরেজ সর্বনাশ করেছিল বলে, এবং আরো দু' একটি কারণে, প্রথমতঃ শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষত্বের জন্য, আমাদের মধ্যে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছড়িয়ে পড়েনি, এবং ব্যবসায়ী ধর্মবুদ্ধির অর্থাৎ business morality-র প্রসার হয়নি। তবু একপ্রকার প্রটেস্‌ট্যাণ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তারই সংযুক্ত সংস্কার-প্রবৃত্তির সঙ্গে আমাদের ধনিকতন্ত্রের নিবিড় যোগ আছে, যার প্রমাণ বোম্বাই প্রদেশে বেশী চোখে পড়ে। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-

বাদই এখনও এখানে ধনিকতন্ত্রের প্রধান সক্রিয় বিশ্বাস। তাই সোশিয়ালিজ্‌ম্‌-এর ভাবসমুদ্রের প্রতি তার ক্রোধ নিতান্তই ধর্মগত। বলা বাহুল্য, যে প্রকার ধর্মের সাহায্যে ধনিকতন্ত্রের উপকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অভ্যুদয় ও প্রসার হয় তার অন্তরে ভগবানে বিশ্বাস ক্রমেই ক্ষীণ হতে বাধ্য। শেষে যতটুকু বা থাকে তাও লোপ পায় ঐ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর তাড়নায় ; থাকে মাত্র business attitude বা ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী ; অর্থাৎ রাজ্য চালানো হোক ব্যবসায়ীর দ্বারা, ব্যবসায় যে-ভাবে বৃদ্ধি পায় তারই রীতিনীতি অনুযায়ী ইত্যাদি। মহাত্মাজী ও ক্যালভিন চেয়েছিলেন রাষ্ট্র ও ব্যবসায়কে ধর্মপ্রাণ, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে উদ্রিক্ত করতে ; তাঁদেরই নামধারী ভক্তের দল ধীরে ধীরে দাঁড় করালেন রাষ্ট্র ও ধর্মকেও ব্যবসায়ের অঙ্গতে। অবশ্য বিশ্বাস বজায় রইল, কেবল বিশ্বাসের বিষয় বদলাল। ছিল স্বর্গ, পুণ্য, গুণের আদর ; ছিলেন ভগবান ; এল এই পৃথিবী, সুখ, আত্মপ্রত্যয়, সংখ্যাপূজা, কোটির জন্যই কোটি। মহাত্মাজীই ভারতের শেষ ভগবৎবিশ্বাসী নেতা, কেবল ভারতে নয়, সর্বত্রই, এক আফ্রিকা ও বোধ হয় মধ্য-এশিয়া এবং পাকিস্তান ছাড়া। অতএব ভগবানে বিশ্বাস কোনো প্রকার উপযোগী নব্য সমাজদর্শনের ভিত্তি হতে পারে না। সেটা কেবল ব্যক্তির জন্যেই থাকবে মনে হয়।

প্রথম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার বিরোধ আছে। কর্মপ্রবণতার একটা উৎস ভগবানে বিশ্বাস। ইস্‌লাম-ধর্মের প্রসারের হেতু তাই অনেকে বলেন। একাধিক কর্মবীর জীবনের সার্থকতার মূলে ঐ বিশ্বাসের খোঁজ মেলে। মহাত্মাজী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে ব্যাপারটি অত সহজ মনে হয় না। ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনা রূঢ় ও অভদ্র হবে, কারণ, এমন বহু সার্থক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে যাঁরা সমাজের, বৃত্তির, চাকরির শীর্ষস্থানে উঠেছেন উপরওয়ালা ক্ষমতাশালী প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনের সঙ্গে ভক্তি মিশিয়ে। সার্থক জীবনের ফরমূলা হচ্ছে খোসামোদ+দক্ষতা+

ভগবৎবিশ্বাস। খাঁটি ভগবৎবিশ্বাসে কিন্তু মানুষ সংসার পরিত্যাগ করে, কিংবা জড়ভরতের মত যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। ইস্‌লাম-ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে নতুন গবেষণা পড়ে মনে হয় যে সেজন্য আরব-ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজিত জাতির শক্তিহীনতা এবং সেই সময়কার মধ্যপূর্ব, মধ্য-এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আপেক্ষিক অনুন্নতাই প্রধানত দায়ী। তদ্‌ভিন্ন প্রথম যুগের ইস্‌লাম-ধর্মে ভগবৎবিশ্বাস একটু অন্য রকমের ছিল এবং তার সঙ্গে গান্ধীজী কি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের তুলনা হয় না। সে-বিশ্বাসের মালমশলা ছিল খানিকটা ভয়, খানিকটা পৈতৃক শক্তিকেন্দ্রে প্রত্যাবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, খানিকটা মিলেনিয়্যাল (millennial) আশা। বিশেষতঃ মূর্তিপূজার ধর্মের অপেক্ষা ইস্‌লাম-ধর্ম অধিক উন্নত, শান্তি স্থাপনের কাজে অধিক দক্ষ এই প্রকারের সামাজিক ধারণাগুলি। প্রফেটিক (prophetic) ধর্মের ভগবান একরকম বিশ্বাস এবং রিভিল্ড (revealed) ধর্মের ভগবান অন্যপ্রকার বিশ্বাস মানুষের কাছ থেকে আদায় করেন। যীশুখৃষ্ট ও সেণ্টপলের কর্মকাণ্ড বিচার করলেও তাই মনে হয়। হিন্দু ধর্মকে যদি বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে আর্যসভ্যতার বিস্তারের জন্য ভগবানকে আবিষ্কার করতে হয়। অশোক ছিলেন বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার কিছুতেই ঐ কারণে নয়। গুপ্ত-সাম্রাজ্য, হর্ষবর্ধনের রাজ্য প্রভৃতি ভারতবর্ষের গৌরবময় যুগের জন্য যে ভগবৎবিশ্বাসই দায়ী ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। ঈশ্বরের আগমনে ধর্মাচরণের উন্নতি সম্ভবত কেন নিশ্চয়ই হয়েছিল; কিন্তু সে জন্য জ্ঞানে ও কর্মে হিন্দু জাতির সমৃদ্ধি ঘটেছিল বলা যায় কি? কে জোর গলায় বলতে পারে যে বিশ্বাস-প্রধান বৈষ্ণব-দর্শন সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়ের অপেক্ষা বড়! অতএব যদিও কোনো কালে ভগবৎ-বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মশীলতার যোগ থেকেও থাকে এযুগে তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।

হাঁ, পাকিস্তানের উৎপত্তিতে ধর্মের দায়িত্ব ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সঙ্গে ইংরেজের দায়িত্বও কম ছিল না। সে হিসাবে স্বাধীন ভারতেও

ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগ ও তদুপরি ইংরেজের অনিচ্ছাকৃত সাহায্য বর্তমান। আমাদের কল্পিত ভারত-অনুশাসন ধর্মনিরপেক্ষ (secular) হবে যে-মুখে, যে-ক্ষণে—সেই ক্ষণে রামরাজ্য কথাটি পর্যন্ত আমরা শুনতে পাই। এবং রামচন্দ্র ছিলেন ভগবান, খণ্ড নয়, অখণ্ড। তা হলে দাঁড়াল এইঃ স্বাধীন ভারতবর্ষের মূলে ভগবানে বিশ্বাস, পাকিস্তানেরও তাই; অথচ একটির হল ক্ষতি, অন্যটির হল লাভ, যদিও মহাত্মাজীর বিশ্বাস জিন্না সাহেবের বিশ্বাসের চেয়ে অনেকগুণ বেশী ছিল। যে-বিশ্বাসের ফল হয় বিপরীত, অন্ততঃ এই যুগে সেটা বেশী কর্মপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না।

অথচ বিশ্বাসের নিতান্ত প্রয়োজন। বিশ্বাসের ইচ্ছাবৃদ্ধির সামাজিক উপায় আছে, কিন্তু তার আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। কিসে বিশ্বাস, এই প্রশ্নটাই প্রাথমিক। বলা বাহুল্য, মানুষের প্রতি বিশ্বাস। ইতিহাসে দেখি মানুষের প্রতি বিশ্বাস, (মানব-ধর্ম, মানবিকতার) রূপ বহু, এবং তার মধ্যে অন্ততঃ তিনটি রূপের ছটা বেশী। রিনেসাঁ যুগের মানবতার (humanism) তিনটি অঙ্গঃ গ্রীক পরীক্ষাশীলতা, বাণিজ্য প্রসারের ফলে লাভের জন্য ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতা ও খৃষ্টান সভ্যতার উত্তরাধিকার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তার নিষ্পত্তি করলে রিফমেশন দ্বিতীয় অঙ্গের পক্ষে রায় দিয়ে। ফলে 'ব্যক্তি' (individual) জন্মাল য়ুরোপে। ফলটি সু কি কু জানতে আমাদের বাকি নেই। য়ুরোপীয়ান কালচার বলতে আমরা যা বলি তার অধঃপতন আরম্ভ হয় রিনেসাঁ যুগ থেকেই। কালচারের ভিত্তি ব্যক্তিগত কৃষ্টি নয়, community, যাকে হিন্দুরা 'সমাজ' বলেন। Sense of community বা সমাজবোধ নষ্ট হবার পরই শূন্যতা ভরাট করবার জন্য জাতীয়তার (nationalism) প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি যেমন এক, নেশন বা জাতিও তেমনই একটি; ব্যক্তি যেমন লাভের জন্য দুঃসাহসী, জাতিও তেমনই শক্তিপ্রসারে অভিলাষী। জাতি বা নেশন থেকেই ন্যাশনাল স্টেট, কিন্তু সেটা তৈরী হবার সঙ্গেই ব্যক্তিকে সংযত

করার ক্রিয়া চলে, কেন না সমগ্রের ধর্মই তাই। ব্যক্তি আপত্তি জানায় স্বাধীনতার নাম নিয়ে আর রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার প্রয়াসের দ্বারা। এই জন্যই আমরা গণতন্ত্রের ধারণাটির প্রচলনের অব্যবহিত পূর্বেই মার্কেন্টিলিজ্‌ম্‌-এর সাক্ষাৎ পাই। সেই সুরেরই রেশ জনগণের আওয়াজ ভেদ করে আজকালকার সরকারী হুঙ্কারে পরিণত হয়েছে। রিনেসাঁ-হ্যুম্যানিজ্‌মের এই দশা।

॥ পূর্বাশা ॥ ॥ বৈশাখ ॥ ১৩৫৫ ॥

নব্য সমাজদর্শনের ভূমিকা ।। ২ ।।

হ্যুম্যানিজ্‌ম-এর দ্বিতীয় পরিচিত রূপ রুশোর সৃষ্টি। তাঁর কল্পিত মানুষ স্বভাব-সুন্দর। সমাজের প্রাক্‌কালে মানুষ ছিল সহজ, সরল, উদার, মহান; কিন্তু জনকয়েক স্বার্থপর লোকের তাগিদে ও অর্থের প্রয়োজনে সমাজ তৈরী হল এবং সেই থেকে বাধল যত অনর্থ। রুশোর মতে মানুষের আদিম স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, সম্ভব। সেজন্য তিনি গণতন্ত্র ও নব্য শিক্ষা-পদ্ধতির বিধান দিলেন। সামন্ত যুগের সমাজবিন্যাসের কড়া শাসনের বিপক্ষে রোমান্টিক ব্যক্তিস্বাধীনতাই তখনকার দিনের একমাত্র প্রতিবাদ। মাত্র এইদিক থেকে তিনি ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত। কিন্তু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে না। তিনি রিনেসাঁ-রিফর্মেশনের যুগ থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও 'কম্যুনিটি'র যে ভাঙন শুরু হয় তারই ধারা বহন করেন। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে আধিদৈবিকের যোগ ছিল: প্রমাণ সেই শতাব্দীর মিস্টিকদের জীবন, কবিতার প্রতীক ও বিভিন্ন গুহ্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যোগসূত্র আরো ঢিলে হল, অনেকের মতে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে। খানিকটা সত্য বটে; নিউটন, প্যাস্‌কাল প্রভৃতি পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ততঃ শেষ ভাগের বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস তুলনা করলেই বোঝা যায়। সম্ভবত

পরীক্ষাপ্রধান বিজ্ঞান-প্রসারের পিছনে অন্য একটি বিশ্বাস ছিল। মার্কেন্টিলিজ্‌ম-এর বিপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যে বিদ্রোহ মাথা তোলে তার দার্শনিক ভিত্তি আইডিয়ালিজ্‌ম্ বা আদর্শবাদ, বার্কলের নয়, লক্ প্রভৃতির। তার মূল বক্তব্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, অবশ্য ইংরেজী সংবিধান-অনুযায়ী। 'ইংরেজী' এই জন্য যে ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম সামন্তযুগীয় রাষ্ট্র লোপ পায় ও 'ক্লাস স্টেট' গড়ে ওঠে ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নাম ব্যবহার করে। ইংরেজী আদর্শবাদের কল্পিত মানুষ ঠিক 'নোবল্'ও নয় 'স্যাভেজ্' নয়, 'নোবল্ ম্যান'। ইনিই পরে জন হ্যালিফ্যাক্স 'জেণ্টলম্যান' হলেন। য়ুরোপে কিন্তু এই 'জেণ্টলম্যান', প্রত্যয়টি মেলে না; তাই জুল্‌ভার্নে, কনরাড প্রভৃতির নায়ক ইংরেজ। তার কারণ এইঃ য়ুরোপে অভিজাত সম্প্রদায় লোপ পাবার পরে এমন কোনো মধ্য শ্রেণী তৈরী হয়নি যেটি দেশস্থ রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার ফলে রুশো কল্পিত 'নোবল্ স্যাভেজ্'কে ভদ্রজনে পরিণত করতে পারে। ইংলণ্ডের ভদ্রজন ইংরেজ সমাজের মেরুদণ্ড, তাঁদের 'সিভিক' ও 'পলিটিক্যাল' বোধ দেশকে জাগ্রত রাখতো, তাঁদের স্বেচ্ছাসেবার জন্য রাষ্ট্রের উপর চাপ কমেছিল ও গণতন্ত্রের দিকে গতি সংহত, অবরুদ্ধ হয়েছিল। য়ুরোপে কিন্তু 'নোবেল্ স্যাভেজ্' বা গ্রামীণ কৃষিজীবীর আদর্শ মধ্যশ্রেণীর অবর্তমানে, কিংবা অপেক্ষাকৃত অল্প প্রভাবের জন্য বজায় রইল। একধারে লর্ড শাফট্‌স্‌বেরী ও অন্যদিকে বাকুনিন, ক্রপটকিন-এর মত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূদের সমাজবোধের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। রুশোর নোবল্ স্যাভেজ্-এর সন্তান দু'টি, য়ুরোপীয়ান সন্ত্রাসবাদী নিহিলিস্ট ও হিটলার-লুডেনডর্ফ। বর্তমানের অ্যানার্কিজ্‌ম্ ও ফ্যাশিজ্‌ম্ খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই। এখন আমাদের বিবেচ্য কতদূর আমরা এ প্রকারের মানবতা গ্রহণ করব, করতে পারব।

গান্ধী কল্পিত সমাজের আদর্শ-মানব 'নোবল্ স্যাভেজ্'-এর সমগোত্র। মহাত্মাজী নিজে মানুষের 'ইনেট গুডনেস'-এ প্রত্যয়শীল ছিলেন এবং তাঁর অনুমোদিত সত্যাগ্রহের সত্য ভগবান, কিন্তু আগ্রহ

মানুষের সহজাত; মানুষের সহজ, সদ্প্রবৃত্তির উদ্বোধনই তাঁর রাজকীয় আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ জাতি, ধনিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজার 'প্রকৃত' সম্বন্ধ নিরূপণের মূল কথা। প্রতি মানুষ, প্রতি ভারতবাসীর কাছে 'স্যাভেজ্'-এর প্রকৃতিগত সারল্য তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর কল্পিত ও অনুমোদিত সমাজ-গঠনেও পূর্বোক্ত প্রত্যয়ের চিহ্ন বর্তমান। য়ুরোপীয় অ্যানার্কিস্টদের সমাজ-গঠনে দু'টি প্রধান তত্ত্ব ছিল—'ডিসেণ্ট্রালিজেশন' আর 'ফেডারেলিজ্ম্'। প্রথমটি যন্ত্রযুগের ও দ্বিতীয়টি উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া। গান্ধী কল্পিত সমাজ 'ডিসেণ্ট্রালাইজ্ড ইকনমির' উপর প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা জানি; কিন্তু যদিও তাঁর রচনায় ফেডারেলি-জ্মের রূপ সুস্পষ্ট নয় তবু তিনি এতটাই কেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে ছিলেন যে মোটামুটি তাঁকে এক প্রকারের ফেডারেলিস্ট বলা যায়। বলা বাহুল্য, তাঁর ফেডারেলিজ্ম্ জেফার্সনীয় নয়। অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে এর আর একটি মিল কো-অপারেটিভ সমাজের প্রতি আস্থায়। সেটিও ইংরেজী ধরনের নয়, আমাদের দেশের পঞ্চায়েত কিংবা ক্রপটকিনের মনোমত রাশিয়ার 'মীর' সমাজের মতন। এই সহযোগী সমাজও 'নোবল্ স্যাভেজ্'-এরই উপযোগী। (অবশ্য গান্ধীভক্ত শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজ, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্য ধারণা পুষতেন)। এর বেশী বোধ হয় অন্য মিল পাওয়া যাবে না। গরমিলটাই এখন দ্রষ্টব্য।

ব্লাংকি, বাকুনিন, ক্রপটকিন (সরেল্ একটু অন্য ধরনের এনার্কিস্ট) প্রভৃতির 'মর‍্যালিটি' খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু গান্ধী মতবাদের ধর্মজ্ঞান একেবারেই অন্যরকম, কারণ সেটি ভগবৎবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। রুশো, ভলটেয়ারও ভগবান মানতেন, কিন্তু সমাজ-জীবন ও ব্যবহারিক জগৎ থেকে পৃথক রেখে। গান্ধীজীর মতে 'ডিইজ্ম্'-এর দ্বৈতবোধ ছিল না। এর ফল তাঁর জীবন ও নিকটস্থ ভক্তের পক্ষে শুভ হয়। ভগবানই তাঁকে রক্ষা করেন। সেই সঙ্গে হিন্দু সমাজকেও অবশ্য ধরতে হয়। হিন্দু সমাজের মতন বিশুদ্ধ টোট্যালিটেরিয়ান,

'রেজিমেন্টেড' সমাজ পৃথিবীতে নেই। এখানে গর্ভাধান থেকে মৃত্যুর পর ছয় পুরুষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের আসর। এখানকার একমাত্র ব্যক্তি মুক্তপুরুষ—যিনি কর্মফলকে জয় করেছেন। এই সমাজে 'অ্যানার্কিজ্‌ম্‌' অচল, 'নোবল্‌ স্যাভেজ্‌'-এর প্রত্যয় বিরুদ্ধ। প্ল্যানিং-ই এই সমাজের ধর্ম অনুযায়ী। স্টেটের কথা এতদিন অবাস্তর ছিল, কারণ আমাদের ও-বস্তুটি ছিল না, এখন সবে তৈরী হচ্ছে। যতদিন না সেটা পাকাপাকি তৈরী হয় ততদিন অ্যানার্কিস্ট আদর্শের সামাজিক অর্থ নেই। যান্ত্রিক সভ্যতা এসেছে বটে, এখনও তার প্রসার ও প্রভাব এতটা হয়নি যে তার বিপক্ষাচরণ জীবনধর্ম হতে পারে। দেশের নেতৃবৃন্দের আচরণে যান্ত্রিক সভ্যতার সর্বপ্রথম গুণ, অর্থাৎ সময়-জ্ঞান, যদিও এখনও মেলে না, তবু তাঁরা পোষ্যবৃন্দ সমেত হাওয়া-জাহাজে দিল্লী বিলেত পাড়ি দিচ্ছেন। এই হিসাবে তাঁদের মনুষ্যত্ব এখনও অটুট। এখনও প্রতি ভারতবাসী যন্ত্র চায়, যান্ত্রিক সভ্যতায় মুগ্ধ। হেঁটে তীর্থ যাত্রা করতে কোনো গ্রামবাসী, কোনো হিন্দু বিধবাই চান না। হঠাৎ লাঙল ছেড়ে ট্রাক্‌টার ধরতে চাষীরা চায় না বটে, কিন্তু সেজন্য কৃষিবিভাগের অক্ষমতা কি চাষীদের রক্ষণশীলতা দায়ী এখনও তা স্থির হয়নি। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাগার, পরীক্ষা-কেন্দ্র যান্ত্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় কি? অর্থাৎ, যান্ত্রিক সভ্যতার চাহিদা এখনও অশেষ। এই বাস্তব সত্যকে গান্ধীবাদ মানেন তার 'নোবল্‌-স্যাভেজ্‌' বা গ্রামীণ কৃষিজীবী প্রত্যয়ের জন্য: অন্য ভাষায় ও ভাবে, তার আদর্শবাদের জন্য। দুই প্রকার সত্যের—বাস্তব ও আদর্শ সত্যের (মধ্যযুগের 'নেচার অ্যাজ ইট্‌ ইজ' ও 'নেচার অ্যাজ ইট্‌ সুড্‌ বি') মধ্যেকার ফাঁক কিন্তু ভগবান নামে চিরন্তন সত্য ভরাট করতে পারে না এই যুগে। এমন কি ভারতবর্ষেও: তার প্রমাণ মহাত্মাজীর জীবদ্দশায় তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও ইংরেজের সঙ্গে নতুন ব্যবসার বন্দোবস্ত, এবং তাঁর বিশ্বাস ও তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও কালোবাজার, আর তাঁর মৃত্যুর পর-তাঁরই আশীর্বাদ অর্থাৎ 'ডিকন্ট্রোল'-এর এমন অসদ্‌ব্যবহার। গত দু'তিন মাসে

কাপড়ের দাম বৃদ্ধি গান্ধীমতবাদের আভ্যন্তরীণ গলদ চেঁচিয়ে প্রমাণ করছে। 'নোবল্ স্যাভেজ্'-এর 'নোবিলিটি' আর রইল না, থাকল 'স্যাভেজারী'-টুকু। মোদ্দাকথা এই: গান্ধীবাদের মানুষ আপনার আমার পরিচিত মানুষ নয়, অথচ গান্ধীযুগের শক্তিশালী মানুষ আপনার আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। রুশোর কল্পনা, তথা অ্যানার্কিস্ট কল্পনার দোষই এই: সেখানে ইতিহাসের স্পর্শ নেই। অতএব এমন হ্যুম্যানিজ্ম্ চাই যেটি বাস্তব সত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন হ্যুম্যানিজ্ম্ চাই না যার অন্তে নিহিলিজ্ম্—সম্পূর্ণ নেতিবাদ, যার চরম প্রকাশ সন্ত্রাসবাদীর গুলির আওয়াজে, কিংবা থোরোর বনবাসে, টলস্টয়ের পলায়নে, নীটশের মহামানবে, আশ্রমবাসের অদ্ভুত উৎকেন্দ্রিক নিয়ম-বহির্ভূত আচরণে। নব্য সমাজদর্শন একটু পেসিমিস্ট হতে বাধ্য।

কোঁৎ, হ্যারিসন, হিউম, শিলার, জুলিয়ান হাক্সলী প্রভৃতির হ্যুম্যানিজ্ম্ আলোচনা করবার প্রয়োজন যতটা পাঠ্যপুস্তকে আছে এখানে ততটা নেই। প্রকৃত পক্ষে পজিটিভিজ্ম্ ও তার পরবর্তী বৈজ্ঞানিক মানবতা মানুষ-বিহীন মানবধর্ম। ভগবান ও মানুষ উভয়কে পরিত্যাগ করে যে ধর্ম হয় না রবীন্দ্রনাথ চমৎকার দেখিয়েছেন তাঁর চতুরঙ্গে। যদিও ধরা যায় যে তিনি ভুল বুঝেছিলেন, তবু যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের হাতে রাজ্যভার না আসছে ততদিন বৈজ্ঞানিক মানবতা নিরর্থক। বরঞ্চ যা দেখছি তাতে মনে হয় যে, বৈজ্ঞানিক অন্যের উপর রাষ্ট্র কিংবা মনিবদের হাতে দায়িত্ব সঁপে দিতে ব্যস্ত। পৃথিবীতে কোথাও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পলিসি নিয়ন্ত্রণ করেন না। সেদিন একটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল, বহুবাজারের 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স্'-এর বাৎসরিক রিপোর্ট ও আবেদন। কর্তৃপক্ষ ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে ফেলোশিপ চাইছেন। তার শর্ত কি ধরনের হবে লিখতে গিয়ে আমেরিকান মেলন এন্ডাউমেন্ট্-এর শর্ত উদ্ধৃত হয়েছে। একটি শর্ত এই: দাতার মত নিয়ে রিসার্চ ছাপানো হবে, অর্থাৎ মত না দিলে

এমন কোনো রিসার্চ ছাপানো হবে না যার ফলে দাতার ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। মজা এই ঃ এগুলিকে সমান্তরাল আদর্শ গণ্য করা হচ্ছে। যাঁরা করেছেন তাঁরা সকলেই দেশভক্ত, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, স্বাধীনতাপ্রিয়, গবেষণায় শ্রদ্ধাবান, বিজ্ঞানে আস্থাবান, এবং বৈজ্ঞানিকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। হয়তো তাঁদের ধারণা এই ঃ টাকাটা তো প্রথমে আসুক, বিজ্ঞান তো প্রথমে ছড়িয়ে পড়ুক, তারপরে দেখা যাবে ধনিক কতবড় শক্তিশালী। এঁরা বোধ হয় পেটেন্টের বর্তমান অবস্থা ভুলে গেছেন। হয়তো আমেরিকার টাকার সরগরমে এঁরা মুহ্যমান। কিন্তু আমেরিকাতেই একা বেল টেলিফোন সিস্টেম ৩৪০০ অব্যবহৃত পেটেন্ট চেপে রাখলেন একচেটিয়া ব্যবসার মুনাফার জন্য। খবরটি সরকারী ১৯৩৭ সালের ফেডারেল কম্যুনিকেশন্‌স্-এর রিপোর্টে আছে। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল সংখ্যায় 'দি কী টু দি আইস্ বক্স' নামে প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। এই সব কারণেই মনে হয় যে বৈজ্ঞানিকেরা সমাজ-চালনার ও সমাজ-চিন্তার জন্য এখনও অনুপযোগী। এতদূর পর্যন্ত বলা চলে, সমাজবোধহীন বৈজ্ঞানিক-বৃন্দের কাছ থেকে কোনো প্রকার মানবধর্মই প্রত্যাশা করা অন্যায়। এঁদের সঙ্গে আদর্শবাদী দার্শনিকদের কোনো প্রভেদ নেই ঃ যাঁরা সমাজ চালান তাঁরা দু' দলকেই বোকা বানাতে পারেন, চাকর রাখতে পারেন।

যুক্তি এসে পৌঁছেছে ঃ দর্শন চিরন্তন সনাতন নয়, যুগানুযায়ী, যদিও প্রত্যেক যুগোপযোগী দর্শন যুগের প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করতে ব্যগ্র। ভারতের এখন নতুন অবস্থা, যার আহ্বানে সাড়া না দিলে সে মরে যাবে। অতএব নব্য দর্শনের প্রথম প্রতিজ্ঞা কর্মশীলতা, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-সাপেক্ষতা। এতদিন যে দর্শন চালু ছিল তাকে যা নামই দেওয়া হোক না কেন তার মূলে থাকতো ভগবৎবিশ্বাস ; এখন ভগবৎবিশ্বাস সমাজে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে অক্ষম, যদিও সমাজ পরিবর্তনের নতুন শক্তি, ধনিকতন্ত্র, তাকে ব্যবহার করতে,

আত্মরক্ষার জন্য তার রূপ গ্রহণ করতে সদা তৎপর। ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের কীর্তিকলাপ দেখে শুনে মনে হয় সেটি প্রকৃত ভগবৎ-বিশ্বাসের শত্রু। তা ছাড়া, আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হচ্ছে। অথচ বিশ্বাস চাই। মানুষের প্রতি বিশ্বাসই ভগবৎবিশ্বাসের স্থান নিতে পারে। সে বিশ্বাসেরও ভিন্ন রূপ আছে। রিনেসাঁ-রিফর্মেশন যুগের মানুষ ঐ ধনিকতন্ত্রের চাপে ব্যক্তি হল, এবং সেইদিন থেকে য়ুরোপীয় সমাজ গেল ঘুচে। রুশো কল্পিত মানবের পরিণতি নিহিলিস্ট সন্ত্রাসবাদী ও হিটলার। বৈজ্ঞানিক মানবতায় মানব-প্রত্যয় নেই, মানবিকতা কিংবা 'কমন ম্যান' নামে এক অ-বাস্তব বস্তু আছে যার উপর বিশ্বাসের প্রেরণায় সমাজের নতুন রূপ পরিগ্রহ সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায়ের ব্যবহারে সমাজবোধ এখনও প্রসারিত হয়নি, অন্ততঃ আমাদের দেশে। এখন প্রশ্ন হল, তবে কোন মানব-প্রত্যয়? গান্ধী কল্পিত মানব-প্রত্যয়ের গলদ প্রতি ভারতবাসী বুঝতে পেরেছে। তিনি 'ইনেট গুডনেস্' বা স্বভাব ভালোমানুষে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তারই জোরে কণ্ট্রোল তুলে দিলেন। ফল সাদা বাজার, যেটি 'কালোবাজারের' চেয়েও ভয়ঙ্কর। অর্থাৎ নব্য সমাজদর্শনের মানুষ 'নোবল্ স্যাভেজ,' বৈজ্ঞানিক, কিংবা অপরিণত দেবতা হতে পারে না। মানুষ হবে পুরুষ; সে একক ব্যক্তিসত্তা বা ইণ্ডিভিড্যুয়াল হবে না,—হবে 'পার্স্‌ন'।

॥ পূর্বাশা ॥ আষাঢ়-শ্রাবণ ॥ ১৩৫৫ ॥

নব্য সমাজদর্শনের প্রতিজ্ঞা

ব্যক্তিবাদের পরিণতি যদি নিহিলিজ্‌ম্, অর্থাৎ য়ুরোপীয় সামাজিক নেতিবাদ ও নিছক শক্তিপূজা অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ না হতো তবে পুরুষ সংজ্ঞাটির বিশেষ কোনো আবশ্যক থাকতো না। বলা বাহুল্য, যুগোপযোগী পুরুষ-সজ্ঞা সাংখ্যের পুরুষ কিংবা গীতার পুরুষকারের পুরুষ ঠিক নয়। অথচ স্বেচ্ছায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা এবং কর্মচক্র থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ পুরুষকারের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। সেই জন্যই পুরুষ কথাটার ব্যবহার সুপ্রয়োগ। ব্যক্তিবাদের সঙ্গে পুরুষবাদের পার্থক্য কিন্তু অনেক। প্রথম পার্থক্য সমাজ-বন্ধনে। ব্যক্তি সমাজ থেকে ছিন্ন, ভিন্ন, অতএব হয় সে সমাজের শত্রু, না হয় ব্যর্থতা-বোধে সামাজিকতায় আত্মহারা, নৈরাত্মক। এই ভিন্নতা-বোধের প্রথম অবস্থা—একাকিত্ব, যার জন্য দুর্কহাইম্-এর মতে, আত্মহত্যা ও এরিক ফর্ম-এর মতে ফ্যাশিজ্‌ম্। দ্বিতীয় অবস্থা, দায়িত্বহীন সমালোচনা ও অসামাজিক ব্যবহার, যার প্রমাণ কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে, ট্রামে, বাস-এ, চা-এর ও কাপড়ের দোকানে। তৃতীয় অবস্থা, বিরুদ্ধতার জন্যই বিরুদ্ধতা, আইন ফাঁকি দেবার জন্যই ফাঁকি, পুলিসের প্রতি অশ্রদ্ধার জন্যই অশ্রদ্ধা, অর্থাৎ নিয়মকানুনে অবিশ্বাস ও অনিয়মের অভ্যাস। এরই প্রতিফলন দেখি প্ল্যানিং না মানায়, ধনিকতন্ত্রের ও অন্তঃ

রাষ্ট্রনীতির অরাজকতায়। কবিতায় দুর্বোধ্যতা, বৈজ্ঞানিক ও আর্টিস্টের আত্মম্ভরিতা, বিশেষজ্ঞের দম্ভ, এমন কি সমাজ-সংস্কারকের আত্মপ্রসাদ, প্রত্যেকটি ঐ ব্যক্তিবাদের অন্তঃস্থ বৈপরীত্য-বোধের প্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্রের either/or অবয়বটিও তাই থেকে উদ্ভূত। তার জন্য বিজ্ঞানে ও অন্য জ্ঞানে কত সর্বনাশ হয়েছে দেখাবার স্থান নেই। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে either/or-এর ক্ষতির বোঝা দুর্বিসহ। যথা, হয় তুমি আমার বন্ধু, না হয় শত্রু; হয় তুমি রাশিয়ার দলে, না হয় আমেরিকার; হয় তুমি হিন্দুস্থানী, না হয় পাকিস্তানী; হয় তুমি কমিউনিস্ট, না হয় ধনিকের পোষ্যপুত্র; হয় সাহিত্যে 'ক' ও সঙ্গীতে 'খ'-এর ভক্ত, না হয় শত্রু ...... ইত্যাদি। অনেকের মতে এই এরিস্‌টোটেলীয় যুক্তি-পদ্ধতি বুদ্ধির ধর্ম, চিরন্তন সত্য। নিতান্ত সুখের বিষয় যে, আধুনিক গ্রীক-সভ্যতার বিশেষজ্ঞরা পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন যে, এরিস্‌টোটেলীয় তর্ক-শাস্ত্র পতনোন্মুখ গ্রীক-সভ্যতার প্রতিফলন, এবং তার পূর্বে, যখন গ্রীক সমাজ-জীবন ঘন-সম্বন্ধ ছিল তখন, অন্য যুক্তি-পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কেবল তাই নয়, ক্রাবিন্‌স্‌কী নামে একজন পোল মহাপণ্ডিত তাঁর *Science and Sanity* নামে যুগান্তকারী বইএ প্রমাণ করেছেন যে, য়ুরোপীয় জ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয়ে—তিনি প্রায় কুড়িটি বিষয় ধরেছেন—এই এরিস্‌টোটেলীয় ত্র্যবয়ব মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেছে, যার ফলে সমগ্র জগৎ আজ উন্মাদ-আশ্রম। তিনি Non-Aristotelian Society-র সভাপতি। পুরুষবাদে বিপরীতবোধ—versus-sense, নেই। তার পরিবর্তে আছে সংযোগ-বোধ—integral sense. এর যুক্তি প্রধানতঃ ডায়েলেক্‌টিক্‌, অন্ততপক্ষে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর composition, association-এর নিয়মাবলী, যে গুলিকে তিনি সমাজ-বিজ্ঞানের উপযোগী ভেবেছিলেন। অতএব পুরুষবাদের স্বাধীনতা স্ট্যাটিক কনসেপ্ট (static concept) নয়, dynamic—চলন্ত, সক্রিয়। অর্থাৎ বিপক্ষাচরণের স্বাধীনতা আর সহযোগে কাজ করার সঙ্গে মানুষের যে স্বাধীনতা জন্মায় ও অন্যপ্রকার উঁচু ধরনের কর্মে অধিকার

আসে—এই দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। মিল মাত্র পুরুষ ও ব্যক্তির দেহে, মাত্র যে বস্তুটি তবু খানিকটা নিজস্ব ও একান্ত।

সমবায়ী, সংযোগী পুরুষই বাস্তব, ব্যক্তি অবাস্তব। মানুষ সামাজিক জীব, এর অর্থই তাই। সে জন্মায়, জীবন চালায়, মরে সমাজ-বন্ধনের মধ্যে। সমাজ-গণ্ডী বিভিন্ন; প্রাথমিক গণ্ডীতে যাকে প্রাইমারী গ্রুপ (primary group) বলা হয়, জীবন জীবতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও দৈহিক সংযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন গোষ্ঠী। তার পরের গণ্ডীতে, যাকে সেকেণ্ডারী গ্রুপ (secondary group) বলা হয়, মানুষ জীবজগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়। মুক্তিটাই যদি সেকেণ্ডারী গ্রুপ সৃষ্টির একমাত্র ঘটনা হতো তবে তাই থেকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সূত্র টানা যেত। সৌভাগ্যক্রমে সেকেণ্ডারী গ্রুপ গড়ে তোলবার কাজটা থাকে; এবং কাজ আরম্ভ হলেই দেখা যায় নতুন বন্ধন, নতুন নিয়মকানুনের প্রয়োজন। এই চলল, বহু প্রকারের সমবায় মানুষ তৈরি করেছে যার একটি অন্যটি থেকে খোলা অথচ নিয়ম বহির্ভূত নয়। স্বরাজ অর্থে স্বকৃত নিয়মাবলীর অনুবর্তিতা। শৈশবকালে মা-ঠাকুমার নিয়ম প্রায় নিয়তির মতন; প্রৌঢ় বয়সে বিজ্ঞান-সমিতির সভ্যতা প্রায় স্বাধীনতার সামিল। জীবপ্রকৃতির নিয়মাধীনতা থেকে সভ্য জগতের ভদ্র ব্যবহার পর্যন্ত ক্রমেই ইতিহাসে স্বাধীনতার নিদর্শন মাত্র—এক গণ্ডী থেকে অন্য গণ্ডীতে যাবার অদম্য ইচ্ছাটুকু। এইখানে নিয়তিবাদের সীমা, আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও সীমা। পুরুষ দু'টি সীমার মধ্যে পথ হারায় না। ব্যক্তিই ধাঁধায় পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'সীমার মধ্যে অসীম তুমি' প্রভৃতি কবিতার ভাবের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে পুরুষ প্রত্যয়টির অর্থ সহজ।

যে পুরুষবাদ নব্য দর্শনের প্রতিজ্ঞা হবে তাকে কিন্তু অন্য একটি নিকটস্থ পুরুষবাদ থেকে ভিন্ন রাখতে হবে। একপ্রকার অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস আছে যেখানে মৃত্যুর পরও ব্যক্তিত্ব বা personality-র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। আত্মীয়ের মৃত্যুর পর এই প্রকার স্বীকার হয়তো

স্বাভাবিক, কিন্তু তার উল্লেখ এখানে হচ্ছে না। খৃষ্টান ধর্মের ব্যক্তিত্বের কথা বলছি। যীশুর জীবনাদর্শে পুরুষত্ব খাড়া করা, কিংবা তাঁর মাধ্যমে পরমপিতার প্রিয় হওয়া আজ অচল। পূর্বে লর্ড শাফট্‌স্‌বেরির নাম করা হয়েছে। তিনি ছিলেন 'টোরি', ধর্মপ্রাণ, খৃষ্টান শ্রমিকদের স্বপক্ষে ইংরেজী আইনের তিনি ছিলেন বিধাতা। যিনি তাঁর জীবনী পড়েছেন তিনিই জানেন যে, তাঁর সংস্কার-প্রবৃত্তির উৎসে না ছিল ধনিকের প্রতি হিংসা, না ছিল শ্রমিকের প্রতি প্রেম, ছিল কেবল যীশুখৃষ্টের আদর্শ। সে আদর্শের ফলে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। অর্থাৎ, খৃষ্টান ধর্মের করুণায় (grace) নির্যাতিতের ক্ষত শুকোয়, কিন্তু তার সাহায্যে কেবল স্কন্ধ থেকে নামাটি হয় না। আজ অনেক ক্যাথলিক প্রায় সোশিয়ালিস্ট হয়েছেন, লাল ডীনের নাম অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু ফ্রান্সে এঁদের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে। স্বর্গ থেকে পতনই যদি মানবেতিহাসের আদি ও স্বর্গে গমনই যদি তার শেষ পর্ব হয় তবে মানব-সৃষ্ট ইতিহাস পার্শি থিয়েটারের মহাভারত নাটকের দু'টি অঙ্কের মধ্যেকার প্রহসন, তামাসা, ভাঁড়ামি ছাড়া অন্য কিছু বলে গণ্য হতে পারে না। পুরুষের কর্মশীলতায় আর কিছু থাক আর না থাক মর্যাদা থাকা চাই। ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদাজ্ঞান নেই। একাধিক খৃষ্টান পণ্ডিত অবশ্য খৃষ্টানি পুরুষবাদে একটা ট্র্যাজিক মর্যাদা পেয়েছেন। কিন্তু আজ যে একটি খৃষ্টান জাতি পৃথিবীর উপর সর্দারি করছেন তার বিচার-বুদ্ধি, পুরুষত্বের নমুনা দেখলে মাতাল ভাঁড়ের কথাই মনে আসে। তার অজানিতে তার ব্যক্তিত্ববাদের ফলে সমগ্র বিশ্বের যে ক্ষতি হবে সেইটেই হবে সত্যকারের ট্রাজেডী। তার সঙ্গে খৃষ্টান পণ্ডিত বর্ণিত খৃষ্টান পুরুষের 'tragic sense of being in Christ on the cross'-এর কোনো প্রকার আত্মীয়তা নেই।

আরেক প্রকার পুরুষবাদকেও এড়িয়ে যেতে হবে। আদিম, অসভ্য, বর্বর জাতি শত্রু মিত্রকে পার্সোনেলাইজ (personalise) করতো। শক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক ভাববার জন্য যতটা মননের উন্নতি

দরকার ততটা উন্নতি তাদের হয়নি; কিংবা হয়তো তাদের যুক্তিধারা অন্যরকমের ছিল। যে কারণেই হোক, বাহ্য শক্তিকে মানুষে পরিণত করার অভ্যাস বর্বরতার একটি সাধারণ গুণ। আচার ব্যবহারের ছকে গুণটি বাঁধা পড়ে। ফলে সমাজবিন্যাস শুরু হয়। নেতা, পুরোহিত, চারণ প্রভৃতি উপরকার শ্রেণী—এঁরা শক্তিকে মানুষ ভাবতে ও ভাবাতে পটু—এবং নিম্নশ্রেণী—এঁরা হলেন বাকি সব লোক যাঁরা প্রাকৃতিক শক্তির সম্মুখীন হতে অক্ষম, এই দু'টি ভাগে সমাজ আদিকাল থেকেই বিভক্ত। কিন্তু সমাজ-প্রথা গঠনের জন্য 'ঈশ্বরে মনুষ্যরূপ আরোপ' বা anthropomorphism-এর প্রতি আমরা যতই কৃতজ্ঞ হই না কেন আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে, সমাজের পূর্বোক্ত দু'টি শ্রেণীকে চিরন্তন রাখবার জন্য অর্থাৎ সমাজ-বন্ধনের জন্য, ঐ 'ঈশ্বরে মনুষ্যরূপ আরোপ করা' বা এ্যানথ্রোপোমরফিজ্‌ম্‌ই দায়ী। নেতা থেকে নেতৃত্ব, শামান জাদুকর থেকে পৌরহিত্য, চারণ থেকে সভা-কবি প্রভৃতি অনুষ্ঠান যখন সৃষ্ট হল, তখন অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ শক্তি, অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে কিংবা ভয় থেকে বাঁচিয়ে কাজ চালানো ও সেই কাজকেই উত্তম ও চিরন্তন সত্য প্রতিপন্ন করার শক্তি মানবিক সম্বন্ধে কেবল ঢাকাই পড়ল, পরিবর্তিত হল না। এ্যানথ্রোপোমর-ফিজ্‌ম্‌-এর দৃষ্টান্ত দিলেই ভয় বস্তুটির সাক্ষাৎ মিলবে। সব চেয়ে মধুর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাঁর *Personality* বইখানিতে। তিনি বলেছেন, আজ আমরা দেব-দেবীকে ঘরোয়া, আত্মীয় করে নিয়েছি: দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে, তিনি বাপের বাড়ি আসেন আবার শ্বশুর বাড়ি যান, যথা আগমনী বিজয়ার গান ইত্যাদি। এই 'আমরা' কেবল বাঙালী, ভারতবাসী, না বিশ্বের প্রত্যেক পূর্বতন জাতি—এ প্রশ্নটি না তুলে ঐ প্রকার মানবীকরণ প্রক্রিয়ারই অন্য একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। বসন্তের জন্য মা শীতলা, কলেরার জন্য ওলা দেবীর কথাই আজ মনে উঠছে। শীতলাকে যখন মা, ও ওলাকে যখন দেবী বলা হচ্ছে, যেমন বঙ্গরমণীকে বলা হয়, তখন তাঁরা নিশ্চয় মানবীকৃত হয়েছেন; এবং বসন্ত ও কলেরার শক্তি এতই প্রচুর ও ভয়ঙ্কর যে

আজও পর্যন্ত কলকাতা করপোরেশনের মত প্রতিষ্ঠানও তাদের বাগে আনতে পারছেন না। এখন যদি কোনো উড়িয়া ঠাকুর মা শীতলা কি ওলা দেবীকে নিয়ে বাড়ির দরজায় হাজির হন তখন ঐ হুম্যানাইজ্‌ড্‌ বা মানবীকৃত শক্তির পূজার জন্য চারটি পয়সা দিতে আধুনিক গৃহিণীরাও কার্পণ্য করেন না। ভাবেন, না দিলে কি জানি বেবু-মার কি হয়। মা দুর্গাকে আমরা সাদরে আহ্বান করি নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর সাদর-অভ্যর্থনা না হলে গৃহের অকল্যাণ হবে—এ ভয়টিও থাকে। মহাত্মাজীর জীবদ্দশায় তাঁর অতি বড় ভক্তরাও তাঁকে ভয় পেতেন, পাছে কোনো কাজ মতবিরুদ্ধ হয়। কারণ তিনি ছিলেন ভারতের কল্যাণ ও স্বাধীনতার 'মূর্তি'। বহুলোকে মনে মনে তাঁর প্রদর্শিত পন্থার সমালোচনা করেছে, কিন্তু কাজের সময় সেই পথ ছাড়া অন্য পথে যাবার সাহস পাননি। বহুবার তিনি কংগ্রেস সমিতিকে এমন কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন ও যার গুরুতর বিপক্ষাচরণ উঠলেই বলেছেন, "তোমাদের ইচ্ছা, যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি যা ভাল বুঝি তাই আমাকে করতে দাও। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও"; এই প্রকার আচরণ ও প্রায়োপবাস, অনশন প্রভৃতিকে অনেক ভক্তরাও পিস্তল মুখিয়ে ধরার সঙ্গে তুলনা করতেন। তবু তাঁর কথাই খাটতো, কেন না তাঁর অবাধ্যতা অন্যায় হবে, কারণ তিনি কল্যাণ-মূর্তি। মূর্তিটিকে যেমন লোকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো তেমনই তাকে ভয়ও পেত। অমন প্রেমের অবতারের সম্বন্ধেও যদি আমাদের দিক থেকে ভয় আসে তবে অন্যে পরে কা কথা। তাঁর উপদেশ মেনে আমরা প্রায় স্বাধীন হয়েছি, অতএব কল্যাণ-মূর্তির প্রত্যয়ে উপকার নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু মূর্তি পূজার জন্য স্বাধীন চিন্তার অবসর মেলেনি এ কথাটাও মানতে হবে। নচেৎ, জওহরলাল পর্যন্ত স্বীকার করতেন না 'we have been taken unawares'—তাও একবার দু'বার নয়, বহুবার; নচেৎ গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র নামে 'সোনার পাথর বাটি' বাজারে সোনার তাল বলে চলতো না; নচেৎ বামমার্গী যে কোনো দলকে খোঁচা দেওয়া, ঘৃণার্হ ভাবা বিশুদ্ধ

দেশ-ভক্তির চিহ্ন হতো না। এ্যানথ্রোপোমরফিজ্‌ম্‌-এর মানুষ মানবধর্মের মানুষ নয়। তার মানুষ সাধারণ্যের শক্তিকে না বুঝতে পারার ফল; তার মানুষ রক্তমাংসের নয়, প্রেতাত্মার শরীর ধারণ। সেটা মানব-সভ্যতার অঙ্গ নিশ্চয়, কিন্তু ডাক্তারেরা এপেন্‌ডিক্‌স্‌টাকেও অঙ্গ ধরেন, তবে বর্তমান দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে। সমাজদেহের পেরিটনাইটিস্‌ কিছু কাম্য নয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, পুরুষ প্রাইমারী গ্রুপে জন্মে তাকে অতিক্রম করে। তার পরিমণ্ডলের অন্ত নেই। গোত্র, গোষ্ঠী (clan, tribe) প্রভৃতির মধ্যে বদ্ধ থাকা তার পক্ষে অসহ্য, কারণ এই প্রকার গণ্ডীও তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে। তবে মরা-বাঁচার উপর সেগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে না। তার মর্যাদামণ্ডলীর সংখ্যাবৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধিও যুদ্ধজয়ের জন্য। পুরুষ তাই বৃহত্তর সঙ্গ, সহবাস, সহযোগ, সমবায় সৃষ্টি করতে চায় যেখানে তার মনুষ্যত্বের মান যাচাই হতে পারে। এই ক্রমাগত অতিক্রমের ইচ্ছা পুরুষকারের প্রকৃত পরিচয়; এবং এটা হিন্দু গোষ্ঠীর heteronomons ব্যক্তিত্ব ও য়ুরো-আমেরিকান সমাজের অসামাজিক a-nomons ব্যক্তিত্ব, উভয় থেকেই পৃথক; কারণ এটি autonomous, স্ব-অধীন। এবং ঠিক এ কারণেই পুরুষ যেমন অধিকার অর্জনে তৎপর তেমনই দায়িত্ববোধে কর্মী ও জ্ঞানী। পুরুষের আশ্রয়েই অধিকার-দায়িত্ব একত্রিত হয়। একটি বৃত্তের অধিকার অন্য বৃত্তের দায়িত্বে তখনই রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব যখন ব্যক্তি বনাম সমাজ কি রাষ্ট্র প্রভৃতি দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সমাজ-সংযুক্ত মানুষ সমাজ-পরিধিকে ক্রম-বর্ধমান করে তোলে। অতিক্রমশীল সামাজিক মানুষের কাছে অধিকার-দায়িত্বের অ-বাস্তব বিরোধ নেই।

আর একটি বিরোধও সমন্বিত হয় পুরুষবাদে। ঐতিহ্য ও পরীক্ষার দ্বন্দ্বের কথা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, বিজ্ঞানে ছড়াছড়ি। যতক্ষণ মানুষ অ-সামাজিক, অ-বাস্তব, অ-বিশেষ মানব-কণা মাত্র ততক্ষণ এ বিরোধের অর্থ আছে। লোকের ধারণা, যে ঐতিহ্য মানে সেই রক্ষণশীল, আর যে পরীক্ষা করে সেই প্রগতিশীল। কেবল তাই নয়,

লোকে ভাবে হয় তুমি এটি না হয় তুমি অন্যটি, এবং এটি-ওটি চির শত্রু। এ সেই either/or যুক্তি। কিন্তু পুরুষ জন্মায় ঐতিহ্যের গর্ভে, এবং কর্মের জোরে বেরিয়ে আসে জীবনের পরীক্ষাগারে। একই মানুষ ঐতিহ্যের ভার বহন করে আগুয়ান হয়, কখনও ভার কমায়, কখনও আবার নতুন ভার গ্রহণে ভয় পায় না। এই প্রকার নির্বাচিত নিরবচ্ছিন্নতা, এই ক্রমশঃ-প্রকাশ্যতাই পুরুষের একমাত্র স্বাধীনতা। য়ুরোপীয় সোশিয়ালিস্টরা যখন পশ্চিমী ডিমক্রাসীর অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধরেন তখন তবু খানিকটা বোঝা যায়, কেন না 'ব্যক্তি' প্রত্যয়টি য়ুরোপীয়ান জ্ঞান ও কর্মধারা থেকে উঠেছে, কিন্তু ভারতীয় সোশিয়ালিস্টের পক্ষে গণতান্ত্রিক সোশিয়ালিজ্ম্-এর (democratic socialism) সঙ্গে অন্য প্রকার সোশিয়ালিজ্ম্-এর পার্থক্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতায়, এ কথা বলা অ-যৌক্তিক। ভারতীয় সমাজ যতই ভেঙে পড়ুক না কেন সেটি এখনও অসংলগ্ন, ব্যক্তিকণার জঞ্জাল হয়নি। তার আচার-ব্যবহারে, তার সমাজরীতিতে, তার দৃষ্টিভঙ্গীতে এখনও এমন একটি মানব প্রত্যয়ের আভাস মেলে যেটি ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা পুরুষ-তত্ত্বের অনুকূল। হিন্দু সমাজ—মুসলমান সমাজকেও ধরা যায়—পুরুষত্বের বাধা দেয়নি বলছি না—তা যদি হতো তবে কোনো দুঃখই ছিল না। তবে যদি এমন কোনো মনোনয়ন আমাদের করতেই হয়, য়ুরোপীয় সভ্যতার খণ্ড-বিখণ্ডিত, অবরোহী নির্ণয়-সিদ্ধ ভাসমান, শিকড়-ছেঁড়া ও সে হিসেবে স্বাধীন, ব্যক্তি-প্রত্যয় গ্রহণ করব, কিংবা ভারতীয় সভ্যতার এখনও অখণ্ড, জমাট বদ্ধ—concrete, এবং সে হিসেবে আচার ও নিয়মাধীন মানুষকে দিয়ে নব্য সমাজের গোড়া পত্তন করব, তখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে অগ্রসর হতে পারি। আমাদের কেবল দেখতে হবে দ্বিতীয়, তৃতীয় মণ্ডলের সামাজিক দায়িত্ব পরের মণ্ডলীর অধিকারে বাধা দিচ্ছে কি না। আমাদের সমাজের বৃহত্তম মণ্ডলী হল জাতি (caste); তার অতিরিক্ত যে মণ্ডলী আছে সেটি মৃত ব্যক্তির আত্মার—অবশ্য এটিও জাতির বর্ণালী। সবশেষে আছেন

লোকাতিরিক্ত ব্রহ্ম। তাকে মণ্ডলী বলা যায় না। মধ্যেকার মণ্ডলীর মধ্যে আছে কেবল দার্শনিক ও সন্ন্যাসীর দল যাদের কুম্ভ-মেলায় নিয়মিত মিলন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অত্যাশ্চর্য সামাজিক ঘটনা। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতীয় সমাজে অন্য মধ্যস্থিত গ্রুপ তৈরী হয়েছে, যেমন আর্থিক শ্রেণী, যার আভাস হয়তো পুরাতন ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, কিন্তু যার স্পষ্ট প্রকাশ মাত্র এই কয় বৎসরের ঘটনায়। এদের অগ্রাহ্য করে কোনো নব্য সমাজদর্শন তৈরি করা যায় না। তবে পুরুষতত্ত্বের প্রথম কথাটি ভুললে চলবে না; শ্রেণীকেও খোলা রাখতে হবে। মুক্তশ্রেণীই প্রকৃত ডিমক্রাটিক বা গণতান্ত্রিক সমাজ, এবং সেই সমাজেই পুরুষত্ব পূর্ণ হয়। তার রূপ কি হবে পরে জ্যোতিষীরাই বলতে পারেন। আমি যতটা মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্ বুঝেছি তাইতে আমার ধারণা হয়েছে এই যে, এই প্রকার পুরুষতত্ত্বই তাঁদের মনের কথা ছিল।

॥ ক্রান্তি ॥ আশ্বিন ॥ ১৩৫৫ ॥

মার্ক্‌স্‌বাদ ও মনুষ্যধর্ম

মার্ক্‌স্‌বাদের বিপক্ষে একটা বড় ও সাধারণ আপত্তি এই যে, তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অনেকেই এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন। জবাবের মধ্যে দু'টি কথা সকলেই অবশ্য মানতে বাধ্য : (১) ধনতন্ত্রের দাপটে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ব্যক্তিত্ব খুইয়েছে, অতএব ধনতন্ত্র না গেলে ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের অবকাশই মিলবে না ; এবং (২) এই সমাজে মাত্র যে জনকয়েকের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের সুবিধা ঘটেছে, তাদের জীবনেও সেই সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার হয়নি। প্রমাণ-স্বরূপ প্রত্যেক শ্রমিক ও 'ব্যাবিট্'-শ্রেণীর অপরিণত জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়া, অন্য স্তরের লোকেরাও প্রাণ ধারণে এত ব্যস্ত, আর্থিক শোষণে এতই ক্লান্ত যে ব্যক্তিত্ব তাদের পক্ষে গল্প মাত্র, ফুটিয়ে তোলা তো দূরের কথা। শিক্ষক-সম্প্রদায়, আর্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীরই আজ এই দশা। তবু এই ধরনের উত্তর নঙর্থক, কারণ ধনতন্ত্রে মানুষ ছোট হচ্ছে মানলেই মার্ক্‌স্‌-পছন্দ সমাজে মনুষ্যত্ব ফুটবেই ফুটবে বলা যায় না। এইখানেই রাশিয়ার ঝগড়া ওঠে। কেউ বলছেন সেখানে মানুষ যাঁতা কলে পিষে মরছে, আবার কেউ বলছেন সেখানে মানুষ সব অতিমানুষ হয়ে উঠেছে। ওদেশে যখন যাইনি তখন মাত্র এইটুকু মানবো যে সেখানকার মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরাও আত্মবিশ্বাসী।

দু'টোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে; তবে মনে হয় যে তার ইঙ্গিত পূর্বোক্ত মার্ক্সিজ্ম্-এর স্বপক্ষে জবাবদিহির মধ্যে নেই।

অন্য উত্তর চাই। ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখলে মন্দ হয় না। মানুষের সভ্যতায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে বহুবার তার সঙ্গে প্রকৃতির ও সমষ্টির বিবাদ বেধেছে। আদিম তথাকথিত অসভ্য জাতির মধ্যে সর্বদা দেখি বিশ্বতত্ত্ব বা cosmology-র পাশে একটা নৃতত্ত্ব বা anthropology রয়েছে। দৃশ্য ও অদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির সঙ্গে আদিম মানুষ প্রশ্ন করছে তার নিজের উৎপত্তি কি ও কোথায়? প্রথমে দেখি ভুতুড়ে ব্যাখ্যা আসছে, পরে মাইথলজি (mythology) সৃষ্টি হচ্ছে। তাই থেকে ধর্ম উঠল; এবং ধর্ম পুরাণকে নষ্ট না করে তাকে পুষতে লাগল। ফলে যেটা ছিল মাত্র জানবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এখন সেটা হল 'মানুষ কী'—সেই জ্ঞানেরই কর্তব্যবোধ। এই মন ঘুরে যাবার পর থেকেই মানুষ সমগ্র প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, অর্থাৎ সমষ্টি থেকে বিচ্যুত হল। এতদিন প্রকৃতি ছিল নৈর্ব্যক্তিক সমগ্র ও সুনিশ্চিত, মানুষের পৃথক সত্তাই ছিল না; কিন্তু আত্মজ্ঞানের তাগিদে বহির্জগতের সূত্র গেল ছিঁড়ে, আর বেড়ে চলল প্রশ্ন আর সন্দেহ। বর্তমান সভ্যতার কত গোড়ায় এই আত্মজ্ঞান ও সন্দেহ শুরু হয়েছে দেখলে আশ্চর্য লাগে। এই থেকেই 'মনুষ্যধর্মের' আরম্ভ। দর্শনের ইতিহাসে দেখি—"Scepticism has very often been simply the counterpart of a *resolute humansim.* By the denial and destruction of the objective certainty of the external world the sceptic hopes to throw all the thoughts of man upon his own being." —(Cassirer—*What is Man ?*) এই scepticism—সন্দেহ-বাদের সঙ্গে মার্ক্সীয় তত্ত্ববিচারের সম্বন্ধ আছে, যদিও মার্ক্স্বাদের অন্যান্য প্রত্যয়ে সেটা ঢাকা পড়ে। সন্দেহবাদ ও আত্মজ্ঞানের পর্ব অনেকদিন চলে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জুডা, ইস্লাম ধর্ম সে-পর্বের এক একটি অধ্যায়। লাভ হয়েছিল এই যে, মানুষ যে বিশ্বের কেন্দ্র একথা

সে ভুলতে পারেনি। কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর; নিজের উপর অতটা আস্থা থাকার দরুণ বাইরের অস্তিত্বটাই লোপ পেতে বসেছিল। অর্থাৎ, প্রকৃতি-সমষ্টি পরিণত হয়ে গেল ব্যক্তি-বিন্দুতে। প্রতিক্রিয়া এল কোপার্নিকান ও কার্টেসিয়ান চিন্তা-পদ্ধতিতে। অনন্ত বিশ্বের প্রেক্ষিতে মানুষ আবার পেল ভয়। মানুষ গেল কুঁকড়ে, ছোট হয়ে। রিনেসাঁ যুগের এই দিকটা ঐতিহাসিকরা বড় বেশী দেখাননি, তাঁরা হ্যামলেটের মানব-অর্চনা উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত। মনটেন লিখছেন: Can anything be imagined so ridiculous, that this miserable and wretched creature, who is not so much as master of himself, but subject to the injuries of all things, should call himself master and emperor of the world, of which he has not power to know the least part, much less to command the whole ?" (এটা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে; তখন ভারতবর্ষে সাধুসন্তের কৃপায় মানবধর্মের জোয়ার বইছে। আমাদের চিন্তা ও কর্মে কোপার্নিকান কিংবা কার্টেসিয়ান সীস্টেমের মতন অবিশেষ প্রকৃতি-ধর্মের প্রচার হয়নি। তার ফল বিচারের স্থান অন্যত্র।)

এইবার প্রশ্ন উঠল—প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মানুষ কি করে মুক্ত হবে; যদি মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ হয়, তবে প্রকৃতির নিয়মাবলী থেকে মানুষের নিয়মাবলী, অর্থাৎ সমাজ, ইতিহাস, রাষ্ট্রের, পরিশীলন, আচার-ব্যবহারের নিয়মকানুন কি ভাবে ও কতটা বিভিন্ন? কোপার্নিকাস্, ডেকার্ট-এর চিন্তাধারায় মানুষ গণিতশাস্ত্রে শাসিত, কারণ প্রকৃতির মর্ম সংখ্যার হাতে। কিন্তু এই গণিতশাস্ত্রই মানুষকে তার পূর্বতন স্থানে ফিরিয়ে আনলে। অসীম বা infinite-এর বিচারে দেখা গেল যে মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধির জোরে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং সে প্রকৃতির প্রতিবেশ এই পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নয়, গ্রহনক্ষত্র আকাশ প্রসারী। অতএব, অঙ্কশাস্ত্র ও তার অধীনস্থ সর্বপ্রকার বিদ্যার সাহায্যে মানুষ আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার সুযোগ পেলে। ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। উনবিংশ

শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চলেছিল. মানব-সংক্রান্ত সমগ্র ঘটনাকে অঙ্কশাস্ত্রে পরিণত করতে—বাক্‌ল, ফেক্‌নার থেকে সলভে, এজ্‌ওয়ার্থ-এর দৃষ্টান্ত সকলেরই মনে পড়বে।

কিন্তু গণিতবিদ্যার সাধারণত্ব ও অবরোহী-পদ্ধতির বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াল জীববিদ্যা—biology। ডারুইনের কৃপায় আরোহী যুক্তি-পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ প্রসারিত হল। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে থেকেই রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছিল। জীবতত্ত্বের প্রচারে মানুষ প্রথমেই অবশ্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি ; বরঞ্চ মানুষ আরো পরাধীন হয়ে পড়েছিল, যেমন কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্‌সার, শাফ্‌ল প্রভৃতির সমাজতত্ত্বে। ট্যেন এক জায়গায় লিখছেন, ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের ইতিহাস তিনি লিখবেন 'metamorphosis of an insect' হিসেবে। তবুও ফল বিপরীত হল দু' দিক থেকে : (১) জীবতত্ত্বের বিচারে একটা জীবনস্রোতের সন্ধান মিলল, যার জোরে মানুষ ক্রমশঃ নিজের চেষ্টায় প্রতিবেশ বদলে অন্য জীবের অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হয়েছে মনে হল কিংবা দেখা গেল। এবং (২) এই উন্নতির ইতিহাস একটি অদৃশ্য উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে বলে ধারণা জন্মাল। ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন থেকে আজ পর্যন্ত যতটা উন্নতিবাদের চলন হয়েছে তার মূলে ছিল ঐ উদ্দেশ্যবাদ, ঐ মানুষের প্রতি আস্থা, তার বর্তমানে গৌরব ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস। উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদই হল আমাদের পরিচিত মানব-ধর্মের প্রাণবস্তু। গণিতের কবলে থাকলে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারতো না। (ক্যাসিরার এই উন্নতিবাদের ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। এর খবর ক্রিস্‌টোফার ডসন দিয়েছেন চমৎকার।) একবার পথ যেই খুলল, অমনই মানুষ-সংক্রান্ত যত প্রকার বিদ্যা আছে সব এগিয়ে চলল। মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, কেউ পড়ে রইল না।

কিন্তু নতুন বিপদ এল। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই দু' নৌকোয় পা ; কিছুদূর অগ্রসর হলেই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের গহ্বরে, আবার না

এগুলো কেবল বর্ণনার জঞ্জাল জড়ো করা। সেই পুরাতন তর্ক, সাধারণ বড় না বিশেষ বড়? সাধারণকে মানলে মানুষের ইতিহাস হয় অঙ্কের অধীন, না হয় 'ন্যাচারাল হিস্‌ট্রি'; আবার বিশেষকে স্বীকার করলে কোনো নিয়মই খাড়া করা যায় না, কোনো কাজই সম্ভব হয় না, কোনো কিছু বোঝাই যায় না। জনকয়েক ঐতিহাসিক বললেন, ইতিহাস বিজ্ঞানের মতন করেই লিখতে হবে; যেমন র‍্যাঙ্কে; আবার কেউ বল্লেন, ইতিহাস সাহিত্যের অঙ্গ, যেমন কার্লাইল। অবশ্য লেখবার বেলা কেউই নিজের মতানুসারে চললেন না। আর একটি বিপদ ঘটল এই যে, প্রত্যেক মানুষ-সংক্রান্ত বিদ্যাই নিজের নিজের নিয়ম তৈরি করে দাবি জানালে যে সেইটাই একমাত্র নিয়ম, অন্য কোনো নিয়ম মানুষের বেলা খাটে না। এই বিভিন্ন দাবির উৎপাতে সেই পুরাতন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গড়া মূল-পত্তন গেল ভেঙে। আজও সেজন্য হা হুতাশ শুনতে পাই, যেমন ক্যাসিরার—*An Essay on Man*, পৃঃ ২১, ২২।

কিন্তু আমার মতে দুঃখের অতটা কারণ নেই। মার্ক্‌সবাদে এই দুঃখের অনেকটা অবসান হয়। এই মতে মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ; অথচ প্রকৃতি থেকে স্বাধীন, অর্থাৎ বুদ্ধি, বিচার ও কর্মের দ্বারা সে কেবল মানবপ্রকৃতিই নয় জড়প্রকৃতিরও নিয়ম বুঝতে, সমালোচনা করতে, এবং নিজের মত ভেঙে-গড়ে নিতে পারে। কোপার্নিকান-কার্টেসিয়ান পদ্ধতির বাঁধাধরা নিয়ম এতে নেই, তবে সমগ্র ধারার গতিপ্রবাহ এতে আছে। অনেকে একে এনভিরনমেণ্টালিজ্‌ম্‌-এর (environmentalism) পর্যায়ে ফেলতে চান; কিন্তু যদি এই ধরনের মন্তব্য করতেই হয় তবে হ্যুম্যান জিয়োগ্রাফীর সঙ্গে একে যুক্ত করাই যুক্তিসাপেক্ষ। মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এ অন্ধনিয়তির স্থান নেই, আবার আকস্মিকতারও স্থান নেই। অসীমের বিচারে যেমন মানুষ স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছিল তেমনই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রত্যয়ে মার্ক্‌সবাদী আপনার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করতে পারে। মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর যুক্তিপন্থা প্রধানতঃ আরোহী। বিশেষ ক্ষেত্রে অবরোহী। এর মূলকথা

জীবতত্ত্বের পরিচিত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সাধারণীকরণ, শ্রেণীবিভাগ ও অবিশেষ-চর্চা ; এবং সেই অবিশেষ সংজ্ঞা ও প্রত্যয় থেকে কর্মক্ষেত্রের বিশেষত্বে প্রত্যাবর্তন। মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এ বিশেষ ও সাধারণের বিবাদ খানিকটা মিটেছে। কেবল তাই নয়, সেই জন্যে মার্ক্‌স্‌বাদী ইতিহাস ন্যাচারেল হিস্‌ট্রি থেকে পৃথক হতেও পেরেছে। তার উন্নতিবাদ গড্‌উইন, কন্‌ডর্সে-এর অজানিত উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদ নয়। মানুষের চেষ্টার ওপর গ্রথিত বলে সেটা এত পাকা, এতটা সুনিশ্চিত হয়েও অনিশ্চিত। মোদ্দা কথা এই : মার্ক্‌স্‌বাদ সেই বহু পুরাতন মনুষ্যধর্মের আধুনিক সংস্করণ। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে স্টোয়িক মানবতার (stoic humanism) আত্মকেন্দ্রিকতার মিল নেই ; ভারতীয় মানবতার আত্মচর্চার সঙ্গেও তার মিল কম ; য়ুরোপীয় রিনেসাঁ যুগের শেষভাগের মানবতার খাপছাড়া, মুনাফালোভী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরও বিপরীত ধর্মী ; এবং আজকালকার বৈজ্ঞানিক মানবতার (scientific humanism) সঙ্গেও পার্থক্য তার অনেকখানি।

তা হলে দাঁড়াল এই : মার্ক্‌স্‌বাদের কেন্দ্র মানুষ। কিন্তু মানুষ আর ব্যক্তি কি এক বস্তু ? যদি বলা যায় যে, মাত্র ব্যক্তিই সত্য, কারণ তারই মন ও দেহ আছে, তবে সকলেই মানতে বাধ্য যে মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে এই ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ সাক্ষাতের বা সোজাসুজি নয়, একটা কোনো মানব-গোষ্ঠীর মারফত ; অর্থাৎ সেই গোষ্ঠী প্রথমে স্বাধীন হলে তবে 'ব্যক্তি' হবে মুক্ত। আর যদি কেউ বলেন যে, ব্যক্তি বলে কোনো বস্তু নেই, একটা কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র, এবং সমষ্টিটাই সত্য, কারণ ব্যক্তি সমষ্টির দ্বারাই প্রভাবিত, প্রচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, তবে মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে মানব-সমষ্টির সম্বন্ধ নিতান্ত প্রত্যক্ষ। আমার নিজের বিশ্বাস, অবশ্য তার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ব্যক্তি পদার্থটি একটি প্রকাণ্ড abstraction বা বিমূর্তভাব, যার উৎপত্তি ইংলণ্ডে ধনিকতন্ত্রের যুগে এবং যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার ও ভারতীয় সমাজের ও ঘটনার কোনো যোগ নেই। ভারতীয় চিন্তায় আছে পুরুষ ; ও

আমাদের সমাজে এখন পর্যন্ত এমন খুব বেশী ‘ব্যক্তি’ জন্মাননি যাঁদের চরিত-কথার প্রেরণায় ধন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়। (তবে তাঁরা অবতীর্ণ হচ্ছেন)। ব্যক্তিত্ববাদের মূল কথা আর্থিক উন্নতির সাধনা। পুরুষবাদের তত্ত্বকথা বর্ণাশ্রম, অর্থাৎ সমাজের ভেতরে বিকশিত হবার পর গুটিপোকার মতন কেটে বেরোনো। মার্ক্‌স্‌বাদ আর হিন্দুত্ব এক বস্তু বলছি না; আমার বক্তব্য এই যে, ব্যক্তিত্বের নামে মার্ক্‌স্‌বাদের বিচার করা ভারতবাসীর মুখে মানায় না। মানায় ভারতীয় ধনিকদের এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। তাঁরা কি ভারতবাসী? মার্ক্‌স্‌বাদের অন্য গলদ থাকতে পারে; তবে ব্যক্তিত্ব নামক কল্পিত বস্তুর বিশেষ রকমের উন্নতিবিধানের স্থান, কিংবা জল্পনা কল্পনা মার্ক্‌স্‌বাদে নেই বলে তার সমালোচনা চলে না; কারণ, তা হলে সমগ্র মানব-প্রচেষ্টার গতির বিপক্ষে যেতে হয়; জ্ঞানের ইতিহাসকে অপমান করা হয়। মার্ক্‌স্‌বাদের সঙ্গে মানবধর্মের সম্বন্ধ পুরুষতত্ত্বের (personalism) ভেতর দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মারফৎ নয়।

॥ পূর্বাশা ॥ বৈশাখ ॥ ১৩৫৪

অতঃকিম্

এক প্রকারের স্বাধীনতা তো পাওয়া গেল, এখন আমাদের কর্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর যথা শীঘ্র খুঁজতে হবে, সহজ ভাবে ও মনোহারী করে সাজতে হবে যাতে জনসাধারণ স্ব-ইচ্ছায়, আপন স্বার্থের অনুকূল ভেবে তাকে গ্রহণ করে। স্বার্থ আবার আধুনিক কালে আবদ্ধ থাকলে চলবে না; যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে স্বার্থকে না চালালে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। এখানেই চিন্তাশীলদের পরীক্ষা। জনপ্রিয়তা জলাঞ্জলি দিতে তাঁরাই তবু সক্ষম, নেতাদের পক্ষে সেটা অসম্ভব। তাঁদের দৃষ্টি বর্তমানের জাদুরেখায় দিশেহারা হয় না, কুক্কুটের মতন তাঁদের বিচরণ খড়ির দাগে ব্যহত হয় না।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য—কি প্রকারের স্বাধীনতা আমরা পেলাম। ইংরেজ সাধু কি অসৎ, বিচারের প্রয়োজন নেই; কারণ, স্বরাজ্য চালাবেন যাঁরা তাঁরা বলছেন ইংরেজরাজ সদ্‌ইচ্ছায় চলে যাচ্ছেন, অতএব অসাধু প্রেরণা এই নিষ্ক্রমণের পিছনে থাকলেও তার প্রভাব স্বাধীন ভারত কাটাতে পারবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস এবং আমাদেরও সে বিশ্বাস থাকা চাই; এটুকু না থাকলে নিজেদেরই খেলো করা হয় আর স্বাধীনতার কোনো প্রতিজ্ঞা থাকে না। তার মানে এ নয় যে, বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজম্ দেশ থেকে উঠে গেল, আর আমাদের

সাবধানতার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকবে, এবং এখনও আছে, তবে সেটা প্রাথমিক নয়। অনেকে কিন্তু এখনও তাকে প্রাথমিকই ভাবছেন। তাঁদের চিন্তা কতটা গতকালের সন্দেহে পুষ্ট আর কতটা বৈজ্ঞানিক বলতে পারি না। আমার মতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পিছু হটার, এমন কি রূপ পরিবর্তনের কারসাজি, আমরা বুঝতে পেরেছি, এবং বুঝতেও পারব। কখনও কখনও আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর হয়; আবার সময় সময় 'যেন আমরা শক্তিশালী' এই ধারণাও মনে বল আনে। তর্কের খাতিরে কেবল নয়, দেখে শুনেই এই প্রতীতি হয়। আজ আমাদের মন থেকে অতিরিক্ত সন্দেহ দূর হওয়াই মঙ্গল। দূর হবার পরই স্বাধীনতার স্বরূপ ফুটে উঠতে পারে।

আপাতত, স্বাধীনতা নঞর্থকই রয়েছে। জওহরলালই স্বীকার করেছেন, যে শাসনক্রিয়াটি পর্যন্ত আর চলছে না। দেশে দুর্ভিক্ষ আসেনি এটা মস্ত কথা বটে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। দেশের মানসিক আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে; সেখানে ঝড়ও বইছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই ঝড়ে ভারতবর্ষের দু'টো অংশের অবস্থা কি হল? ইংরেজ বিদ্বেষ এখন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে; এবং এই বিদ্বেষে সৃষ্টি-শক্তির হ্রাস হয়েছে মানতে হবে। তাই হিসেব-নিকেশে স্বাধীনতার সদর্থক দিকটা এই বছরে যে খুলেছে মনে হয় না। এশিয়ান কনফারেন্স্ বসেছিল, এখানে ওখানে ভারতের দূত পৌঁছেছে, এই প্রকারের দু'চারটি দফা সাজানো যায় বটে; কিন্তু বাম দিকের তালিকা প্রায় শূন্য। বরঞ্চ ক্ষতিটাই নজরে পড়ে। এখনও জমিদারী গেল না, এবং বহু প্রদেশে মজুরদের মাথায় বাড়ি পড়ছে। তৎসত্ত্বেও আমরা স্বাধীনতার সম্মুখীন হচ্ছি। ভাগ্য-তাড়িতের সুদিন আমোদ-প্রমোদেই কাটে, সৃষ্টির সুযোগ দুয়ারে আঘাত করে চলে যায়, অভাগা শুনতে পায় না। এমনটি যাতে না হয় সেজন্য এখন থেকে ভাবতে হবে। কংগ্রেস-লীগের নেতারা বহু চিন্তা করেছেন এতদিন, তবু কেন আমরা যন্ত্রচালিতের মতন

অগ্রসর হলাম ? ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, স্বাধীনতার সদর্থক রূপ-সৃষ্টির জন্য আজ অন্য চিন্তা-পদ্ধতির প্রয়োজন। তার প্রধান প্রতিজ্ঞা বিপক্ষ বিচার নয়, স্বপক্ষ বিচার। চিন্তার মুখ আমাদের ঘোরাতেই হবে।

মুখ ঘোরাবার প্রথম অবস্থা নেতৃত্বের বিশ্লেষণ। যদি কখনও ভারতের ইতিহাসে তার আবশ্যক হয়ে থাকে তো এখন, এই মুহূর্তে। বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগ সম্পর্কে যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল তার প্রেরণা ভাব, ভাবনা নয়। আমি বলছি বিচার বিশ্লেষণ। অবশ্য অসময়ে অযথা সমালোচনাও নিরর্থক ; তাতে বিদ্বেষ বাড়ে, কাজ এগোঁয় না। খানিকটা এজন্য কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকারিতা কমে গেল। সোশিয়ালিস্ট পার্টিরও বিশ্লেষণে কমতি নেই, কিন্তু তাঁদের কার্যক্ষমতা পূর্ণাঙ্গ হতে পারছে না অন্য কারণে ; তাঁরা একই সঙ্গে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির বিপক্ষে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছেন যাতে তাঁদের শক্তিক্ষয় হচ্ছে। যেকালে চিন্তার স্রোত পরিবর্তন পার্টির কাজ, ব্যক্তিবিশেষের নয়, তখন বামমার্গী সমস্ত দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই একমাত্র উপায় মনে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সম্ভাবনা নিতান্ত কম। তবে নীচে থেকে শ্রমিক-কিষাণদের তাগিদ এলে সম্ভব হবে। সেইজন্য আমার মতে, স্বাধীনতাকে সদর্থক করতে হলে শ্রমিক-কিষাণদের সঙ্গে প্রত্যেক বামমার্গী দলের আরও আন্তরিক ভাবে যুক্ত হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, এখানেই কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বাধবে বিরোধ। কিন্তু উপায় কি ?

পূর্বোক্ত যোগসূত্রটি দৃঢ় হলে অন্য চিন্তাও কি ভাবে পরিণত হয় তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অন্য চিন্তার অর্থ অনাবশ্যক চিন্তা নয়। দেনা-পাওনার (assets and liabilities) ভাগ নিয়ে বহু জল্পনা কল্পনা চলছে, বড় বড় বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়েছে, এবং আমরা শুনছি যে এমন শক্ত ব্যাপার আর কিছু নেই। অবশ্য শক্ত মানতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন শক্ত জানা চাই। প্রথম কথা এই যে জন-সাধারণের হাতে কোনো তথ্য নেই, যতটুকু আছে তাও সরকারের

দফ্তরে, সেখানেও তা সাজানো নেই, কারণ আমাদের সরকার ঐ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো অনুসন্ধান করেননি। দেশের আয় কি, কেউ জানে না। ইংরেজ ঐ প্রকার জ্ঞানে আস্থাবান নয়, মাত্র এই কয় বছর ইংলণ্ডে বাজেট এবং সঙ্গে দেশের আয় সংক্রান্ত একটা হিসেব পার্লা-মেণ্টের সামনে পেশ করা হচ্ছে। আমার ধারণা যে, আমাদের নেতৃবৃন্দ ইংরেজের কাছ থেকে জ্ঞানের প্রতি অনাস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, দায় ভাগের সোজা, মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করলে সর্বনাশ, তাই হিসেব যত গোলমেলে রাখা যায় ততই সুবিধা। মূল বক্তব্য এই : পাওনা সম্পদের বিভাগ (division of assets) প্রকৃত পক্ষে ভাগ নয়, গুণ, অর্থাৎ capital accumulation—ধনসঞ্চয়। যাঁরা এই ধনসঞ্চয়-পদ্ধতি সম্বন্ধে ভেবেছেন তাঁরাই জানেন সে-পদ্ধতিতে একাধিক স্তর ও অবস্থা আছে, যার অনুসারে ধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ ও দিক্‌নির্ণয় হয়। ভারতবর্ষে বণিক সম্প্রদায় ধনিক হচ্ছেন। ভারতবর্ষের সমস্যা—কি ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ধন-উৎপাদনের উপাদানে পরিণত করা যায়। তার অন্ততঃ দু'টি পন্থা আছে : (১) ব্যক্তি বিশেষের খরচ করবার পর যতটুকু জমেছে তাই দিয়ে assets কিনে নেওয়া এবং (২) জনকয়েক পুঁজিদার মিলে কিংবা ব্যাঙ্কের সাহায্যে assets-গুলির মালিকানা—titles of ownership বা মালিকানা-স্বত্ব অধিকার করা। এটা হল acquisition বা অর্জন-ক্রিয়ার স্তর। তারপর আসে realisation বা কার্যে পরিণতি, অর্থাৎ ownership of means of production-কে instruments of the productive process-এ রূপান্তর। আপাতত আমাদের দেশে দু'টি পন্থাই অনুসৃত হচ্ছে ; তবে দ্বিতীয় পন্থার দিকেই ঐতিহাসিক ঝোঁক। যখন রিয়েলাইজেসনের (realisation) জন্য সঞ্চিত মূলধন (saved capital) যথেষ্ট নয়, তখন ফিনান্স গ্রুপ ও ব্যাঙ্ক ক্যাপিটাল চাই। তাই এই পাওনা সম্পদ বিভাগের (division of assets) গতিটা concentration of the ownership of titles-এর দিকে, অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসার দিকে হতে বাধ্য। কেবল তাই নয়, এ্যাকুইজিসান ও

রিয়েলাইজেসনের মধ্যে কিছু সময় যাবেই যাবে, বিশেষতঃ যখন capital goods মিলছে না। এই অবসরে যতবার মালিকানা স্বত্বে (titles of ownership) হাত ঘোরে ততই লাভ। খাট্টা ফাটকা বাজারের খবর সকলেই জানেন। মালিকানাস্বত্বে বিক্রির সময় মালিক চান বেশী দাম, আব কেনবার সময় কম। এখন যদি মালিক ও ক্রেতার দল শক্তিশালী হন তবে সরকারের উপর তারা এমন জোর দিতে পারেন যাতে তাঁদের সুবিধা মত মালের ও স্বত্বের দাম বাড়ে কমে। সর্বদেশে তাই হয়েছে, এখানেও তাই হচ্ছে, ও হবে। সরকারের সাহায্য ছাড়াও ধনিকশ্রেণী সম্মিলিত চেষ্টায় বাজার দর ঘুলিয়ে দিতে পারেন আমরা জানি। এ তো গেল দায়ভাগের স্বরূপ, যার মূল কথা ধনবৃদ্ধি। বিশ্লেষণটি আরো চালালে দেখি ধনবৃদ্ধি ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ধনবৃদ্ধির দায়িত্ব কার, তার উদ্দেশ্য কি ? যদি বলি দায়িত্ব সরকারের, উদ্দেশ্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন, তবে দায় ভাগের ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় আপনা থেকে। কারণ তাতে মালিকানা স্বত্বের হাত-ঘোরা বন্ধ হয় ; এবং বাজার দর, এ্যাকুইজিসান ও রিয়েলাইজেসনের অন্তরালে একটি শ্রেণীর হাতে না পড়ে, তার লাভের জন্য না উঠে না নাবে, জনসাধারণের প্রয়োজনে নির্ধারিত হতে পারে। যদি আমাদের অর্থনীতিবিদ্ বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণের জীবনযাত্রার দিকটা লক্ষ্য করেন তবে তাঁদের এমন বিপাকে পড়তে হয় না। সেজন্যই বলছিলাম, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা একেবারেই ঘুরিয়ে দিতে হবে। সেজন্য জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রটি অত্যন্ত দৃঢ় করা চাই। না করলে আমরা ঠকব এই হিসেবের মারপ্যাঁচে। শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লার ফিরিস্তিতে পাওনা সম্পদগুলোকে (assets) fetish ভাবে ধরা হয়েছে, অর্থনীতিবিদ্ও তা ছাড়া তাদের অন্য কিছু ভাবতে আমাদের বলেননি ; তাই ব্যাপারটা অত গোলমেলে ঠেকছে। আদৎ কথাটা নিতান্ত সরল—কার জন্যে দায় ভাগ, কার জন্যে স্বাধীনতা ? এতটা লেখবার প্রয়োজন এই যে,

সামনের কয়েক মাসের মধ্যে, এই রাজকীয় গোলমালের অন্তরালে ধনিকশ্রেণী আপন শক্তি বাড়িয়ে নেবেই নেবে। অর্থনীতিবিদ্ সম্প্রদায়ের স্বাধীন হবার সময় এসেছে। তাঁদের দায়িত্ব এ যুগে খুবই বেশি। কিন্তু নতুন শ্রেণীর সঙ্গে আন্তরিক যোগ না থাকলে দায়িত্বজ্ঞান আত্মম্ভরিতাই থেকে যায়। মোদ্দা কথাটা এই, নেতৃত্ব এখন থেকে অর্থনৈতিক হওয়া চাই, এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্বের শক্তির উৎস ঐ নতুন শ্রেণী—এটি কিছুতে ভুললে চলবে না।

দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের আর একটি সিদ্ধান্ত—মুসলমানদের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করা। যদিও আমি থাকি এমন দেশে যেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কলুষিত করেনি, তবু বিদ্বেষের বহরটা আমার অজ্ঞাত নয়। এই সেদিন সীতাপুর জেলায় মোহনলাল গৌতমের মতন আগস্ট বিদ্রোহী, সোশিয়ালিস্ট, একজন তালুকদার সন্তান, হিন্দুসভার মনোনীত সদস্যের কাছে ভোটে হেরে গেলেন। গৌতমের তরফে সমগ্র কংগ্রেসবাহিনী ছিল। এই অঞ্চলে ব্যাপারটা কল্পনাতীত। তাই বিদ্বেষ যে অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু তাকে উল্টে দিতে হবে। আজ বাংলা ভেঙে গেল; দুঃখের কথা নিশ্চয়ই। এককালে বিভাগে আপত্তি আমরা জানিয়েছিলাম, এবার নিজেরাই চাইলাম। দুঃখ এই, তখন কেন পুনর্মিলন চেয়েছিলাম তার গূঢ়ার্থ আজও প্রকট হয়নি। বাইরে ছিল তার দেশাত্মবোধ, অন্তরে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) বজায় রাখার অজানিত চাহিদা। এবারও আমরা পুনর্মিলন চাইব—কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাখতে নয়। তাকে ভেঙেই পুনর্মিলন সম্ভব। পাকিস্তান-রাষ্ট্র তৈরী হবার পরের দিনই এই ভাঙন শুরু হবে। যদি আমাদের দৃষ্টিকোণ সত্যই বদলে থাকে তবে সেই ভাঙনে পাকিস্তানকে সকলেরই সাহায্য করতে হবে। কেবল তাইতেই বিদ্বেষ দূর হবে বলছি না, তবে একত্রে সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সৃষ্টির পথ খুলতে পারে; এবং সৃষ্টির সুযোগেই হৃদয়ের যোগ হয়। এতদিন যে প্রয়াস চলছে তাতে না

ছিল প্রাণ, না ছিল অর্থ, ছিল নিছক আদর্শবাদ; তাই মুসলিম জনসংযোগের (muslim mass contact) মতন অদ্ভুত পরিকল্পনা দেশের সামনে রাখা হয়েছিল, তাই সেটা নিষ্ফল হল, উল্টো, ফল ফলল। এটা মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা নয়, অতি সাধারণ মানসিক ব্যাখ্যা। জনসাধারণ সৃষ্টির সুযোগ পায়নি; জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানেরাই প্রধানতঃ মজুর-কিষাণ, নির্যাতিত-প্রপীড়িত-অশিক্ষিত। এই সোজা কথাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে হলে তাকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে হবে; চোখে আদর্শবাদের ঠুলি পরলে স্বাধীন ভারতের প্রতীক রূপ প্রকট হবে না। মুসলমান-প্রীতির অন্য কোনো অর্থ নেই। বলা বাহুল্য, ঐক্যবদ্ধ বাংলা (United Bengal)—এ আন্দোলনের সঙ্গে এই বিচারের কোনো যোগ নেই।

আর একটি দৃষ্টান্ত : দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের নেতৃবৃন্দ নানা কথা বললেও একই মনোভাব দেখিয়েছেন। সে মনোভাব বিশেষ নয়, ইংরেজ-অধীন ভারতবর্ষের ব্যাপারেও তাই দেখেছি, অর্থাৎ trusteeship এই কথাটি যে পৃথিবীর কত সর্বনাশ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এদেশেও তার নমুনা দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী পুঁজিওয়ালাদের, রাজন্যবর্গকে সকলকেই অধস্তন শ্রেণীর জিম্মাদার (trustee) হতে বলেন; জওহরলালও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (constitutional monarchy) চান। এটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হয়তো চলতো—তাও পুরোপুরি চলেনি, এখন তো একেবারে অচল। আমাদের এখন জনগণের সরকার (peoples government) চাইতে হবে। এবং সেই সঙ্গে জনগণও ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ক্রীড়নক যাতে না হয় তার উপরও নজর রাখতে হবে। Balkanisation উত্তর Balkan Peninsula-তেই তার আশেপাশেই আছে। দেশীয় রাজ্যে ভারতবর্ষের সব সমস্যা যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেখানে একত্রে সামন্ত, ধনিক-বিদেশীর ষড়যন্ত্র। তাকে ভাঙতে একমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষের নতুন শ্রেণীরই সামর্থ আছে। বর্তমান কংগ্রেসের নেই, লীগেরও নেই। সৌভাগ্যবশতঃ বাংলার সামনে এই সমস্যাটি প্রধান

নয় ; তবু দেশীয় করদ-রাজ্যের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি পড়লে মনের দিক থেকে অন্ততঃ খানিকটা লাভ হয়।

এই প্রবন্ধে মাত্র গোটা কয়েক সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করলাম। সেগুলি একত্র করবার পর দেখি একটি মাত্র প্রশ্ন উঠেছে—কি ভাবে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সম্ভব ? বুদ্ধিজীবী হিসেবে একটি উত্তর কলমের মুখে প্রথমেই আসে ঃ পৃথিবীতে যতগুলো বড় গৃহযুদ্ধ হয়েছে তার ইতিহাস মন দিয়ে পড়া। আমরা আজ কয়েক বৎসর socialist classics পড়ছি ; তাতে উপকারই হয়েছে গড়পড়তা ঃ আজ সেই সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সাহিত্য পড়ার দরকার হয়েছে, বিশেষতঃ আমেরিকার (যেমন ধরা যাক Leo Hubarman-এর *We the People*)। স্পেন, চায়নার গৃহবিবাদের ইতিহাস জানতে হবে। কিন্তু মাত্র পড়ে শুনে যে বড় বেশী দেশের উপকার হবে মনে হয় না। একটা না একটা দলের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। কোন দল ? দেশের যতগুলো বামমার্গী দল রয়েছে তাদের দোষগুলো সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি। তার প্রধান দোষ তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদবিদ্বেষ। এতে জার্মানীর সর্বনাশ হয়েছে, অস্ট্রিয়া লোপ পেয়েছে আমরা সকলেই জানি। সোশাল ডেমোক্রাট আর কমিউনিস্ট পার্টির ঝগড়াতেই হিটলারের অভ্যুত্থান সহজ হয়। Otto Bauer, Brunthal প্রভৃতি অস্ট্রিয়ান সোশিয়ালিস্ট নেতাদের নিজেদের লেখাতেই প্রমাণ হয় যে, অত বিদ্যাবুদ্ধি, অত সততা থাকা সত্ত্বেও সংকটের সময় তাঁরা পক্ষঘাতগ্রস্তের মত ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য সেই দেশেই অমান্য হচ্ছে তো আমাদের দেশে কোন ছার! আমাদের কাছে সোশাল ডেমোক্রাসী ও কমিউনিজ্‌ম্‌ও তাই দু'টোই ধরতাই বুলি। অতএব বামমার্গীর দলের মিলন বইএর সাহায্যে ঘটবে না। এইখানেই বিচারের প্রয়োজন। বামমার্গীর অন্তর্বিবাদের কারণ কি ব্যক্তি হিংসা ?

সৌভাগ্যবশতঃ আমি একাধিক পার্টির কর্তৃপক্ষদের চিনি। তাঁরা কি ঐতিহাসিক জ্ঞানে কিছু কম ? মোটে না। প্রকৃত বিদ্বান

তাঁদের মধ্যে দেখেছি। হৃদয় অনুন্নত কারুর কম বেশি? তাও মনে হয়নি। দেশকে কেউ কম কেউ বেশী ভালভাসেন? প্রেমের কষ্টিপাথর আমার কাছে নেই, তবে সকলেই জেলে গেছেন, সকলেরই স্বার্থত্যাগ রোমাঞ্চকর। সকল দলেরই আস্থা কিষাণ-মজুরের ওপর।

পন্থার পার্থক্যটাও কারণ নয়, সেটাই তো প্রশ্ন। জীবনের অন্যদিক থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, মানুষের কার্য-কারিতা নির্ভর করে সেইখানে যেখানে সে কতকটা নতুন শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার উপর। নতুন শক্তি সম্বন্ধে কারুর মতভেদ নেই। তা হলে যোগ সাধনেই পার্থক্য—এইটাই বিচারে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বামমার্গীদের গৃহবিবাদের কারণ—কোনো দলই শ্রমিক কিষাণের সঙ্গে রীতিমত যুক্ত নয়। আমি কারুর নিন্দা করছি না, কেবল বিচার করছি, কেন বামমার্গীর দল মিলতে পারছে না। অবশ্য সেজন্য নতুন শ্রেণীর অপরিণত অবস্থাও দায়ী। কিন্তু আজ মজুররা, কিষাণেরা কি সত্যই অপরিণত? আমার সন্দেহ হয়েছে—তা নয়। আমার বিশ্বাস যদি সত্য হয় তবে শীঘ্রই বামমার্গীর মিলন ঘটবে। নচেৎ অতঃকিম-এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যাবে না। আমার ধারণা যদি ভুল হয় তবে পরিণত করবার দায়িত্বটাই বাড়ে। সে দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদের, অন্য কারুর নয়।

॥ পূর্বাশা ॥ শ্রাবণ ॥ ১৩৫৪ ॥

ইতিহাস ॥ ১ ॥

সভ্যজগতে ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবার একটা বিশেষ প্রয়োজন সর্বদাই। ঘটনার পারম্পর্য কিংবা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে সেই মতামতের সংস্পর্শে। নচেৎ, মানুষ ঘটনাস্রোতে খড়-কুটোর মতন ভেসেই চলে, জীবনের কোনো অর্থ ও সার্থকতা থাকে না। যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত নয়, যা করে হোক দিন গুজরান করাই যার সমস্যা কিংবা অভ্যাস, সেও জীবনের অসার্থকতা ও নিরর্থকতার বেদনা অনুভব করে। কেবলমাত্র গতানুগতিকতার মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, তারও পিছনে ইতিহাস-সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা কাজ করতে থাকে, বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের সঙ্গে যাঁদের দ্বন্দ্ব নেই, অর্থাৎ যাঁরা কোনোপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধী, তাঁদের ধারণা এই যে, তাঁদের মৃত্যুর পরই পৃথিবী উৎসন্নে যাবে, ইতিহাসের গতি মন্দা হবে। যাঁরা কল্পলোকে ফিরে যেতে চান, কিংবা এই লোকেই গোলোক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তাঁদের ইতিহাস-সংক্রান্ত মতামত পূর্বোক্ত মতামতের কাব্য-সংস্করণ। বিপ্লবপন্থীদের ধারণা, ইতিহাসের গতি ক্রমশই দ্রুততর হয়ে স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গতির ক্ষেপ দাদুরীর, কূর্মের নয়। তাঁদের কাছে ইতিহাসের ধর্ম হল উন্নতি। অতএব এই সমাজে সুখে বসবাস করতে হলে, এই সমাজ থেকে

উদ্ধার পেতে হলে, একে ভেঙে নতুন সমাজ তৈরি করতে হলে ইতিহাসের ধর্ম বুঝতে হয়। কারণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমাবেশ সাধন করে ভালভাবে এবং আরো ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা তার উপর নির্ভর করছে।

শুধু তর্কের খাতিরে স্বীকার করা চলে যে, অ-সামাজিক ব্যক্তির ইতিহাস-সংক্রান্ত সংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। বস্তুতঃ, অ-সামাজিক ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। দ্বীপে আটক হবার পূর্বে রবিনসন ক্রুসোর সমাজ ছিল, দ্বীপে থাকবার সময় যে রকমে আহার সংগ্রহ করতেন বা অসভ্যদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন তার মধ্যে পূর্বতন সামাজিক সংস্কার রীতিমতই প্রকট ছিল ; সেই সমাজে ফিরে আসবার জন্য ব্যগ্রতাও তাঁর কমেনি। এক কথায়, রবিনসন ক্রুসোর অবস্থা বর্তমানকালের সংসারত্যাগী আশ্রমবাসীদের অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যকারের যোগী কালাতীত হবার জন্য সাধনা করেন শোনা যায়। তিনিও ইতিহাসের হাত থেকে, ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলার প্রয়োজন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। যোগী সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, বিশ্বের অকল্যাণ হয়েছে, অকল্যাণের পথে অগ্রসর হচ্ছে, না ভাবলে কল্যাণ-চিন্তার প্রয়োজনই থাকে না। তা ছাড়া, যোগের ইতিহাস আছে, আবার যোগীরও ইতিহাস আছে, এবং সমাজ কি ভাবে যোগীকে দেখে এসেছে তারও ইতিহাস আছে।

বুদ্ধিজীবীদের কথা স্বতন্ত্র নয়। দার্শনিকদের সব প্রচেষ্টার মূলে একটি প্রশ্ন লুকিয়ে থাকেই থাকে—কাল-বস্তু মনের রচনা, না তার কোনো পৃথক অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ মহাকালের ইচ্ছায় পরিবর্তন, না পরিবর্তনের একটি গুণের নাম কাল? অর্থশাস্ত্রের মূল কথা মূল্য নিরূপণ, সেখানেও কালক্ষেপে মূল্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নিরূপিত হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কালের উৎপাত। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে ইতিহাসের প্রবেশ নিষেধ থাকলেও, পরীক্ষার পূর্বতন ইতিহাস, মনসাদেবীর মত, কোনো-না-কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ লাভ করে।

আইনস্টাইন কালকে বশ করতে চেষ্টা করেছেন—অঙ্ক কষে। কিন্তু তাঁর পূর্বে মাইকেলসন, মর্‌লি, মিন্‌কাওস্কী, ম্যাক্‌সোয়েল না থাকলে তিনি অন্য কিছু হতে পারতেন, যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না নিশ্চয়ই। আদৎ কথা এই, সব জ্ঞানই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, জীবন সামাজিক, অতএব জ্ঞান সমাজের সঙ্গে যোগসাধনের একটি প্রধান উপায়। আবার যখন নানা কারণে সমাজের সঙ্গে সহযোগ-সাধন অসম্ভব হয়, তখন নতুন ভাবের অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে পুরাতন সমাজ ভাঙা হয়, নতুন সমাজ গড়ার চেষ্টা চলে। অতএব বুদ্ধিজীবী ও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইতিহাস-সম্বন্ধে সত্য-সংস্কার সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য রয়েছে। এ বিষয়ে যিনি উদাসীন তিনি জ্ঞানের উন্নতি করতে পারেন না।

বিশেষতঃ ভারতের এই যুগে। শাসক-সম্প্রদায় (তাঁরা আবার ভিন্ন জাতি) বলছেন, "ধীরে ধীরে ইতিহাস চলে, আমাদের দেশে, ইংলণ্ডে, তাই চলছে, প্রমাণ এডমণ্ড বার্কের উক্তি ; অতএব প্রথমে প্রাদেশিক বৈঠকে আংশিক স্বাবলম্বন, যোগ্যতাপ্রমাণের পর সম্পূর্ণ, তারপর দিল্লীতে দুইয়ারকী, সেখানে যোগ্যতাপ্রমাণের পর ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়ার মতন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। ভারতে ইতিহাসের ধারা এই হওয়া উচিত, অতএব এই হবে।" শাসিতের মধ্যে এক শ্রেণী অন্ততঃ উত্তর দিচ্ছেন, "আমরা প্রস্তুত, তবে ইতিমধ্যে আপসে যদি গোটা-কয়েক শর্ত খাড়া করতেই হয়, তবে সেগুলোকে আমাদের শুভের জন্যই প্রয়োগ করা চাই, এবং কিছুদিন পরে সেগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে।" ইতিহাসের অর্থ যে ক্রমোন্নতি দু'দলই তা স্বীকার করেছেন—হোর্ থেকে মহাজ্ঞানী পর্যন্ত। বছর বারো পূর্বে ইতিহাস-সম্বন্ধে আমাদের অন্য ধারণা ছিল, মহাত্মাজীর বাক্যে আস্থা রাখলে, তাঁর আদেশ মান্য করলেই আমরা একটা বিশেষ তারিখে ইতিহাসের স্বরাজ অধ্যায়ের পাতা খুলে ফেলব। সে ধারণা আর নেই। এখন ক্রমোন্নতির যুগ। সমাজ সংস্কারেও এই নতুন ধারণা কাজ করছে। উচ্চশ্রেণীরা (অর্থাৎ মহাত্মাজী ও মালব্যজী) হরিজনদের মন্দিরে

প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত; কিন্তু চতুর্বর্ণের উপর হাত না দিয়ে। একে ইতিহাসের কমঠ-সংস্কার বলা চলে।

কূর্ম অবতার এ দেশেরই কল্পনা হলেও এবং কমঠ-বৃত্তি এ দেশের একটি সুপরিচিত সাধনা হলেও, ইতিহাস-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণা কিন্তু আমাদের নয়। আমাদের কার্যাবলী থেকে অন্য কোনো ধারণা উদ্ভূত হয়নি বলেই শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধামত একটি ধারণা আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের পণ্ডিতবর্গ নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে ইতিহাসের ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো মত সৃষ্টি করতে পারেননি বলেই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জীববিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদকে যেমন সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হয়েছিল, তেমনি অন্ধভাবে তাকে আমরা এই দেশে প্রয়োগ করছি। এটা আমাদের অনুকরণ, সৃষ্টি নয়। সেইজন্য পার্থক্য শুধু তালে, শাসক ও ব্রাহ্মণ চাইছেন ঠায়ে চলতে, শাসিত এবং হরিজনেরা চাইছেন দুনে। লয় সমান। জীবজগতের অভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ কোনো কালেই সমাজে প্রয়োজ্য নয়, এমন কি ইংলণ্ডেও নয়, বিশেষতঃ এখন। ভুল অনুকরণে শক্তির অপচয় হয়, সঞ্চয় হয় না। ভারতবর্ষের দায়িত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি, আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে। অপচয় শুধু পাপ নয়, বোকামি।

অনেকে বলতে পারেন, আমাদের দেশে ইতিহাসের নতুন ধারণা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মনোভাব এই যে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির আবর্তন কিংবা ব্রহ্মার মুহূর্ত পরিকল্পনার সাহায্যে এ যুগের ব্যাখ্যা ও কর্তব্য নিরূপিত হতে পারে।

মনোভাবটিকে অসম্ভবনীয়তার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সভ্য জগতের, বিশেষতঃ জার্মান দার্শনিকদের মতামত উদ্ধৃত করা হয়। হিন্দু পৌরাণিক ও নীটশে, স্পেংগলারের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হল ইতিহাসের এই চক্রবৎ পরিবর্তনের পরিকল্পনা। শুধু সত্যের খাতিরে এটুকু মনে রাখলেই চলবে যে, হিন্দু পৌরাণিক উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক, এবং আজকালকার পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে আধিভৌতিক,

জোর আধিদৈবিক, কিন্তু ফল দাঁড়ায় একই। সেজন্য এই দু'টি ধারণাকে একত্র সমালোচনা করা চলে। এইসব বৃহৎ পরিধির আবর্তনের তুলনায় আমাদের পরিচিত সভ্যযুগের আবর্তন এতই ছোট যে, তার মধ্যে মানুষের সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে ওঠে। অতি বৃহতের মধ্যে ছোট-খাট কর্তব্যগুলি দিশা হারায়। যে অর্থের সন্ধানে ইতিহাসের ধর্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজন জন্মায়, সেই সন্ধানের প্রারম্ভেই ব্যর্থতা স্মরণ করা কিংবা আত্মবিশ্বাস হারানো উচিত নয়। মানুষ বাদ দিয়ে ইতিহাসের অর্থ থাকে না, অন্ততঃ মানুষের কাছে। আদৎ কথাই এই যে অতি পুরাতনকালে, যখন মানুষ নিজের মতে বাইরের সম্বন্ধকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেনি, তখন কালের পরম্পরা ও প্রসার সম্বন্ধে কোনো রীতি আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অল্পদিন হল আমরা অতীত সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে উঠেছি, তারই কৃপায় আমরা কালপ্রবাহের গতি ও রীতি এবং সেই গতি ও রীতির সাহায্যে বর্তমানের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যতের প্রগতি বুঝতে শিখছি। এখনও আমাদের ধারণা নিশ্চিত ও দৃঢ় হয়ে ওঠেনি, সেটি ধ্যানে পরিণত হয়নি। বৈজ্ঞানিকের বিবেচনার বহির্ভূত হয়ে এই অস্পষ্ট ধারণা লজ্জায় আত্মগোপন করছে। কিন্তু পরিবর্তনের যে রীতি ব্রহ্মার যোগনিদ্রা থেকে উদ্ভূত হয়ে সেই নিদ্রায় লীন হবেই হবে, যে গতির গুপ্ত অভিসন্ধি জানবার কোনো অধিকার কোনো বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা শ্রেণীর জন্মগত সংস্কারমাত্র, সে পরিবর্তন শুধু স্বপ্নবিলাস, সত্যকারের পরিবর্তনই নয়। তার সাহায্যে বর্তমান জগতের জাগ্রত ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়- তা সে ধারণাতে ইচ্ছাপূরণের যত সুযোগই থাক না কেন। তার সাহায্যে বৈচিত্র্যের মর্মকথা প্রকাশ পায় না, কারণ 'এব চ' মন্ত্র উচ্চারণে শুধু একীকরণই সাধিত হতে পারে। আগে যা ছিল, পরেও তাই হবে, রূপে ও আত্মার কোনো পরিবর্তন হবে না—একথা নীট্‌শের কল্পিত জরাথুস্ট্রের মুখেই শোভা পায়। নিয়তির চাপে সমীকরণ, কলকারখানা ও যন্ত্রের চাপে সমীকরণের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই। ব্রহ্মা কিংবা ব্রহ্মের ইচ্ছার

উপর নির্ভর করলে ঐতিহাসিক ও ব্রাহ্মণ একই ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তা হলে সমূহ বিপদ অব্রাহ্মণের পক্ষে, যাঁদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পুরাণের মত কলিযুগে ব্রাহ্মণ নেই যখন, তখন ঐতিহাসিকের কাজও কমে গেল। এই প্রকার অতিপ্রাকৃতের হস্তে ইতিহাসের রীতি-উদ্ঘাটনের ভার ন্যস্ত করলে প্রুশিয়ান রাজ্যই হয়ে ওঠে ব্রহ্মের একমাত্র প্রকাশ, ব্রাহ্মণ প্রফেসার হয়ে ওঠেন ব্রহ্মজ্ঞানী, এবং দর্শন হয়ে ওঠে সোহহংবাদ।

পূর্বোক্ত মন্তব্যের এ অর্থ নয় যে আমাদের কোনো ইতিহাস ছিল না। বক্তব্য এই, আমাদের যে ইতিহাস ছিল মাত্র এখনই তা আমরা বুঝতে পারি। এই অর্থেই সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস। বক্তব্য এই যে অতিপ্রাকৃতের সাহায্যে ইতিহাসের অর্থ পাওয়া যাবে না। অর্থের পদগুলি প্রকৃতির মধ্যেই আছে, যদিও সে প্রকৃতির ক্রিয়ায় ও ব্যবহারে এমন 'অসম্ভব' ঘটনা ঘটে যার হদীস পাওয়া যায় না বলে তাদেরকে 'অ-প্রাকৃত' নাম দেওয়া হয়। মাত্র এইভাবে দেখলেই ইতিহাস স্বকপোল-কল্পনার দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে। বাহ্যপ্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের আচার-ব্যবহার কি ভাবে গড়ে উঠেছে, আমরা কতটুকু স্বাধীন, কতটুকু নিয়তির অধীন, কতটুকু নির্বাচন করেছি, কতটুকু নির্বাচিত হয়েছি জানবার পরই ইতিহাস বাহ্য হয়ে উপরে উঠতে পারে। নচেৎ, ইতিহাস কল্পনাবিলাসীর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাসের নিকটতম সম্বন্ধ ভূগোল। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অন্য কোনো অর্থ নেই—ঘটনা কিছু বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। ঘটনার ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক হতে পারে, সেজন্য ব্যাখ্যার বিষয়কে, অর্থাৎ ঘটনার সম্বন্ধে ও পারম্পর্যকে যতটা বাহ্য করা যায় ততই ভাল।

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে বাঁচবার জন্য। বাঁচবার প্রধান উপায়ের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে আজকাল নিষ্কাম-ধর্মের কোঠায় তোলবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তার আদি ছিল সকাম, ভুললে চলবে না। কি করে বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা যায়

এটাই ছিল মানুষের একটি প্রধান সমস্যা। যতদিন থেকে খাদ্য সমস্যা ততদিন থেকে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মূলে অর্থনীতিগত ব্যাপারটি (ইকনমিক ফ্যাক্টর) সর্বদাই ছিল, এবং সে বিষয়টি অঙ্কের ভাষায়, প্রাইমারী—একেবারে প্রাথমিক ; অর্থাৎ একে আর অন্য কোনো বিষয় দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। ধরা যাক, আদিম যুগের কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো একটি উপায় উদ্ভাবন করলে ; সেই থেকে একটি জাতির খাদ্য-সংগ্রহের ভার কিংবা অন্য কোনো শত্রুর কবল থেকে বাঁচবার ভার তার লাঘব হল, খানিকটা শক্তি সঞ্চিত হল, যার জোরে সেই জাতি অন্যদিকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। আদিম যুগের আবিষ্কারের পিছনে ও পরে এই বাঁচবার তাগিদ ছিল, নচেৎ আবিষ্কারের প্রচার হত না, একটি আবিষ্কারের সঙ্গে অন্য আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় কোনোটাই টিকতে পারতো না। যখন একটি কোনো আবিষ্কারের সাহায্যে, পূর্বের অপেক্ষা ও অন্যদের অপেক্ষা ভালোভাবে বাঁচবার উপায় প্রচারিত হল, তখন সেই আবিষ্কারের সাহায্যে ও তাকে কেন্দ্র করে সেই সমাজ নতুনভাবে গড়ে উঠতে লাগল। কেন না, সমাজ ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এক—বাঁচা এবং আরো ভালো করে বাঁচা। যে সমাজে আবিষ্কারক জন্মাল না কিংবা যে সমাজ অনুকরণ করতে পারল না, সে পিছিয়ে পড়ল এই জীবন-সংগ্রামে। এই চলল কিছুকাল—অর্থাৎ নতুন নতুন আবিষ্কার, সেই সঙ্গে নতুন উপায়ে সমাজ-গঠন।

কিন্তু আবিষ্কারের গতি সমাজের পুনর্গঠনের গতির চেয়ে দ্রুততর হতে বাধ্য। আবিষ্কার করে জনকয়েক লোক কিন্তু সমাজ সব লোককে নিয়ে। জনকয়েক লোক তাদের সমগ্র অবসর নিয়োজিত করতে পারে সৃষ্টির কাজে। এ দুই গতির ভিন্ন হারের ফলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়। যখন শিকার ছিল একমাত্র খাদ্য-সংগ্রহের উপায়, তখন শিকারী সমাজের আচার-ব্যবহার, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ, সম্পত্তি-জ্ঞান ও ধর্ম গঠিত হয়েছিল শিকারবৃত্তির চারপাশে। পশুচারণ যুগে (কিংবা টাইপে) দেখা গেল যে, পশুর

সাহায্যে শক্তির কম খরচে খাদ্য-সংগ্রহ করা চলে। পশুকে বশে আনবার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন চাষ করা সম্ভব হল। নচেৎ মাটি আঁচড়ানো, ঝুম-চাষ, বাগান-চাষই ছিল। লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে, গ্রাম তৈরী হচ্ছে, মানুষ বসবাস করছে ঘর-বাড়িতে। তাদের জন্য একটা সুনিশ্চিত খাদ্য-সরবরাহের প্রয়োজন। সেই থেকে পুরুষ কর্তা হয়ে উঠল, সম্পত্তি বর্তমান আকার ধারণ করল, স্বর্গের আকার বদলে গেল, ভগবান পুরুষ সেজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। প্রত্যেক যুগে পুরাতন অবস্থার চিহ্ন বর্তমান থাকতো, কোনো টাইপই শুদ্ধ ছিল না। যে জাতি পূর্ণভাবে কলকারখানাকে গ্রহণ করেছে, সে জাতিরও মধ্যে চাষবাস পরিত্যক্ত হয়নি, অন্য পরে কা কথা! কৃষিপ্রধান জাতির মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভূসম্পত্তির মালিকমাত্র হয়ে ধনশালী হয়ে উঠলেন। ছোট চাষীরা আর খেতে পায় না, অথচ বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্য একটি শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা বাড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে পুরাতন কলের সার্থকতা কমে এসেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে, অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে নতুন কল তৈরী হল। নতুন কারখানায় টাকা আসতে লাগল পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর কাছ থেকে। পূর্বতন সমাজের অতিরিক্ত লোকসংখ্যা আর অতিরিক্ত রইল না, অনেকে কলকারখানায় চাকরি নিলে, কেউ বা বিদেশে চলে গেল। আজ দেড়শ' বৎসর মাত্র গোটাকয়েক দেশে এই ব্যাপার ঘটছে, এবং অন্য দেশ এখন সেসব দেশের অনুকরণ করছে। কারণ, এ ছাড়া অন্য উপায়ে প্রচুর লোকের যথেষ্ট অন্নসংস্থান হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞানের আশীর্বাদের প্রথম ফল উপভোগ করলেন ধনী-সম্প্রদায়। তাঁরা এখনও সেই ফলভোগ করছেন—মাত্র এইটুকু বললে ইতিহাসের রীতি বোঝা যাবে না। একটু তলিয়ে দেখতে হবে। বিজ্ঞানের ফলে প্রথম উন্নতি হল যন্ত্রবিদ্যার, তার দরুন কলকারখানার প্রসার হল। এক একটি কল যেমন অনেক লোককে খাওয়াতে পারে, তেমনি অনেক লোকের বদলেও সে কাজ করতে পারে। অতএব লোকদের তাড়িয়ে দিতে হয়, কিন্তু বেশী দূরে নয়। প্রথম

প্রথম অনেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে মজুরদের কলকারখানার কাছে কাছে রাখলেই মালিকদের সুবিধা হয়। সুবিধা দুই প্রকারের—এক, যদি চাহিদা বাড়ে তখন সরবরাহ করবার জন্য বেশী লোকের প্রয়োজন হবে ; আর এক প্রকার—শ্রমিকের একদল যদি মজুরি বেশী চেয়ে বসে, তা হলে অন্য শ্রমিকদলের চাকরি পাবার আশঙ্কায় তারা জব্দ থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে চাহিদা তখন বেড়েই চলেছে. নতুন আকার নিয়েছে। কল তৈরির জন্য নতুন কারখানার প্রয়োজন হল। ইংলণ্ড এই কল তৈরির ভার নিল। জনকয়েক লোক আবার কাজ পেল। তাদের মজুরি বাড়ল। সেইসঙ্গে তাদের সংখ্যা বেড়েই চলল। তারা যত বাড়ে তত পরিমাণে তাদের মজুরি জোটে না। কিন্তু বিজ্ঞান—অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করে সামাজিক উৎপাদনের উপায়—বসে থাকবার ছেলে নয়। সে শুধু দিতেই জানে। কখন দিতে হয়, কি দিতে হয়, কাকে দিতে হয়, কিভাবে দিতে হয় সে জানেই না—বোকা ছেলের মতন। প্রথমে সে তা জানতো। কিন্তু এখন বিজ্ঞান একটা শ্রেণীর বৃত্তি হয়ে উঠেছে, যে শ্রেণীর স্রষ্টা এই ধনীসম্প্রদায়, যে বৃত্তি পরবিত্তভোগী, যার উদ্দেশ্য অন্য শ্রেণীর উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় আবিষ্কার করা। এই সময় ধনীসম্প্রদায় বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য অনেক টাকা দিলেন, নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়, বড় বড় ল্যাবরেটরী তৈরি করলেন, নিজেদের কারখানায় বৈজ্ঞানিকদের মাইনে দিয়ে রাখলেন, তাঁদের জন্য পরীক্ষাগার তৈরি করলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কেনা গেলেও বিজ্ঞানকে কেনা যায় না। এখানেই আবার বিপদ ঘটল। কল যেমন থামে না, বিজ্ঞানও তেমনি থামে না। তাই কলের মালিক নতুন সুর গাইতে বাধ্য হলেন। আজ তাঁরা বলছেন, "কিছুদিন বিজ্ঞানের উন্নতি রোধ করলে পৃথিবীর মঙ্গল হয়।" আজ তাঁরা পেটেণ্ট কিনে লোহার সিন্দুকে তুলে রাখছেন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফাতে টান পড়ে, তাকে ভাগবাঁটোয়ারা করতে হয়। সেজন্য হয় বিজ্ঞান বন্ধ করা চাই, নচেৎ বিজ্ঞানেরই

সাহায্যে ক্ষতি কমিয়ে লাভ বাড়ানো চাই। শেষ উপায়টির নাম সায়ান্টিফিক ম্যানেজমেণ্ট, র‍্যাশনালিজেশন। কিন্তু উদ্দেশ্য একই, উচ্চহারের মুনাফা রক্ষা করা। উপায় একই, শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীতে থাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা। ধনীসম্প্রদায়ের দাস বৈজ্ঞানিকদের তথা বিজ্ঞানের দৌলতেই আজ সমাজের এই শ্রী।

কলকারখানার মালিক ধনীসম্প্রদায় সহজে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছাড়বার পাত্র নন। বিজ্ঞানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাঁরা অন্য উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুফল বুঝতে পেরে তাঁরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করতে প্রয়াসী হলেন। সেজন্য গত কয়েক বৎসর ধরে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ট্রাস্ট, কার্টেলের প্রসার হচ্ছে। গোটাকয়েক সমবায় বিশেষ কোনো দেশ ও সাম্রাজ্য অতিক্রম করলেও বেশী সংখ্যক সমবায় দেশের মধ্যেই বিস্তৃত। কিন্তু দেশের বাজার বড়ই মন্দা। সেজন্য ছোট গণ্ডি তৈরি করার প্রয়োজন হল। ভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাধাবিপত্তিও অনেক। সেজন্য এই বৃহৎ সমবায়গুলি উপনিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে মনোনিবেশ করলে। ভের্সাই সন্ধিতে পৃথিবীর বাকি অংশটুকু ধনীজাতির, ধনীশ্রেণীর মধ্যে বণ্টন হয়ে গেল। উপনিবেশের ব্যবসায় মুনাফা বেশি, বাজার ভালো, সস্তায় কাঁচামাল ও মজুর পাওয়া যায় এবং ব্যবসায় রাজশক্তির সাহায্য পাওয়া যায়। উপনিবেশে ধনতন্ত্র না প্রবেশ করলে ধনতন্ত্র মারা যাবে, স্থানাভাবে। ধনতন্ত্রের সবচেয়ে উন্নত অবস্থা হল একচেটিয়া ব্যবসা এবং তারই বাজার হল উপনিবেশ। এই অধিরাজক-শাসনের বেড়াজালে ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক বৎসরে আরো বেশী করে, কারণ অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড এখন প্রায় স্বাধীন রাজ্যের সামিল, অর্থাৎ সে দেশেও ধনীসম্প্রদায় উঠেছেন, তাঁরাও মুনাফা বাড়াতে চাইছেন। জগতের ইতিহাসের যে ধারা প্রবল হয়ে উঠেছে, তারই সহযোগে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা বুঝতে হবে।

শুধু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে না। বাহ্যত, এখন ধনতন্ত্রের বোল-বোলাও অবস্থা। কিন্তু ভেতরে ঘুন ধরেছে। বাহ্যত, অন্ততঃ ওয়েলস্ এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে, জগৎ এক হয়ে আসছে। পৃথিবীর নানা স্থানে ছোট-বড় দল তৈরী হচ্ছে, পৃথিবীতে একটি মহারাজ্য স্থাপনের পক্ষে এ চিহ্নগুলো শুভ মনে হওয়া স্বাভাবিক। একধারে বৃটিশ-সাম্রাজ্য, অন্য ধারে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ; বলকান দেশেও তিন-চারটি ছোট রাজ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, ফরাসী-পোল-চেক মিলে একটা দল হয়েছে। তা ছাড়া, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রায় সবটাই য়ুরোপের কোনো-না-কোনো রাজ্যের অধীনে। তবুও কোথায় যেন শনির দৃষ্টিপাত হয়েছে। পৃথিবীর একাংশে মাত্র দু' বৎসর আগে, ১৯৩১ সালে, লক্ষ লক্ষ মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হল, কফি গুঁড়িয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হল, সৈনিক রেখে খনি থেকে পেট্রল এবং রবার-গাছ থেকে রবার নেওয়া বন্ধ করা হল, তুলোর ক্ষেত গাছ ও ফুলসুদ্ধ চষে ফেলা হল, চিনি যারা তৈরি করে তারা পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান করে উৎপাদন কমিয়ে দিলে ; তামা, টিন, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম বেশী প্রস্তুত হচ্ছিল বলে খনিতে মজুরের সংখ্যা ও খাটবার সময় কমানো হল, চিলির সোরার ব্যবসা উৎসন্ন গেল, কলে তৈরী সোরার জন্য। কিন্তু পৃথিবীর অন্যধারে লোকে খেতে পাচ্ছে না, মজুরি কমে গেছে, লোকের সংসার-খরচ জোটে না, দু' কোটির উপর শ্রমিকের হাতে কাজ নেই, প্রত্যেক জাতি রপ্তানি করবার জন্য প্রস্তুত, আমদানি করতে অনিচ্ছুক। চারধারে শুল্কের বেড়া, বড় বড় কলকারখানা বন্ধ, টাকার বাজার, শেয়ারের বাজার যায় যায়, সমগ্র য়ুরোপ আমেরিকার কাছে ঋণী, অথচ আমেরিকা সে ঋণ শোধ নেবে না জিনিস নিয়ে, রীতিমত ও যথাযোগ্য টাকা ধার নিয়েও সাহায্য করবে না, জার্মানীর হাতে টাকা নেই, ফ্রান্সের হাতে বিস্তর সোনা, এই সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে, অথচ সোনার কমতি নেই, পৃথিবী জুড়ে। এই দৈন্যকে শনির দৃষ্টি ছাড়া কি বলা চলে? যে শিশু বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রের দ্বারা লালিত-পালিত সেই শিশুই

বড় হয়ে বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রকে মেরে ফেলতে চায়। ইতিহাসের নিয়মই এই।

এই প্রবন্ধে ইতিহাসের স্থূলধারা ও তার একটিমাত্র রীতির ইঙ্গিত করা হল। ধারাটি ধন-সমাগমের ও বিজ্ঞানের ইতিহাস দ্বারা পুষ্ট। রীতি হল এই যে, কোনো একটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার ধ্বংসের কারণ লুকানো থাকে। ধ্বংসের কারণ—ভগবানের ইচ্ছা-সাপেক্ষ নয়। তার কারণ—ধনতন্ত্রমূলক সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর তদবস্থস্থিতি-প্রবণতা এবং বিজ্ঞানের কৃপায় নব নব উপায়ে উৎপাদনের প্রাচুর্য। এই সামাজিক জীবনের স্থিতি, প্রগতি ও অবনতির ব্যাখ্যা হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে—অর্থাৎ মানুষ তার সমবেত চাহিদা ও চেষ্টার ফলে যে উপায়ে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করেছে কিংবা চেষ্টা করছে জয় করতে তারই ইতিহাসের সাহায্যে। ভারতবর্ষের ইতিহাস জগতের ইতিহাসের অঙ্গ, বৈশিষ্ট্য তার পারিপার্শ্বিকের।

॥ পরিচয় ॥ ॥ বৈশাখ ॥ ১৩৪০ ॥

ইতিহাস ॥ ২ ॥

ইতিহাসের অর্থ ও রীতি সূচনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট করাই প্রবন্ধের এই অংশের উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের স্থূলধারাটি এক হলেও, বিভিন্ন দেশের পারিপার্শ্বিকের জন্য সে ধারা ভিন্নরূপ ধারণ করে ও ভিন্ন গতিতে চলে। যে দেশ কোনো কারণে কৃষিপ্রধানই রয়ে গেল, চাষবাস ব্যতীত যে দেশের লোকের জীবিকা-সংগ্রহের অন্য উপায় আবিষ্কৃত কিংবা অনুকৃত হল না, সেখানে সমাজের গঠন নির্ভর করে প্রধানতঃ জমির সত্বের উপর। কৃষিপ্রধান দেশে জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধটি অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধের মূলসূত্র হয়ে ওঠে। হপ্‌কিন্‌স্ নামক একজন চিন্তাশীল লেখক পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ বিচার করে এক পুস্তক লিখেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি দেখাচ্ছেন যে, সম্পত্তির উপর পিতার একচেটিয়া অধিকারের বিপক্ষে পুত্র বরাবরই আপত্তি করে এসেছে এবং সেই বিরোধের ফলে সমাজধর্মে অনেক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তাঁর ভাষায়, কৃষিপ্রধান সমাজে পিতার স্থান বর্তমান সমাজের মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টের (Monopolist Capitalist)—একচেটিয়া সত্বভোগী পুঁজিপতির মতন। রোমান আইনে পিতার অধিকার গোড়ায় কি ছিল এবং পরপর কিভাবে কমে এসেছিল দেখলে হপ্‌কিন্‌সের মন্তব্যে সায় দিতে হয়। চীন সভ্যতাকে আমরা নিতান্তই ধর্মপ্রাণ ও অটল-অচল

বলে শ্রদ্ধা করি—কারণ সেটি গোষ্ঠীপ্রধান। গ্রানে সাহেব দেখিয়েছেন যে, চীন-গোষ্ঠীর মধ্যে পিতা-পুত্রের আদর্শ সম্বন্ধের ভিত্তি হল জমিদারের প্রতি প্রজার শ্রদ্ধাভক্তি। ঈজিপ্টেও এই জমি-সত্ত্ব-সম্বন্ধ মনসবদারিতে পরিণত হয়ে সমাজের অন্যান্য কর্মে ও চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস থাকলেও ঐতিহাসিক নেই—সেজন্য এই কৃষিপ্রধান দেশের সম্পত্তিজ্ঞান কিভাবে তার সমাজকে গড়ে তুলেছিল আমরা ঠিক জানি না। একটা কথা তবু জোর করে বলা চলে, মুসলমান ও ইংরেজ যুগে জমিদারি-সত্ত্বের ইতিহাস না জানলে লোক-সমাজের ইতিহাস বুঝতে পারা যায় না। আমাদের লোকাচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে লোক-ধর্মে, আমাদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধে, শ্রাদ্ধতর্পণে, গ্রাম্য সমাজের মনোভাবে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। ভগবানকে রাজা এবং ভক্তকে প্রজা বলবার প্রথাটি অপ্রাচীন নয়। পৌরাণিক স্বর্গের সমাজও এই সমাজের প্রতীক। তা ছাড়া, মুসলমান সাম্রাজ্যের উৎপত্তি, বিস্তার ও পতনের মধ্যেও এ সম্বন্ধটি যে বিশেষভাবে কার্যকরী তা দেখতে পাই। মুসলমান রাজারা জমির ভোগদখলে বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করেননি বলেই তাঁদের প্রভুত্ব ভারতের ঐতিহাসিক ধারাকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করেনি। ইংরেজ যুগের আইনে ভোগসত্ত্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, সেজন্য আমাদের ইতিহাসের ধারাও বদলাচ্ছে। একদিকে স্থায়ী বন্দোবস্ত, অন্যদিকে প্রজাসত্ত্বের আইন,—ও খানিকটা তারই ফলে ফ্যাক্টরী-প্রতিষ্ঠা, এইগুলোই হল ভারতের বর্তমান যুগের নির্দেশ-চিহ্ন।

কৃষিকার্যের অপেক্ষা জীবনধারণের আরো ভালো উপায় আছে ইংরেজের কাছেই প্রথমতঃ আমরা এ খবরটি পেয়েছি। সেজন্য ইংলণ্ডের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইংলণ্ডে জীবনধারণের রূপ-পরিবর্তন এতই অদ্ভুত বলে লোকের মনে ঠেকে যে তাকে রেভলিউশন বা বিপ্লব

বলা হয়। কিন্তু এই ইনডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে আর একটা বিপ্লব লোক-চক্ষুর অন্তরালে সাধিত হয়েছিল। পশমের ব্যবসার জন্য মেষপালনের প্রয়োজন, সেজন্য অনেক জমি একত্রে থাকা চাই, তাই চাষার দখলে যেসব খণ্ড খণ্ড জমি ছিল সেগুলিকে এই জমিদার-ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের দখলে আনা হল। পার্লামেণ্ট কোনো আপত্তি করলে না, পার্লামেণ্টের প্রায় সব সভ্যই তখন ঐ দলের। ইংলণ্ডের গ্রাম-অবস্থা তখন অন্য গ্রাম ও কৃষিপ্রধান দেশের মতই ছিল। এখনকার ইংলণ্ডের অবস্থা দেখলে সে অবস্থা বোঝা যায় না, কেন না ইংলণ্ডই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে উৎপাদনের উপায়ভেদে, অর্থাৎ কল-কারখানার জন্য, সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ের পাতা শেষ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত ইংলণ্ড কৃষিপ্রধান ছিল, (১৭৯২ সালেই প্রথম রীতিমত শস্য আমদানি হতে লাগল), অনেক জমি তখনও ছোট জমিদারের হাতে। কুটির-শিল্পের সাহায্যে তখনও অনেক লোকে জীবনধারণ করছে। কিন্তু এই সময় জমিদারের হাতে ব্যবসালব্ধ টাকা জমতে শুরু হয়। তাঁরা উদ্বৃত্ত টাকায় নতুন জমি, চাষবাসের নতুন কল কিনলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে শস্যের দাম কমালেন। ছোট চাষীরা হটে গেল, কুটির-শিল্প নষ্ট হল, টুকরো টুকরো জমি বড় বড় জমিদারের দখলে এল। জমি দখলের জন্য অনেক সময় আইনের সাহায্যও নিতে হত না, তিন ভাগের ত্থ' ভাগ চাষী সম্মতি দিলেই চলত। সম্মতি তাদের দিতেই হত। ফলে ১৮০০ সাল থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ একর জমি জমিদারের হাতে এল, ১৮৫০ সালে আর কিছুই বাকি রইল না। চাষী ও গ্রামবাসীদের common land-এর উপর অধিকারও চলে গিয়েছিল। গরীবের ত্বঃখ উপশমের জন্য একটা পরিবেষ্টন-সমিতিও যে বসেনি তা নয়, ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু টাকাও চাষীরা পায়—কিন্তু সে টাকা ত্থ'দিনেই উবে যায়। তখন জমি ও গ্রাম থেকে বিতাড়িত চাষী বাধ্য হয়ে কলকারখানায় যোগ দেবার জন্য

শহরে এল, কিংবা এই জমিদার ও প্রজার বেড়াজালের বাইরে নতুন দেশে, আমেরিকায় চলে গেল।

ইতিমধ্যে আবার কলকারখানার নতুন মালিকরা জমিদার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এইজন্য জমির দাম খাজনার চল্লিশগুণ হয়। পুরানো জমিদারের গোষ্ঠী লোপ পেল, নতুন বড়লোকের সঙ্গে বিবাহাদি চলতে লাগল। রিফর্ম বিলের সময়, ১৮৩০।৪০ সালে, পশ্চিম য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ডেই জমিদারপিছু গড়পড়তা সবচেয়ে বড় এবং জমির সত্ত্বাধিকারী চাষীপিছু গড়পড়তা সবচেয়ে ছোট জমির চাষ হত। ইংলণ্ডের গ্রাম্য সমাজ এইভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হল—খাজনা উপভোগী জমিদার, ফসলের ব্যবসাদার জমিদার এবং চাষের মজুর সম্প্রদায়। কিন্তু গ্রাম্যসমাজও ক্রমে লোপ পেল, ইংরেজ শহরবাসী হল। যেখানে কলকারখানা সেখানেই ভিড়, সেখানেই শহর।

ইংরেজ-সমাজের আমূল পরিবর্তন ও নতুন শ্রেণী-বিভাগের জন্য একধারে যেমন ধনতান্ত্রিক কৃষিকর্ম তেমনি অন্যধারে নতুন কলকব্জার আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ-সমাগমই দায়ী। এই সময়কার কলকব্জার আবিষ্কারের বিবরণ পড়লে মনে হয় যে, আবিষ্কারকদের প্রেরণা একেবারেই নিঃস্বার্থ ছিল না। কয়লার খনিতে জল ভরে উঠছে, সেই জল তুলে ফেলতে হবে, মজুররা পারছে না, নতুন কল চাই, অশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবহারিক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ চালানো কল একটা খাড়া করলেন, পরে একজন আবিষ্কারক সেই কলগুলোকে অদলবদল করে নতুন কল সৃষ্টি করলেন, যার সাহায্যে খনি থেকে জল তোলাও হল, আবার এক শহর থেকে অন্য শহরে দ্রুততরভাবে এবং সস্তায় মাল পাঠানোও হল। এই উপায়ে তুলোর কারখানায়, রাস্তা তৈরিতে, খাল কাটানোতে, সরবরাহের উপায়ে, রেল-জাহাজে, কলের বহুল প্রয়োগ শুরু হল। অবশ্য এ সবই বিজ্ঞানের দৌলতে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের আপত্তি মঞ্জুর করে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ-বিজ্ঞান কিংবা টেকনলজি বলা চলতে পারে।

কলের প্রয়োগ থেকে শুধু উৎপাদনের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি হল তা নয়, বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে জীবনধারণের উপায়ও পরিবর্তিত হল। প্রথম পরিবর্তন উৎপাদনের উপায়ভেদে; মানুষের বদলে কল, যার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ দূর থেকে দূরতর হতে চলল, যার ফলে আবার উৎপাদন নামক প্রকৃত সামাজিক প্রক্রিয়াটি নৈর্ব্যক্তিক ও অমানুষিক হয়ে উঠল। দ্বিতীয় পরিবর্তন সামাজিক শক্তির রূপভেদে—পূর্বে ছিল যার অন্নসংস্থান বেশী তারই প্রতিপত্তি, এখন হল যার হাতে টাকা কিংবা যার টাকা ধার করবার ক্ষমতা বেশী তারই প্রভাব বেশী। পূর্বে সামাজিক প্রতিপত্তির মাপকাঠি ছিল প্রতিপালন, এখন সে ক্ষমতা সামাজিক কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্যই নিয়োজিত হল। পূর্বে ক্ষমতার দায়িত্ব ছিল সমাজের প্রতি, এখন শক্তির দায়িত্ব হল শুধু নিজের অর্থবৃদ্ধি এবং শক্তির প্রয়োগ হল শক্তিশালী ব্যক্তির এবং শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য চাই প্ল্যান, চাই নতুন কল, চাই নতুন বাজার, কিংবা পুরানো বাজারে চাহিদার নতুন স্তর, চাই র‍্যাশনালিজ্‌ম্‌, চাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির বুদ্ধি, চাই ব্যবহারিক ধর্ম, চাই মুনাফা বাড়াবার জন্য একনিষ্ঠতা। যত টাকা জমছে, ততই কল বাড়ছে; যত কল বাড়ছে, ততই টাকা জমছে—এ যেন একটা স্বাভাবিক নিয়ম! আগে, মধ্যযুগে, একজোড়া কাপড়ের জন্য তাঁতির বাড়ি যেতে হত, তাঁতি অর্ডার না পেলে ভালো কাপড় তৈরি করত না। কলের মালিক এই রকম ব্যক্তিগত অর্ডারের জন্য বসে থাকতে পারেন না। কল ও টাকাকে সর্বদাই খাটানো চাই, বসে থাকলেই তাদের মালিককে তারা, গল্পের ভূতের মতন, মেরে ফেলবে। সব জিনিস এক ছাঁচে ঢালাই হল ও বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হল। সেজন্যই শ্রমবিভাগ, যাতায়াতের সুগমতা এবং নতুন বাজারে অবাধ বাণিজ্য ও ব্যবসা চাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসের মূল কথা এই প্রয়োজনগুলো। এদের তাগিদেই ইংলণ্ড এখনকার বৃটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

কলকারখানার যুগে শ্রেণীবিভাগ সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রধান কথা। পূর্বে বলা হয়েছে, কৃষিজীবীদের অবস্থা নতুন জমিদারী

প্রথার জন্য খারাপ হয়েই আসছিল। গৃহশিল্পীরাও কলকারখানার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ল। নতুন ধরনের জমিদার ও কলকারখানার মালিক—এই দুই সম্প্রদায় মিশে নতুন ধনীর শ্রেণীতে পরিণত হল। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ নতুন ধরনের, কিন্তু নতুন সৃষ্টি নয়। সমাজের শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই ছিল, এখনও রইল, জমিদার ও প্রজার শ্রেণী এখন কলকারখানার মালিক ও মজুর শ্রেণীতে পরিবর্তিত হল মাত্র। আদিম যুগে, অসভ্য জাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অসভ্যদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ, কর্তৃপক্ষ ও শাসিত এবং বিবাহ-বন্ধনের উপযোগী শ্রেণীবিভাগ ঐতিহাসিক ঘটনা। অনেকের মতে এটা ইকনমিক বিভাগ নয়। যদি নাও হয়, তবুও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, অন্নসংস্থানের জন্য বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করে, কিংবা তার সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করার ফলে ইকনমিক শ্রেণীবিভাগ তাদের মধ্যে ছিল না। স্ত্রীপুরুষ, যুবাবৃদ্ধের জৈববিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম-বিভাগও ছিল। ধরা যাক, শ্রেণীবিভাগ হল কৃষিযুগের শেষদিকে। কিন্তু মানুষ সে সম্বন্ধে সচেতন তখনও হতে পারল না। প্রথম ঐতিহাসিক কারণ বোধ হয় এই যে, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অর্থাৎ পুরোহিতবৃন্দ এই বিভাগকে গোপন রাখতে চেষ্টা করলেন, ধর্মের সাহায্যে। এই সময় সামাজিক একত্বের প্রচারক হলেন পুরোহিত এবং উপভোগী হলেন জমিদার, পরে জমিদারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমিদার, অর্থাৎ রাজা। রাজা হলেন ধর্মের রক্ষক, কাণ্ডারী। এই যুগের কোনো বড় লেখকদের লেখায় সমাজ যে এক নয়, বিচ্ছিন্ন, এই কথাটি ধরা পড়ে না। ধরা না পড়লেও এ কথা ঠিক যে, সমাজ তখন শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। তখন বৃহত্তর সমাজের চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী ও পেশার প্রতিই মানুষের অনুরাগ পড়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের সর্বত্রই যে গিল্ড (guilds) ও প্রফেশন (profession) তৈরী হয়েছিল, এই ঘটনাই সভ্যতার ইতিহাসের সব কথা নয়। যেটি চক্ষুর অন্তরালে ঘটছিল, সেটি একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি। ক্যাথলিক চার্চের সৃষ্ট একত্বের চেয়ে এই ঘটনার সঙ্গেই বর্তমান সভ্যতার যোগসূত্র বেশী দৃঢ়।

যখন শুধু জীবনধারণের জন্য চাষবাসের বদলে শস্যের ও অন্যান্য কাঁচামালের আমদানি-রপ্তানিতে বেশী মুনাফা আছে দেখা গেল ; যখন রাস্তাঘাটের বদলে সমুদ্রযাত্রা, গ্রামের বদলে ছোট শহর, হাট ও মেলার বদলে বাজার, উঠানের একপাশে মরাইয়ের বদলে শহরের মধ্যে কিংবা নদীর ধারে গুদাম, সোজাসুজি লেনদেনের বদলে টাকার (ও পরে বিল ও চেকের) সাহায্যে লেনদেন শুরু হল, তখন একদল ভদ্রলোক উঠলেন, যাঁরা নিজেরা কিছু উৎপন্ন করেন না, অথচ উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে সাহায্য করেন। প্রথমে এই দলের অনেকে ইহুদী ছিলেন। কারণও ছিল,—প্রাথমিক খৃষ্টান ধর্মের বাধার জন্য খৃষ্টানরা তেজারতি করতে পারতেন না। সে বাধাও ক্রমে রোমান আইনের দৌলতে হ্রাস পেল। সেই হ্রাসের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। প্রথমে উত্তমর্ণ সুদ নিতেই পারতেন না। যা টাকা ধার দিতেন তাই ফেরত পেতেন। রোমান আইনে প্রথম ঠিক হল (Damnum Emergens), যদি ধার শোধ হবার দিন উত্তমর্ণ যে টাকা ধার দিয়েছিলেন কেবল তাই ফেরত পান, তা হলে যা ক্ষতি হতে পারতো (অথচ হয়নি) তার পূরণের নামে সামান্য কিছু বেশী টাকা উত্তমর্ণ গ্রহণ করতে পারেন। ইতিপূর্বেই উত্তমর্ণ ক্ষতিস্বরূপ সুদ গ্রহণ করছিলেন, তবে লুকিয়ে। যা অলক্ষ্যে ঘটছিল, আইনের দ্বারা তাকেই প্রকাশ্য ও আইনসঙ্গত করা হল। তারপর Lucrum Cessens, অর্থাৎ উত্তমর্ণ যে নিজে ব্যবসায়ে টাকা না খাটিয়ে পরকে টাকা খাটিয়ে বড়লোক হবার সুযোগ দিয়েছেন, এই স্বার্থত্যাগের জন্য লাভের টাকা থেকে উত্তমর্ণের আংশিক ক্ষতিপূরণ করার প্রয়োজন আইনে স্বীকৃত হল। শেষে Contractus Trinus—অর্থাৎ মোটা টাকা ও মুনাফার ক্ষতিপূরণের বিপক্ষে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে চুক্তিপত্র। (মধ্যযুগের আইনের ফাঁকি এখন অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদের সুদ ও মুনাফা সম্বন্ধে মতবাদে পরিণত হয়েছে বলে সন্দেহ হয়)।

কৃষিযুগের পরিণতি জমিদারতন্ত্রের যুগে—সে যুগের শ্রেণীবিভাগের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখা উচিত

যে এ যুগেই বড় বড় ব্যাঙ্ক তৈরী হয় ইটালী, জার্মানীর বাণিজ্যপ্রধান শহরে। সেখানে জমিদারের বদলে বণিক ও মহাজনরা অনেকটা স্বাধীনভাবেই নগরের কাজ চালাতেন। এঁরাই উপনিবেশে ব্যবসা চালাবার জন্য নিজেদের গভর্নমেন্টের কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন। গভর্নমেণ্টও সে অনুমতি সাগ্রহে দিলেন। তখন রাজা এবং তাঁর পারিষদ ও পার্শ্বচরবর্গ ই তখনকার গভর্নমেণ্ট। তাঁদের টাকার দরকার তখন খুবই বেশী। উপনিবেশ থেকে বিস্তর জিনিস আসতে লাগল, আমেরিকা থেকে সোনা রূপা এল। জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন ধনীর আবির্ভাব হল, squirearchy, ইংলণ্ডে যাঁদের প্রতিনিধি হলেন হ্যাম্পডেন। এই শ্রেণীর চাপে রোমান ক্যাথলিক চার্চের, জমিদারের, পাদ্রীর ও রাজার প্রভুত্ব কমল। যাঁরা ধর্মের সাহায্যে ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের ভাষায় এই system of protestant rational ethics-ই মধ্যসত্ত্বোপভোগী ধনীসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের হেতু। তাঁদের ব্যাখ্যায় কার্যকারণ সম্বন্ধটি উলটে গেলেও তাঁদের বিবৃতি অনেকটা সত্য। কোথায় রইল মানুষের জঠরের ক্ষুধা ? এখন এই মধ্যসত্ত্বোপভোগীর কৃপায় উৎপাদনের প্রয়োজন পরিণত হল মানুষের বদলে পকেট ও কলের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে, মুনাফার হার চড়ানো ও অবাধ বাণিজ্যের জন্য নতুন বাজারের সন্ধানেতে। একধারে মানুষ দল বাঁধছে, অন্যদিকে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা লোপ পাচ্ছে। সবাই ভাবলে—এই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম। বড় বড় পণ্ডিতে প্রকৃতির এই নিয়ম বোঝাবার জন্য বই লিখলেন, একটা শাস্ত্র পর্যন্ত খাড়া করলেন। এঁরাই হলেন নতুন ধনীর পুরোহিতবৃন্দ। ভারতের অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতবর্গ ও নেতারা এঁদেরই বংশধর। অ্যাডাম্ স্মিথ, রিকার্ডো শুধু অর্থনীতির নয়, ব্যক্তিতন্ত্রবাদেরও আদি ধর্মপ্রচারক।

ধর্মের এনামেল খসে যাবার পরও সমাজের শ্রেণীবিভাগ লোকের কাছে ধরা পড়বার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তখন অন্য প্রলেপ লাগানো হল—একটি দেশাত্মবোধ, অন্যটির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ না থাকলেও তার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত—Liberalism. এই দু'টি

মতবাদের ইতিহাস লেখবার স্থান এ নয়। মাত্র তাদের ভেতরকার সম্বন্ধটুকুর প্রকৃতি নির্ণয় করছে। সপ্তদশ শতাব্দীর য়ুরোপের রাজারা যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন, তার সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁরা জমিদার সম্প্রদায়ের নিকটে। সেই থেকে দেশাত্মবোধের সৃষ্টি। ক্যাথলিক ধর্মের দ্বারা পুষ্ট একতা-জ্ঞান এই দেশাত্মবোধের কাছে হেরে গেল। রাজা ও জমিদারবর্গের সন্ধির ফলে Physiocratism মতবাদ প্রচারিত হয়। ইংলণ্ডে এই মতের বহুল প্রচার হয়নি। নতুন ধনীকে তুষ্ট করার জন্য ইংলণ্ডে অন্য মতবাদের (Mercantilism) প্রয়োজন ছিল। ইংরেজই সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধের তথা ভূম্যাত্ম-বোধের মোহ কাটালে। ইংরেজ সর্বপ্রথম বুঝলে যে, ঔদার্যের মত মহৎ গুণ আর নেই। এই উদার পন্থাকে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এটি নতুন ধনীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ঔদার্যের দ্বারাই কলকারখানার মালিক নিজেদের সার্থকতা প্রমাণ করে, স্বার্থ গোপন করে, পরকে ভোলায়। প্রায় একশত বৎসর ধরে পুরোদমে ইকনমিক জাতীয়তা চালাবার পর প্রমাণ করার প্রয়োজন হল যে, বস্তুটি অসার। প্রমাণিত হল যে, সমাজের মূলে আছেন ব্যক্তি, যাঁর গোটাকয়েক জন্মগত অধিকার আছে, যিনি নিজের কিসে ভালো হয় নিজেই ভালো বোঝেন, অতএব তাঁকে নিজের মতে কাজ করবার সুবিধা দিলে জগতের অধিকতর উপকার হবে। অতএব সিদ্ধান্ত হল—ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। উদারতার অর্থ ব্যক্তির স্বাধীনতা। অবশ্য ব্যক্তি মানে যে-সে ব্যক্তি নয়, ধনী-ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তি। অন্য ব্যক্তির পক্ষে সহ্যগুণই সবচেয়ে বড় সদ্‌গুণ—কারণ সহ্য করলেই অন্ন জুটবে, নচেৎ জুটবে না। পৃথিবীতে নানা প্রকৃতির মানুষ আছে, কিন্তু অন্তরের মনুষ্যত্ব যখন একই বস্তু তখন ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ নেই, তখন সেই ভেতরের মনুষ্যত্বকে সুবিধা দেওয়া হোক, জয় হোক সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার, জয় হোক সাধারণতন্ত্রের! ভেতরের মনুষ্যত্ব অর্থে হিসাবী জীবটুকু, যার একমাত্র কাজ সস্তায় কিনে মাগ্যিতে বেচা, যার

একমাত্র প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সিদ্ধি। (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলেই বুদ্ধিবাদের প্রকোপ-বৃদ্ধি হয়)। আদত কথা, ব্যবসা চালাবার জন্য কোনো বাধাবিঘ্ন থাকলে চলবে না, না থাকবে রাজনৈতিক বাধা, না থাকবে শুল্কের, না থাকবে দূরত্বের। টাকা ঘরেই রয়েছে, সে টাকা খাটাবার জন্য, কাঁচামাল পাকামালে পরিণত করে বেচবার জন্য বাজার চাই। মজুরদের যেখানে সেখানে চাকরি নেবার, জমি, ঘরদোর ছেড়ে কলকারখানার দরজায় ভিড় করার জন্য স্বাধীনতা চাই। দেশে যে বাধা দেবে সে জেলে যাবে, বিদেশে যে বাধা দেবে তার সঙ্গে যুদ্ধ হবে। অর্থাৎ বাজারের কোনো দরজা থাকবে না, বাজার হবে অনিয়ন্ত্রিত। মাত্র একটি নিয়ম সেখানে থাকবে। সেটি মানুষের তৈরী নয়, বোধ হয় ভগবানের, ভগবানের না হলে প্রকৃতির, প্রকৃতির না হলেও মানব-প্রকৃতির, তাও না হলে তাই হওয়া উচিত। নিয়মটি হল মুনাফার আশা। বড় বড় পাদ্রী, বড় বড় জীবতত্ত্ববিদ, বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ, দার্শনিক, অর্থনীতির মহারথীরা বল্লেন, 'হাঁ হাঁ, তা তো বটেই, আমরাও ভেবে তাই বুঝেছি।' অমনি বই লেখা হয়ে গেল। অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহ এই বিষয়টির ইতিহাস অতি চমৎকার-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বিচিত্রা'র পাতায়।

ইংলণ্ডই য়ুরোপ নয়। ফ্রান্সে ও জার্মানীতে জমিদারতন্ত্রের প্রকোপ আরো বেশী দিন ধরে চলেছিল বলে সে সব দেশে নতুন শ্রেণী অত শীঘ্র গঠিত হতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লবের পরেই ফ্রান্সে এবং আরো প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে জার্মানীতে নব্য-সম্প্রদায় মাথা তোলেন। ফ্রান্সে ছোট ছোট চাষী জমির অধিকারী হওয়ার দরুন, কয়লা এবং লোহা না থাকার দরুন এবং উপনিবেশ হস্তান্তরিত হবার জন্যই ফরাসী মধ্যসত্ত্বোপভোগী শ্রেণী ভালোভাবে সমাজের ও রাষ্ট্রের বুক জুড়ে বসতে পাননি। জার্মানী নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। একাংশে জমিদার, অন্যাংশে ছোট চাষী, মাঝখানে কলকারখানার মালিক ও বণিকের প্রাধান্য ছিল। জার্মানীর আবার উপনিবেশ পর্যন্ত ছিল না। এই সব নানা কারণে ফ্রান্স ও জার্মানীতে ইংলণ্ডের মত মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের প্রভাব ফুটে উঠল না। যতটুকু ফুটেছিল তারই জন্য industrial movement-এর গোড়ার দিকে ফ্রান্স ও জার্মানীকে খানিকটা উদারপন্থী হতে হয়। এখনকার তুলনায় তখনকার বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্কের বাধা কমই ছিল।

কিন্তু সব দেশেরই একই সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চলতে পারে না। বাজার কই? দেশের সমাজের নতুন স্তর কিংবা দেশের বাইরে উপনিবেশ ভিন্ন বাজার নেই। অন্য দেশের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যে ও বিনিময়ে বাধা তোলে ধনীসম্প্রদায়ের সৃষ্ট দেশাত্মবোধ। তাই বাকি পৃথিবীর উপর টান পড়ল। এশিয়া ও আফ্রিকা ভাগ হল। যে দ্রব্য-উৎপাদনে তুলনায় বেশী লাভ সম্ভব, সেই বিশিষ্ট দ্রব্য এক দেশে বেশী প্রস্তুত হতে লাগল। প্রতিযোগিতার হাত থেকে তবু রক্ষা নেই। সব দেশ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হল। শ্রম-বিভাগের নতুন সংস্করণ শুরু হয় এই অবস্থা থেকে। আগে দেশের সমাজে ছিল ধনী ও নির্ধন, মালিক ও মজুর, কল-কারখানা ও কৃষি, এখন সেই বিভাগ পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। য়ুরোপ পাকামাল রপ্তানির এবং এশিয়া, আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ও আমেরিকা কাঁচামাল সরবরাহের ভার নিল। অর্থাৎ ধনীর স্বদেশ বলে কিছু রইল না এবং ধনোৎপাদনের সাহায্যে শ্রমিকের ভৌগোলিক পরিসীমাও লোপ পেল। কিন্তু উপনিবেশ কারুর ভাগ্যে বেশী, কারুর ভাগ্যে কম, কারুর ভারবাহী জাহাজ বেশী, কারুর কম। তাই মন্দভাগ্য দেশের ধনীরা দেশের দিকে মন দিলেন। আগে দেশের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে জিনিস পাঠাতে হলে শুল্ক দিতে হত। শুল্ক তুলে দেওয়া হল। রাস্তাঘাট, খাল, রেল-লাইন দেশকে ছেয়ে ফেললে। একা ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড ব্যতীত য়ুরোপের বাকি সব দেশই আত্মরক্ষায় অর্থাৎ দেশের ঐক্যসাধনে মন দিলে। স্টেট হল ভগবান, জাতিগত ঐক্য হল সবচেয়ে শক্ত বাঁধন। এটাই হল জার্মান লিবারেলিজ্‌ম্। এর সঙ্গে ইংরেজ লিবারেলিজ্‌মের পার্থক্য অনেক। জার্মান উদারপন্থার মূলকথা স্টেট ও সমাজগত ঐক্য, ইংরেজী উদার-

পন্থার মূলকথা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট ; ইংলণ্ডের উদারপন্থা উপনিবেশ ও অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের ফল, জার্মানীর হল উপনিবেশ না থাকার প্রতিক্রিয়া। এজন্যই বোধ হয় ইংরেজী চিন্তাধারায় লালিত ভারতবাসী কমিউনিজ্‌ম্‌, ফ্যাসিজ্‌ম্‌, নাৎসি আন্দোলন ঠিক বুঝতে পারে না। জার্মানীতে উদার মতের প্রচারক ছিলেন হেগেল, ফিখ্‌টে প্রভৃতি দার্শনিক, লিস্টের মত অর্থ-নীতিবিদ এবং আমনের মত জাতিতত্ত্ববিদ। সকলেই ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতেন, অর্থাৎ ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও বৈশিষ্ট্যকে গণ্য করেই তাঁরা নিজেদের মত প্রস্তুত করছিলেন। ইতালীতে এ মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন সিসমণ্ডী। লিস্ট দেখলেন, বিশ্বজনীন অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য সব দেশের পক্ষে সব সময় উপযুক্ত নয়। কোনো দেশ কৃষি-প্রধান, কোনো দেশ ব্যবসা ও বাণিজ্যপ্রধান, অতএব অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা চাই। লিস্ট বলেন, ইকনমিক নিয়মাবলী ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক নয়। প্রত্যেক দেশের অবস্থা প্রায় সমান সমান হলে তবেই তাদের মধ্যে অবাধ ব্যবসা চলতে পারে। সেজন্য গভর্নমেণ্টের, রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন—কেন না সমাজের অন্য কোনো শক্তি বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করতে পারে না। ইতিমধ্যে স্টেটের সাহায্যে দেশের উৎপাদন-শক্তি সর্বাঙ্গীণ হয়ে উঠুক, ইংলণ্ডে যেমন অবাধ ব্যবসা-যুগের পূর্বে ছিল, যেমন আমেরিকায় সে সময় হচ্ছে। লিস্টের মতবাদে গোটা-কয়েক জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। (১) ঐতিহাসিক অবস্থা ও পারম্পর্যের প্রতি শ্রদ্ধা ; (২) ইকনমিক জাতীয়তা ; (৩) স্টেটের উপর নির্ভরশীল ; (৪) অবাধ বাণিজ্যের আপাত অসম্ভবনীয়তা। লিস্ট অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে ছিলেন না। বরঞ্চ স্বপক্ষেই ছিলেন, তবে তখন নয়—পরে, স্টেটের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পরে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে লিস্ট দেশবাসীকে বোঝালেন যে, ভৌগলিক দূরত্ব না ঘোচালে দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলতে পারে না। তাঁরই উপদেশে জার্মানীতে রেল-লাইন বিস্তৃত হয়। লিস্টের মূল বক্তব্যগুলি লক্ষ্য করলে সন্দেহ হয় যে, তাঁর মতবাদ জার্মানীর

ধনতন্ত্রের পরিপোষক মাত্র। অন্য দিক দিয়ে দেখলেও তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমেরিকা থেকে লিস্ট ব্যালেন্সড্ ইকনমি (balanced economy) শিখে এসেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, স্টেটকে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে, এবং কৃষিজীবী ও ব্যবসাজীবীদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কোনো একটি বিশেষ উপায় বা শ্রেণী অন্য কোনো উপায় বা শ্রেণীকে গ্রাস করবে না। তখন জার্মান শ্রমিকরা শ্রেণীবদ্ধ হয়নি, তাই উপায় বলতে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শস্য-উৎপাদন, এবং শ্রেণী বলতে রাজকর্মচারী, ব্যবসাদার, জমিদার, কৃষিজীবীই বোঝাতো। এই জার্মান (প্রুশিয়ান) জমিদার সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ জমিদারের মতন ছিলেন। তাঁরা ছিলেন প্রভু ও ধনী, জমিদারি ছিল তাঁদের প্রকাণ্ড, লোকলস্করের সাহায্যে জমিদারিতে বসে তাঁরা জমিদারি চালাতেন। তাঁরা এখন স্টেটের কাছ থেকে লিস্টের মতানুযায়ী সাহায্য চেয়ে বসলেন, সমগ্র দেশের খাদ্য সরবরাহের নামে। স্টেট তাঁদেরকে অনেক সুবিধা দিতে বাধ্য হল। প্রোটেকশানিজ্ম্ (protectionism)-এর মোদ্দা কথা এই—দেশের মধ্যে দেশাত্ম-বোধের নামে নতুন ধনী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ ব্যবসাদার ও জমিদারকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া; স্বাধীনতার প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফাবৃদ্ধি করা ও এমন বাজার তৈরি করা, যেখানে অন্য দেশের সস্তা মাল প্রবেশ করতে পারবে না। এ স্বাধীনতা স্টেটের দান।

এইবার ইংলণ্ড অন্যপথ ধরলে। ইংলণ্ডের ধনতন্ত্র আরো পুরাতন, দেশটাও ছোট, সব মাল দেশে তৈরী হয় না, পুরো বছরের খাবারের জন্য অন্য দেশ থেকে মাল আমদানি করতে হয়, অথচ টাকা বেশী, উপনিবেশ অনেক। ভারবাহী জাহাজ, জীবনবীমা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা ইংলণ্ড পৃথিবীকে কিনে রেখেছে। এ অবস্থায় ধনতন্ত্র সে দেশে সহজে উগ্র হয়ে উঠবে আশা করা যায়। কিন্তু উগ্ররূপ পরকে দেখানো যায় না। মালিকের দল তাই প্রতিযোগিতার কুফল বুঝে খুব বড় বড় কলকারখানা ফাঁদলেন। দেশের মধ্যে বৃহৎ

অনুষ্ঠানগুলিতে অর্থ ও বিজ্ঞানের জোরে এবং উপনিবেশে নিজেদের রাষ্ট্রের জোরে একচেটিয়া ব্যবসার পত্তন করলে। একচেটিয়া ব্যবসা চালাবার জন্যই সমুদ্রপারের উপনিবেশের সার্থকতা। আজ সে সার্থকতা সর্বত্রই ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে, উপনিবেশের ধনীসম্প্রদায় স্বদেশ-হিতৈষী হয়েছেন। যে কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন পতাকা, সেই কারণে ভারতবর্ষেরও গৈরিক পতাকা। নানা বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এখানেই বিশ্বের সাথে আমাদের যোগ। ইতিহাসের এই ধারাতেই আমাদের বর্তমান ইতিহাস পুষ্ট হচ্ছে, আমাদের সমাজ ও মন গড়ে উঠছে।

আমাদের মানসিক ইতিহাসের তিনটি বর্তমান লক্ষণ আছে। এক—দর্শন ও ধর্মের ভাষার নিয়ত প্রয়োগ, দুই—দেশাত্মবোধ, ও তিন—উদার মত। এই তিনটি নিদর্শন কিন্তু আমাদের ইতিহাসের মর্মকথা ব্যক্ত করে না। বরঞ্চ গোপন করে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, কংগ্রেস ও ও শিক্ষিত সমাজ এই গোপন ষড়যন্ত্রের নায়ক। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের চক্রান্ত ধরা পড়েও পড়ছে না। মহাত্মাজী ও মালব্যজী অচ্ছুৎদের মন্দিরে ও কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত, কিন্তু চতুর্বর্গের উপর হস্তক্ষেপ না করে। অচ্যুতোদ্ধার সমিতির সভাপতি বিড়লা ব্রাদার্সের একজন। কংগ্রেস শ্যাম রাখেন না কুল রাখেন নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। একধারে ধর্ম, অন্যধারে অর্থের প্রতিকূল টানে কাম নিষ্কামের কোঠায় উঠেছে—মোক্ষ ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। কংগ্রেস কাকে সন্তুষ্ট করবেন—ব্যবসাদারকে না জমিদারকে? অনুষ্ঠান কাকে সন্তুষ্ট করছে, এই প্রশ্নের উত্তরই অনুষ্ঠানকে বিচার করে। ধনী-সম্প্রদায়ের কার্যাবলী দেখলে বোধ হয় যে, তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছেন, তাই তাঁরা কংগ্রেসকে খানিকটা সাহায্য করতে প্রস্তুত। শ্রমিকেরা বোধ হয় এখনও সচেতন হয়নি, তবে বোধ হয় হতে বেশী দেরি নেই। একদিকে ভারতের ইতিহাস এখনও লিবারেল যুগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে একচেটিয়া ব্যবসার তাগিদে যে অধিরাজ্য বা ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ তৈরী হয় তারই

ফলাফল আমাদের সকলকে ভোগ করতে হচ্ছে। এই দু'এর মধ্যে বিরোধ রয়েছে, কিন্তু সেটা গতির হারের, সাময়িক ক্রমের পার্থক্যে। বিরোধটি প্রকৃতিগত নয় ; অনেকের মতে আমাদের সমাজ অতি শীঘ্রই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, বাইরের চাপে, যেমন ল্যাবরেটরীতে অতিরিক্ত আলোর জোরে একটি জীবকোষ অল্প সময়েই বিভক্ত হয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দেশ অনেক বেশী প্রত্যাশা করে। সে প্রত্যাশা তাঁরা মেটাননি বলে তাঁদের সামাজিক কৃতঘ্নতার তুলনা নেই। তাঁরা বিদেশী রাজা ও ধনীসম্প্রদায়ের আশ্রয়ে জন্মেছেন বলে পরিত্রাণ নেই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কার্যাবলী অর্থাৎ তাঁদের বই সকলকেই পড়তে হয়। বিশেষতঃ ঐতিহাসিকদের। দু' একজন ছাড়া এঁরা সকলেই দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ, সকলেই ইংরেজী ধরনের উদারপন্থী। কেউই সামাজিক ইতিহাস লেখেন না। কারুর লেখাতেই ইতিহাসের ধর্ম ও রীতি প্রকাশ পায় না। কার্যকারণ-সম্বন্ধ তাঁদের দেখাতে হয়, কিন্তু সে সম্বন্ধ নির্ভর করে শুধু প্রমাণের উপর। প্রমাণ-সাপেক্ষতাই তাঁদের যৌক্তিকতার একমাত্র অস্ত্র। তাঁরা উকীল হলেও পারতেন, ঘটনার বিপর্যয়ে, বোধ হয় নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বড় উকীল না থাকার দরুন, ঐতিহাসিক হয়েছেন। ইতিহাসের আদিতে ও ঘটনার পারম্পর্যের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা কাজ করে তার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই। তাঁরা সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাস লেখেন না। কিভাবে সমাজ বাঁচবার চেষ্টা করছে, ভালোভাবে বাঁচবার জন্য সমাজ-গঠন কোন সঙ্কট-মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে—এ বিষয়গুলি তাঁরা বাদ দেন। তাঁরা জনসাধারণের ইতিহাস লেখেন না, জনসাধারণকে অবহেলা করেন, বোধ হয় ঘৃণাও করেন। সেজন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা হয় ছদ্মবেশী উকীল, না হয় ছদ্মবেশী কেরানী। তাঁদের ইতিহাস পুরানো কাসুন্দী ঘাঁটা, সমসাময়িক ইতিহাস নয়, ভবিষ্যতের ইতিহাসও নয়। যা হচ্ছে, যা হয়ে এসেছে তাই ভালো—এই প্রমাণ করাই তাঁদের গূঢ় অভিসন্ধি।

ভারতবর্ষের অর্থনীতিবিদ্‌দের বিপক্ষেও অনেক আপত্তি রয়েছে। আমরা পড়াই অ্যাডাম স্মিথ্, রিকার্ডো, মার্শাল, যাঁদের মতগুলি অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ বাণিজ্যের ধনতন্ত্র ও অধিরাজকতন্ত্রের সমর্থনের জন্য তৈরী হয়েছিল। কিন্তু মনে মনে চাই আমরা protectionism, যার প্রকৃতিও পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যা পড়াই এবং যা চাই, তার মধ্যে মতের বিরোধ রয়েছে। তা ছাড়া আমরা ইনডাস্ট্রিয়ালিজ্‌মের বিরুদ্ধে, চরকা চালানো ও চাষবাসের স্বপক্ষে। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য ও স-বাধ বাণিজ্য, দু'ই কলকারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যে দেশ কৃষিপ্রধান তাদের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। বলকান দেশ ও রুশের ইতিহাস আমাদের পড়া উচিত, সবুজ-বিদ্রোহের ইতিহাস আমাদের জানা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়েও ওসব দেশের ইতিহাস পড়ানো হয় না। নিখিল ভারতীয় ইকনমিক কনফারেন্সে মার্শাল কিংবা তাঁর দলের মত ভিন্ন অন্য মতের আলোচনা করলে হাস্যাস্পদ হতে হয়। নিখিল ভারতীয় ইকনমিক কনফারেন্স যে চলছে তার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের বংশগত একটা ঐক্য আছে। সেটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উদারপন্থাকে সমর্থন করা। অটোয়া চুক্তির তর্কে আমাদের অর্থনীতিবিদেরা ধনীসম্প্রদায়ের স্বার্থই দেখেছিলেন। যাঁরা আপত্তি করলেন তাঁরা বম্বেওয়ালার মুখ চেয়ে কিংবা দেশাত্মবোধের দোহাই দিয়ে, যাঁরা সমর্থন করলেন তাঁরা বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের মূল কথাটি অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ-সন্ধান না বুঝে। সামাজিক ইতিহাসের দিকে কেউ দেখলেন না। ভারতবাসীর এই মানসিক কাঠামোতে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যকে বসানো হয়েছে। সেজন্য বিজ্ঞানের ডাক্তার হয়েও গোঁড়ামি, বিজ্ঞান-শিক্ষার বদলে শিল্প-শিক্ষার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্রেরা আর্টস-বিভাগের ছাত্রের চেয়ে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয় এবং তাঁরাও গভর্নমেণ্টের চাকরি না পেলে বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিয়ে শিল্পবিদ্যার কলেজ প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বচন উদ্ধৃত করে। আর দর্শন! আমাদের দর্শনের পুস্তক সবই দর্শনের

ইতিহাস, সে ইতিহাসও আবার রেকর্ড ঘেঁটে রিপোর্ট লেখা। সাহিত্যের আজ ভীষণ দুর্ভাগ্য। তরুণ-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা সব বড়লোক হতে চান, উপরের শ্রেণীতে উঠতে চান। সেখানে যেটুকু দুঃখের খবর পাই সেটুকু অর্থের অনটনে কিংবা রোমাঞ্চকর ভাববিলাসের অসুবিধায়।

এই হল আমাদের দেশের অবস্থা। এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য হল—বিংশ শতাব্দীতে জীবনধারণ করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর উপযোগী জীবনধারণের উপায় অবলম্বন করা। এখানে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের কথা ওঠে না। কথা ওঠে ঐতিহাসিক রীতিনীতির, যার মধ্যে দৈবশক্তির ক্রীড়া না থাকলেও কার্যকারণ-সম্বন্ধের দুর্নিবার পরাক্রম লক্ষ্য করা যায়।

॥ পরিচয় ॥ শ্রাবণ ॥ ১৩৪০ ॥

ইতিহাস ॥ ৩ ॥

আমি ইতিপূর্বে বরাবর 'শ্রেণী-বিরোধ' কথাটি ব্যবহার করেছি। এই অধ্যায়ে আমি 'শ্রেণী'র তাৎপর্য বোঝাতে চেষ্টা করব। ন্যায়-শাস্ত্রের সংজ্ঞাস্থাপন এক্ষেত্রে অসম্ভব; কারণ ইতিহাসের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা এবং অন্য প্রত্যয় থেকে শ্রেণী-প্রত্যয়কে বিযুক্ত করা যায় না। ইতিহাসের সংজ্ঞা নয়—ইতিহাসের প্রত্যয় কর্মের পন্থা নির্দেশ করে।

সর্বপ্রকার জ্ঞানেই প্রত্যয়ের আবশ্যক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলো ছিন্নভিন্ন অবস্থায় উপেক্ষিত হয়, একের সঙ্গে অন্যের যোগ হয়তো থাকে না, থাকলেও সে যোগটি পরিষ্কার নয়। জ্ঞানের দিক থেকে অথচ অভিজ্ঞতাগুলোকে যুক্তভাবে দেখবার একটা তাগিদ থাকে। প্রত্যয়ের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হয়। একবার গ্রথিত ও সমন্বিত হলে সেই প্রত্যয়েরই সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত ও নূতনতর হয়। প্রত্যয়ের সাহায্যে, সেই প্রকারের অভিজ্ঞতার গভীরতর সমালোচনা সম্ভব হয়। এই উপায়ে একজনের জ্ঞান সর্বসাধারণে ভোগ করতে পারে। প্রত্যয় হল সমন্বয়-জ্ঞানের ভাষা এবং ভাষার উপর কারুর একচেটিয়া অধিকার নেই। প্রত্যয়ের অন্য প্রকৃতি হল বেষ্টনীর সঙ্গে জ্ঞানীর ও পূর্বার্জিত জ্ঞানের সমযোগ-সাধন। জ্ঞানীর ও জ্ঞানের মধ্যে চিরকালই যে বৈরীভাব থাকে তা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু জোর করে বলবার দরকার রয়েছে যে, বৈরীভাব না দূর করলে

জ্ঞানবৃদ্ধিও হয় না, জ্ঞানীও সে জ্ঞানের সাহায্যে সম্পূর্ণ হন না, শান্তিও পান না। একমাত্র প্রত্যয়ের দ্বারাই বৈরীভাব দূরিত হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি ও সম্পূর্ণতা-স্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে। অভিযোজন-কার্যের ফলে পূর্ব-দৃষ্টি আসে। পূর্ববোধের সাহায্যে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে সজ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যদি বিশদ জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তা হলে প্রত্যয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি কোনো জ্ঞানই কখনও পাবে না।

ইতিহাসও পাবে না। ব্যক্তির দিক থেকে বলা চলে যে, ইতিহাসের ব্যাপকতর প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত, বর্তমান, এমন কি ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা সুব্যবস্থিত হয়ে ব্যক্তিকে সুসম্পূর্ণ করে। এই হিসাবই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি প্রকৃত দর্শন। কোনো জ্ঞানকে বিজ্ঞানের স্তরে তুলতে গেলে প্রত্যয়ের প্রয়োজন আরো বেশী করে অনুভব করতে হয়, এমন কি গোটাকয়েক নতুন রকমের প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের আলোচ্য জ্ঞান হল ইতিহাস, যার বিষয় হল সামাজিক অভিজ্ঞতার ধারা। সে ধারার রীতিনীতি আছেই আছে, কেন না অভিজ্ঞতা এক পক্ষে মানুষেরই, এবং মানুষের কার্যাবলী পুরোপুরি এলোমেলো কি অগোছাল নয়। অন্যপক্ষে বহিঃপ্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত রয়েছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে বহিঃপ্রকৃতির নিয়মাবলী মানব-প্রকৃতির নিয়মাবলী অপেক্ষা সুসম্বদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপাদান-গুলির একাংশ অন্যাংশের চেয়ে বিজ্ঞানাধীন। বহিঃপ্রকৃতির কোনো বিশেষ ঘটনাকে ঘটনা-পারম্পর্য থেকে যূথভ্রষ্ট করা চলে, নিরালম্ব করা যায়, করলে বৈজ্ঞানিকের কোনো সামাজিক ক্ষতি হয় না ; কিন্তু মানব-প্রকৃতির বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতাকে ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত করা চলেই না, কারণ এই ধারাবাহিকতা যান্ত্রিক অনুক্রম নয়, পূর্বে ও পরের অন্বয়, এবং বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সামাজিক ক্ষতি হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই দুই কারণে বাইরের ঘটনাকে পরীক্ষাগারে পুনর্গঠিত করা চলে এবং অন্তরের ঘটনা-সমাবেশ নিরুপম থেকেই যায়। (অবশ্য সবই আপেক্ষিকভাবে)। সংখ্যা শ্রেণীর একটি সাধারণ গুণ এবং তার অন্য সাধারণ গুণ সম্ভব হয় একটি বিশেষ গুণের পুনরাবৃত্তির দরুন।

(এখানে শ্রেণী অর্থে অঙ্কশাস্ত্রের 'ক্লাশ' বলছি)। অতএব পদার্থ-বিজ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মাধীন এবং অধীন হয়েই সার্থক, মনোবিজ্ঞান কিংবা সমাজতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অধীন হতে পারে না। অধীন হতে পারে সংখ্যা-শাস্ত্রের (Statistics), কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের (Mathematics) অধীনে এলে সার্থক হয় না। পূর্বোক্ত দুই বিদ্যার মধ্যে পার্থক্যটুকু সকলেরই বিদিত।

ইতিহাসের মতন কোনো মানুষ-সংক্রান্ত সামাজিকতত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের মতন বহিঃপ্রকৃতি-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের রূপ কখনও নিতে পারবে কিংবা নেওয়া উচিত—এসব বিষয়ে বেশীদূর তর্ক চলতে পারে না। কারণ, যে উপায় অবলম্বন করলে তর্কের সিদ্ধান্ত হয় সেই উপায়টিই বর্তমানে ন্যায়ের বিচারাধীন। তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক সমাজের নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও যখন নানা দোষ থেকেই যাবে, তখন পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে সমাজতত্ত্ব হয়তো অচিরেই পদার্থ-বিজ্ঞানের কোঠায় উঠবে, তবু তার সাহায্যে সমাজের ভবিষ্যৎ প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে কি না সন্দেহজনক। বিজ্ঞানসম্মত সমাজ হয়তো এমন হবে, যেখানে ব্যক্তি কিংবা অন্য অবৈজ্ঞানিক শক্তির দ্বারা নবতর সমাজের পুনর্গঠন একান্ত অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী না করাই ভালো। আমার বক্তব্য গোড়াতেই বলে রাখছি—সমাজের আংশিকভাবে সত্য নিয়মগুলিকে (ঘটনার সাধারণ অভিমুখিনতা কিংবা ঝোঁকগুলিকে) পূর্ণতর সত্যে পরিণত করতে গেলে আপাতত যে উপায়ে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর সত্যের সন্ধান মিলেছে, সেই উপায় অবলম্বন করাই ভালো। উপায়টি হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেটি নির্ভুল না হলেও নিতান্তই উপকারী। এবং জ্ঞানের দিক থেকে দেখলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইতিহাস হল প্রত্যয়ের ইতিহাস। তাই বলে ইতিহাস পদার্থ বিজ্ঞান নয় এবং পদার্থ কিংবা রসায়নবিদ্যার প্রত্যয় ও ইতিহাসের প্রত্যয় এক জিনিস নয়।

পদার্থ-বিজ্ঞানকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধি হিসাবে ধরছি। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রকৃতির পার্থক্যটুকু স্বীকার

না করে উপায় নেই। আমার মতে তিনটি মূলগত পার্থক্য আছে। (১) পদার্থ-বিজ্ঞান দেশ ও বিশেষতঃ কাল-নির্দেশ থেকে মুক্ত—অণুর গঠন ভারতবর্ষেও যা, হল্যাণ্ডেও তাই; আবার আজও যা, বহু শতাব্দী পূর্বেও তাই ছিল এবং আজ হতে শতবর্ষ পরেও তাই থাকবে, পরিবর্তনটি মতের মাত্র; কিন্তু ইতিহাস দেশ ও কাল-নির্দিষ্ট। অবশ্য দেশ ও কাল-নির্দেশ নিয়তির নির্দেশ নয়, নিয়মাধীন। (২) পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয়গুলি (data) কিংবা 'দত্তি' সকল প্রত্যক্ষ-ভাবে নিরীক্ষণ-লব্ধ, তার প্রতিপাদন পরীক্ষিত ও সর্বদাই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যক্ষের সঙ্গেই পদার্থ-বিজ্ঞানের কারবার। ইতিহাসে নির্দিষ্টের সংখ্যা নিতান্তই কম। যেসব ঘটনা ঘটেছে তারই পুরাতন কিংবা সমসাময়িক বিবৃতি, পুঁথি, শিলালিপি প্রভৃতি থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে হয়। শুধু এই চিহ্নগুলিকেই প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা চলতে পারে, ঐতিহাসিকের বাকি কাজ অপ্রত্যক্ষভাবে পুনরুদ্ধার; অনেকটা জুরি কিংবা ডিটেকটিভের মতন। ইতিহাসের প্রণালী হল প্রধানতঃ অবরোহী। ঐতিহাসিকের জানা নেই কোন ঘটনা সত্য, কোনটি অসত্য, কোনটি অতিরঞ্জিত; সত্য ঘটনা তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়। (এখানে পুরাতন ঘটনার বৃত্তান্ত ও পারম্পর্যের বিবৃতি অর্থে ইতিহাস কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে)। All facts are born free and equal বলা চলে না, কারণ শৃঙ্খলা ও শিকলের গুরুত্ব এক নয়। বরঞ্চ, পূর্বোক্ত উপায়ে যেসব দেশ ও কাল-নির্দিষ্ট ঘটনা জানা যায় সেই সব ঘটনাকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ঐতিহাসিকের জ্ঞান অ-প্রত্যক্ষ ও অবরোহী। (৩) পদার্থ-বিজ্ঞানে যতটুকু অবরোহ-প্রণালী বা বিলোম ব্যবহৃত হয় সেটি শুদ্ধ, অর্থাৎ তার মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, অবান্তর নামে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়। ইতিহাসে তা চলে না, ইতিহাসে রবাহূতের সংখ্যা কম নয় এবং তাদেরকে অন্ততঃ মৌখিক অভ্যর্থনা করতেই হয়। সেজন্য ইতিহাসের অবরোহ-প্রণালী অ-শুদ্ধ। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ

রয়েছে তার মধ্যে মানুষের প্রবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্দেশ্য প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াকে ধারণ করতে হবে। বহিঃপ্রকৃতিতে যেসব আকস্মিক ঘটনা ঘটে তার প্রভাবকেও অবহেলা করলে চলবে না। ইতিহাসে আকস্মিকের স্থান আছে, যেমন জীবের অভিব্যক্তিবাদে mutation, —সে স্থান কতটুকু কিংবা কতখানি, বর্তমান প্রবন্ধের তা আলোচ্য নয়। তবে আকস্মিককে স্বীকার করলে অবরোহ-প্রণালী বিশুদ্ধ থাকে না, এই তথ্য জানলে ইতিহাস ও পদার্থ-বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি ও প্রণালীগত পার্থক্য বোঝা যাবে।

পূর্বোক্ত কারণে ইতিহাসের প্রত্যয় পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত মুক্ত, নিরালম্ব, *বিষয়বস্তু থেকে নিষ্কর্ষিত হলেও অ-সংশ্লিষ্ট। সেগুলি একটি মনঃকল্পিত* জগতের অশরীরী অধিবাসী। তারা যেন কোনো বড় সাজ-পোশাকের দোকানের ম্যানিকিন-প্যারেড, জনসাধারণ কাচের বাইরে রাস্তা থেকে তাদের দেখছে, বিস্মিত হচ্ছে, ঈর্ষান্বিত হচ্ছে। ব্র্যাড্‌লীর অতুলনীয় ভাষায়, তারা রঙ্গমঞ্চের রক্তহীন নর্তকীর দল। কিন্তু ইতিহাসের প্রত্যয়গুলি রক্তমাংসের। তারা মূর্ত, সংহত, দেশ ও কাল-নির্দিষ্ট ব্যবহার থেকে অ-মুক্ত। প্রত্যয় মাত্রই মনঃকল্পিত, তবু যেন ঐতিহাসিক প্রত্যয়গুলি এই ব্যবহারিক জগতেরই অধিবাসী। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ যেন আরো ঘনিষ্ঠ, মধ্যে যেন বিশেষ ব্যবধান নেই। সামাজিক ব্যবহারের অভিব্যক্তি থাকার দরুন ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের বিষয়-সন্নিবেশ সুদীর্ঘকালের মধ্যে ব্যাপ্ত, পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় সর্বদাই কালাতীত। প্রাকৃতিক ঘটনাকে পরীক্ষাগারে এনে সহজ করা চলে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা পরীক্ষাগারে আনা যায় না, তারা জটিল ও বিচিত্র থেকেই যায়; সেজন্য পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় বর্জন করতে করতে তৈরী হয়, অর্থাৎ নেতিবিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু ইতিহাসের বিষয়কে অপ্রত্যক্ষভাবে জানা গেলেও ঐতিহাসিক প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ, বর্জন করলে তার অস্তিত্ব ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকে না। অনেকটা সহযোগ ও

অসহযোগ নীতির মতন। ঐতিহাসিক প্রত্যয় আরো গতিশীল, কর্ম-নিয়ামক। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় সম্বন্ধে সচেতন হলে প্রকৃতির ধর্ম পরিবর্তিত হয় না, কিংবা প্রকৃতিকে ভিন্ন পথে চালিত করা যায় না, শুধু বিজ্ঞানই অগ্রসর হয়; কিন্তু ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের সাহায্য, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে সচেতন হলে সামাজিক প্রগতি ও পরিবর্তন সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুবৃত্তি গড্ডলিকাপ্রবাহের মতন, পদার্থ-বিজ্ঞানের অনুবৃত্তি পরপর, চলচ্চিত্রে ফিল্মের ফোটোর মতই। ইতিহাসের অতীত বর্তমানে জাগ্রত হয় এবং ভবিষ্যতের আভাস দেয়, বরফের গোলার মত বড় হতে হতে চলে, পরের মধ্যে পূর্ব অন্ততঃ আংশিকভাবে অনুবিষ্ট হয়। এজন্য ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের মধ্যে মূল্যাবধারণ থাকেই থাকে, কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয়ের মধ্যে থাকলেই সর্বনাশ। অবশ্য এসব পার্থক্য আপেক্ষিক। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্য কমে আসবেই আসবে, কিন্তু মূল্যজ্ঞান ও মূল্য-বিচারকে একেবারে বর্জন করতে ঐতিহাসিক কখনও পারবেন কি না জানি না। কারণ পদার্থ-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মানুষ হলেও তাঁর বিষয় মানুষ নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক ডিটেকটিভ কিংবা জুরি হলেও মানুষ এবং তাঁর বিষয়ও মানুষ। এক্ষেত্রে মূল্য-বর্জন ঐতিহাসিকের পক্ষে নিতান্তই কষ্টসাধ্য। মানুষ হয়তো অন্য মানুষকে যন্ত্র কিংবা সংখ্যায় পরিণত করতে চায়, কিন্তু নিজে হতে আপত্তি করে। অবশ্য যদি মূল্য-জ্ঞান খাঁটি সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে ঐতিহাসিককে অন্য বৈজ্ঞানিকের মতন পুরোপুরি নির্মমভাবে নৈর্ব্যক্তিক না হলেও চলবে, তাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি লাঞ্ছিত হবে না। বিজ্ঞানের আদত কথা সত্যপ্রিয়তা, সেটা ঠিক মূল্যজ্ঞানের প্রতিকূল নয়।

শ্রেণী ও বিরোধ পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রত্যয়। বিরোধ সম্বন্ধে পরে লিখব। শ্রেণী বললেই দু'টো মানসিক অবস্থা সূচিত হয়। (১) শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের মধ্যে একতা ও সাম্যভাব। সমভাব ও একতার জন্য সীমার মধ্যে সহানুভূতি জন্মায়; তাকে consciousness of kind-এর পরিবর্তে feeling of kind বলা চলে; কারণ

সচেতন অবস্থা সব সময় থাকে না, পরে আসে। (২) যারা অন্য শ্রেণীর জীব তাদের সম্বন্ধে নিজেদের উচ্চ কিংবা নিম্নশ্রেণীর জীব বলে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ধারণা। এই ভাবগুলি বহুভাবের সমষ্টি, কারণ উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর একটি দু'টি নয়, সমাজ বহুশ্রেণীতে বিভক্ত; অথচ প্রত্যেক শ্রেণী কোনো-না-কোনো স্থানে অন্য শ্রেণীকে স্পর্শ করেই আছে। ভাবগুলি নির্ভর করে শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাত্রার উপায়, পরস্পরের আলাপ-পরিচয়, দূর কিংবা নিকট সম্বন্ধের উপর নানা-রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অসমতার উপর। এই হল মরিস্ গীনস্‌বার্গের মতে শ্রেণীর অর্থ। তাঁর মতে, শ্রেণীর সংজ্ঞার জন্য কোনো উদ্দেশ্য কিংবা স্বার্থ প্রতিপন্ন করবার প্রয়োজন নেই, কারণ খুব কম শ্রেণীই সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সম্বন্ধে সজ্ঞান। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যা সমাজতত্ত্বের বেলা সঙ্গত হলেও, আমরা যেভাবে ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করছি সেভাবে অর্থ বহন করে না। 'আমরা একদলের' মনোভাবটি ইতিহাসের অন্য ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সেটি প্রধানতঃ আর্থিক ব্যবহারের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট; সজ্ঞান কিংবা অজ্ঞান অবস্থার ওপর তার মৌলিক অস্তিত্ব নির্ভর না করলেও, চেতনার ওপর তার পরিপুষ্টি ও সার্থকতা নির্ভর করে। যখন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য উৎপাদনের অধিকারকে কেন্দ্র করে কোনো লোকসমষ্টি তৈরি করে তখনই শ্রেণীর উৎপত্তি। উৎপাদন অতি পুরাতন, শ্রেণীও অতি পুরাতন; উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও অধিকার বদলাচ্ছে, শ্রেণীর রূপ বদলাচ্ছে; কিন্তু শ্রেণীও থাকছে, যেমন উৎপাদন ও অধিকার থাকছে। এক শ্রেণীর সীমানির্ণয় হয় অন্যান্য স্বার্থ-গণ্ডীর দ্বারা। তারা সর্বদাই বাধা দিতে থাকে, কারণ উৎপাদন-শক্তি একই সমাজে এককালে এত প্রচুর নয় যে, সকলের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হয়ে সব দলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। কখনই করতে পারে না, যতক্ষণ সমগ্র সমাজে সম্পত্তিগত সম্বন্ধ রাষ্ট্রের দ্বারা পরিষ্কারভাবে স্থিরীকৃত এবং সম্পত্তি জনসাধারণের বদলে ব্যক্তির দ্বারাই অধিকৃত, অর্থাৎ যতক্ষণ অধিকার-ভেদ থাকে।

তা ছাড়া, সব শ্রেণীর মধ্যে যন্ত্র আবিষ্কার করার উপযুক্ত জ্ঞান এবং অন্যের আবিষ্কারকে অনুকরণ করে উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি করার সুযোগও সমান নয়। সেই জন্য শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের বীজ থাকবেই থাকবে। বিরোধ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীও আরো দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। বিরোধের তাৎপর্যই হল উৎপাদন-শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার, অর্থাৎ অন্য শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব-স্থাপন। ব্যক্তিগতভাবে প্রভুত্ব-স্থাপনের অর্থ নেতৃত্ব; কিন্তু তার আদিতে জীবগত পার্থক্য থাকলেও তার অনন্ত নিত্যতা ও চিরস্থায়িত্বের জন্য আর্থিক বৈষম্যই দায়ী। প্রভু নিজের পদত্যাগে সর্বদাই অনিচ্ছুক, সেজন্য প্রভুত্বরক্ষার অনিবার্য-পদ্ধতি অনৌদার্য ও 'জবরদস্তি'। তা ছাড়া সর্বপ্রকার আধিপত্যের মধ্যে লাভের আশা রয়েইছে। মুনাফার আশাই শ্রেণীকে চালিত করে। শ্রেণী সেজন্য কখনই লোকশ্রেয়কে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মঙ্গল আংশিক। আদত কথা এই যে, সামাজিক অভিব্যক্তি ও সমসাময়িক ব্যবহারের মধ্যে বিরোধ ও সন্ধি, প্রভুত্ব ও দাসত্ব, লাভ ও ক্ষতি, সামাজিক কল্যাণ ও শ্রেণীর স্বার্থ এই চিরন্তন বিপরীত প্রবাহ ঐতিহাসিককে লক্ষ্য করতে হবে। শ্রেণী-প্রত্যয়টি এই বিপরীত প্রবাহের বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের মধ্যে বিরোধ সূচিত হচ্ছে বটে, কিন্তু বিরোধ-প্রত্যয়টি অনেকের মতে আরো ব্যাপক। বিরোধ বিশ্বেরই নিয়ম, সে নিয়মের মানবিক প্রকাশ যখন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে হয়, তখন সেই বিরোধের আশ্রয়কে শ্রেণী এবং সেই বিরোধকে শ্রেণী-বিরোধ বলা চলে। আমার মতে শ্রেণী ও বিরোধ সম্পূর্ণ পৃথক প্রত্যয় নয়।

একাধিক পণ্ডিতের মতে শ্রেণী-প্রত্যয়ের কোনো সার্থকতা নেই, কারণ সেটিকে জাতিভেদের জাতি (caste), ব্যবসায়ের বৃত্তি (vocation, কিংবা profession) ও শিল্পজীবিকা (craft) থেকে পৃথক করা যায় না। এই মতকে গ্রাহ্য করতে আমি অনিচ্ছুক, কারণ শ্রেণীর পূর্বোক্ত অর্থে তাকে অতি সহজেই পৃথক করা চলে।

সমাজে একাধিক শ্রেণী আছে, তারা পরস্পর মিশে আছে—এবং ব্যক্তি একাধিক জনমণ্ডলীর আশ্রয়ভুক্ত; এ দু'টি আপত্তি নয়, প্রত্যয় স্থাপনের বিপত্তি মাত্র। জাতিভেদের জাতি জন্মগত সংস্কার, এতদিন তার মূল্য ধর্মের দ্বারা নিরূপিত হয়ে এসেছে। শ্রেণীর সংজ্ঞায় ধর্মসংস্কারের স্থান নেই, থাকলেও প্রলেপের মতন। সুপ্রজনন-বিত্থার সাহায্যে জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত কিংবা জাতিভেদ সমর্থিত না হলেও, সংখ্যার দিক থেকে বলা চলে যে, সমাজের মধ্যে গুণগত বিভাগ আছে। অবশ্য ইতিহাসের ও বর্তমান সমাজের শ্রেণী এবং গুণগত সাংখ্যিক বিভাগ এক নয়। যাতুবিত্থা ছাড়া অন্য কোনো বিত্থার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বুদ্ধিতে *ও চরিত্রে স্বভাবতই সবচেয়ে উঁচু স্তরের এবং শূদ্রেরা সবচেয়ে* নীচু স্তরের। বিদেশী সমাজে যেখানে শ্রেণী পুরাতন হয়ে জাতির সংস্কার গ্রহণ করছে সেখানেও ঐ কথা খাটে। বর্তমান হিন্দু-সমাজের জাতি ধর্মের প্রত্যয় মাত্র, জাতিগত অধিকারের মধ্যে আর্থিক স্বার্থের ও আধিভৌতিকের প্রভাব থাকলেও সে আধিকার আধি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের আবরণে প্রচ্ছন্ন। জাতির প্রকৃতি হল *পরমার্থিকের সাহায্যে কিংবা আশ্রয়ে সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান* দখল করা। অথচ বাইরে থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই স্থান ও মর্যাদা আপনা হতেই স্থির হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, আপনা হতে কিছুই স্থির হয় না। যে শক্তি সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে সে হল উৎপাদন নামক সামাজিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, উৎপাদক-জনসমূহের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য জনসমূহের সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার ও অর্থ-রোজগারের ব্যবস্থা। ধর্মসংস্কার ও অভ্যাসের দ্বারা এই শক্তির প্রকাশ ও পরিণতি ব্যাহত হয়, ইতিহাসের প্রকৃতি ঢাকা পড়ে। শ্রেণীপ্রত্যয়ের দ্বারাই সে শক্তির পূর্ণ পরিণতি সম্ভব হয়, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়।

বৃত্তি অনেক প্রকারের। শিল্পবৃত্তি (craft), ব্যবসাবৃত্তি (vocation) এবং জীবিকা (profession), যেমন ডাক্তারী,

ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি। আমাদের পুরাতন ইতিহাসে শ্রেণী ও গণ আছে; প্রথমটি হল সম-ব্যবসায়ীর দল, দ্বিতীয়টি হল এমন দলের বৃত্তি যাতে একাধিক ব্যবসায়ীর সাহায্য নিতে হয়। এখন তাদের চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। ইন্দোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে খুঁজলে তাদের সন্ধান মেলে, কিন্তু তাদের মূল শুকিয়ে গিয়েছে। আমরা যে অর্থে শ্রেণী বলছি তার সঙ্গে সে সব শ্রেণীর মূলগত কোনো যোগ নেই। তারা এতদিন সংস্কারের পরগাছায় আচ্ছন্ন থেকেও বেঁচে ছিল, পরগাছা সরিয়ে নেবার পরে দেখা গেল যে তারা মরে গিয়েছে। সংস্কার-পুষ্ট জাতির আদিতে একপ্রকার উৎপাদন-শক্তি কাজ করত; শ্রমবিভাগ, যোগ্যতা ও শিক্ষানবিসির সুবিধা অনুসারে সে শক্তি বিভক্ত হয়ে বৃত্তির সৃষ্টি করেছিল; এক জাতি অন্য একাধিক জাতিতে বিভক্ত ও একাধিক জাতি একটি জাতিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেও সে শক্তি কাজ করে এসেছে। আজকাল যে শক্তির দ্বারা জাতিবিভাগ কিংবা জাতি গঠন হচ্ছে, তার পরিচয় অর্থনীতিতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ধর্মসংস্কারের ইতিহাসে, কিংবা রাজনৈতিক লাভের লোভে। কিন্তু আদত ব্যাপারটি অন্যরূপ, যদিও রূপ এখনও প্রকট হয়নি। আজ বৃটিশ অধিরাজ্যের আশীর্বাদে ভারতবর্ষের অন্ততঃ পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনের রীতিনীতি বদলেছে। সমাজ সেই নতুন শক্তি ধারণ করতে পারছে না, পুরানো বোতল যেমন নতুন মদ ধারণ করতে পারে না। তাই সমাজে বিপ্লব এসেছে, সেই আধার ও আধেয়র মধ্যে বিরোধের ফলে সত্যিকারের শ্রেণী তৈরি হবার সুযোগ তৈরী হচ্ছে। এখনও নতুন শ্রেণী তৈরী হয়তো হয়নি, কেন না এই বিরোধটি প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নয়, গৃহবিবাদ মাত্র, তাই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখছি। নতুন শ্রেণী যদি হয়েও থাকে, তবুও সে শ্রেণী ইতিহাসের পটে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন নয়। নট এসে হাজির হয়নি, দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজনকে ধরে কয়ে নামানো গেল, তিনিও নটযশপ্রার্থী অথচ শঙ্কিতচিত্ত, আশ্বাস দেওয়া গেল উৎকৃষ্ট স্মারক আছেন; কিন্তু প্রম্পটিং-এর জোরে কতদূর চলে? বিশেষতঃ যখন

প্রতিপক্ষের নিজের কথাই মনে নেই। এ অবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, তাই একটু ভুলচুক হতেই হবে। এখন আমার বক্তব্য এই যে, কি হিন্দু কি য়ুরোপীয় সমাজে (চীন দেশেও) জাতি, কারুশ্রেণী ও সমবৃত্তিধারী জনসঙ্ঘের ব্যবস্থান নিরূপিত হত উৎপাদনের রীতিনীতির দ্বারা। কৃষিপ্রধান সমাজে কারুশিল্প প্রস্তুত হত সৌখিন সম্প্রদায়ের ভোগতৃপ্তির জন্য, কর্ষণ-বৃত্তির অতিরিক্ত কাজ হিসাবে। চাহিদা না এলে উৎপাদনই হত না। তখন এক জমিদার-সম্প্রদায়ই নিজেদের অস্তিত্ব, কর্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরাই হলেন তখনকার একমাত্র শ্রেণী আমাদের অর্থে। এখন কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়া উল্টে গিয়েছে (যদিও সম্পত্তির প্রকৃতি ও রূপ একই রয়েছে)। শিল্পীর সংখ্যা আর মুষ্টিমেয় নেই, সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের পুরাতন গুণ লুপ্ত হয়েছে। তারা ছিল শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ, যত লোক বাড়ল, ততই শিল্পজ্ঞানের বদলে শুধু শ্রম করবার দৈহিক শক্তি ও বিশেষ জ্ঞানের বদলে সাধারণ বুদ্ধি ও তৎপরতার আবশ্যক হল। এখন প্রায় সর্বত্রই শ্রমিকের বৃত্তি স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে, অন্যবৃত্তির উপরে নির্ভর করছে না, কেন না কৃষিকার্যে মুনাফা কম, কুটিরশিল্পও নষ্ট হয়েছে। চাহিদা আছে কি নেই শ্রমিক-শ্রেণীকে বুঝতে হয় না, তাদের কর্তব্য শুধু খাটা, সবই বোঝেন তাদের প্রভুরা, তাও হিসাবে গোলমাল হয়, ফলে অতিরিক্ত উৎপাদনই হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যক্ষ চাহিদা এখন কলের, কল চালিয়ে রাখতেই হবে, কল বন্ধ হলেই সর্বনাশ হবে। কলই এখন শ্রমিকের প্রভু। তা ছাড়া, পূর্বোক্ত বৃত্তির শ্রম ছিল হাতের, শিল্প ছিল প্রথাসঙ্গত; প্রথার পরিবর্তন কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা হতে পারত না, সামান্য যে একটু আধটু পরিবর্তন হত, তা হাতে কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তারই দ্বারা ধীরে, অতি ধীরে, সংস্কারকে খাতির করে। এখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে প্রত্যহই নতুন কল তৈরী হচ্ছে, শ্রমিক ও শিল্পীর অভিজ্ঞতার মূল্য কমে আসছে, সে অভিজ্ঞতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার কোনো সুযোগ নেই—শ্রমবিভাগ আরো বিভক্ত ও

বিশেষ হচ্ছে। শ্রমিকদল বিজ্ঞান জানে না, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তারা করতে পারে না, তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই। প্রভুশ্রেণীর ধারণা এই যে, শ্রমিকেরা শুধু শ্রম করতেই জানে, বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযুক্ত নয় তারা। প্রমাণও মিলছে বড় বড় অধ্যাপকের বইতে ; সুপ্রজনন বিদ্যাই না কি তাই বলছে! উচ্চশিক্ষায় খরচও অত্যধিক, সব উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রফেশনালদের হাতে, সে বিদ্যালয়ের টাকাকড়িও দিয়েছেন বড়লোকরা, জমিদার ও কলের মালিকরা। অতএব তাঁদের সন্তানরাই বৈজ্ঞানিক হবেন, বড় বড় প্রোফেশনে যোগ দেবেন।

এ বিবরণ আজকালকার অবস্থার। ইতিমধ্যে অতি গোপনে একটি নতুন শ্রেণী গোকুলে বেড়ে উঠেছে। তার নাম প্রোফেশন। কারুশিল্প দৈহিক শ্রমে পরিণত হবার পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞের দল তৈরী হয়। তাঁরা মস্তিষ্কের দ্বারা হাতের কাজকে অর্থাৎ কারুশিল্পকে সহজ করে দিলেন, অর্থাৎ শ্রমবিভাগকে আরো বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। মোটা রবারকে টেনে পাতলা করা যায়, আরো টানলে ছিঁড়ে যায়। তাই আজ প্রোফেশনের উত্তমাঙ্গটি অর্থাৎ পণ্ডিতবর্গ সমাজ-দেহ থেকে বিচ্যুত হতে বসেছেন, সমাজ এখন ছিন্নমস্তা। পণ্ডিতেরা সামাজিক ব্যবহাররূপ উদ্দেশ্যকে বর্জন করেছেন ও প্রতিশোধে সমাজও তাঁদেরকে বর্জন করছেন। বর্তমান যুগান্তরের সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হল এই—পণ্ডিতে যা বলছেন, দেশনেতারা তার বিপরীত কাজ করছেন। পণ্ডিতে চাইছেন স্বাধীন বাণিজ্য কিংবা বাণিজ্যে শান্তি, ঘটছে ঠিক তার উল্টোটি, ট্যারিফের দেয়াল উঁচু হয়েই চলেছে, বিরোধ বেড়েই চলেছে। অত্যধিক শ্রমবিভাগের ফলে, বুদ্ধি ও কর্মের, বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্পের, মতামত ও ব্যবহারের, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সামাজিক বন্ধনটি ছিঁড়ে গিয়েছে। তারই দরুন ধনীরা যারা শুধু শ্রমিক তাদেরকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন। প্রোফেশনগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা হল এই—তাদের উৎসাহে যেমন বিজ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি তাদেরই কর্মফলে শ্রমিকের অধোগতি সাধিত হয়েছে। ভালো ও মন্দ একই কার্যের কর্মফল—

ঐতিহাসিক নিয়তির রীতিই তাই। জ্ঞানের দ্বারাই এ নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রোফেশনগুলি এক একটি শ্রেণী। তা নয়, কারণ, উৎপাদন-শক্তিকে বাড়িয়েও তারা উৎপাদন-শক্তির উপর অধিকার বিস্তার করেনি, তারা সমাজ-ধনের অল্পাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে। তাও দক্ষিণা হিসাবে। কারণ, তারা নিষ্কাম হলে কি হয়, অন্য একটি শ্রেণী বেশই সকাম। বিশেষজ্ঞের দল আজ এই শ্রেণীর আজ্ঞাবহ দাসানুদাস, নিতান্তই অনুগত ভৃত্য। তা ছাড়া, তাঁরা নিজেদের কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন নন। তাঁদের ধর্ম 'মা ফলেষু কদাচন'। জ্ঞানযোগীর দলকে শ্রেণী বলতে কুণ্ঠা হয়। শ্রেণীর ধর্ম কর্মযোগের।

য়ুরোপের প্রোফেশনের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। গোড়ায় জনকয়েক ব্যবসায়ী অবসরকালে নিজেদের মধ্যে সামাজিকভাবে মেলামেশা ও স্ফূর্তির ফাঁকে নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনা করতেন। পরে তাঁরা ভদ্র অবস্থার উপযোগী আয় দাবি করলেন। অকারণে তাঁরা দাবি পেশ করেননি। তাঁরা বহুদিন ধরে শিক্ষানবিসি করেছেন, ফলে তাঁদের অনেক অভিজ্ঞতাও হয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তাঁরা বিশেষ জ্ঞানও অর্জন করেছেন, যার ফলে সমাজের উপকার হয়েছে। একটি বিশেষ জ্ঞানপদ্ধতি তাঁদের করায়ত্ত এবং সেই টেকনিকের প্রয়োগে তাঁরাই একমাত্র দক্ষ, অন্যে নয়। এই হল কার-সণ্ডার্সের মতে প্রোফেশনের ইতিহাস। হোইটহেডের নতুন বই থেকে ক'টি লাইন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

"Profession means an avocation whose activities are subjected to theoretical analysis and are modified by theoretical conclusions derived from that analysis."

অর্থাৎ পূর্বদৃষ্টি হবে থিওরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং থিওরী প্রতিষ্ঠিত হবে বৃত্তিলব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর। সিডনী ওয়েবের মতে প্রত্যেক প্রোফেশনের পিছনে সৃজনী-শক্তি, অধিকার ও সম্পত্তিজ্ঞান এবং সহানুভূতির প্রেরণা আছে। এই মতটির মূল্য হয়তো খুব বেশী নয়,

কারণ প্রায় সব দলের মূলেই আছে এই তিন প্রকারের প্রবৃত্তি। তাদের সাহায্যে শ্রেণীকে বৃত্তি থেকে পৃথক করা যায় না। অন্য দু'টি সংজ্ঞার দোষ ও অসম্পূর্ণতা পূর্বেই দেখিয়েছি, তবু সংজ্ঞা দু'টি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য শুধু এই দেখানো যে, প্রোফেশনের বিশেষত্ব অন্য মতাবলম্বী ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের কাছেও ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষের প্রোফেশনগুলি নিতান্ত খোলাখুলিভাবেই বিদেশী ধনী-সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার জন্যই সৃষ্ট ও লালিত-পালিত।

অতএব শ্রেণী বলতে আমরা এই ক'টি প্রস্তাব গ্রাহ্য করি। (১) উৎপাদন-শক্তিকে কেন্দ্র করে জনসঙ্ঘ গড়ে ওঠে; (২) ইতিহাস-নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক একটি জনসঙ্ঘের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; উৎপাদনটি সামাজিক ব্যাপার এবং সম্পর্কটি রাষ্ট্রের দ্বারা সাধারণতঃ স্থিরীকৃত ও আইনের দ্বারা অনুমোদিত; (৩) সম্পর্ক-স্থাপনের পর সামাজিক শ্রম ও সম্পত্তি এই জনসঙ্ঘের মধ্যে বিভক্ত হয়, পরে সেই বিভাগ রাষ্ট্রের দ্বারা চিরন্তন বলে ঘোষিত হয়। এই প্রকার জনসঙ্ঘকে শ্রেণী বলা হচ্ছে। অতএব ঐতিহাসিক প্রগতিতে শ্রেণীর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শ্রেণী-বিরোধের জন্যই সমাজ বর্তমান আকার ধারণ করেছে। পুরাতন পুঁথি ঘাঁটা ছাড়া যদি বর্তমানের সঙ্গে ইতিহাসের কোনো যোগ থাকে, ইতিহাস যদি সম-সাময়িক বিবৃতি হয়, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দেয় এবং নিয়ামক হয়, অর্থাৎ ইতিহাস যদি কেবল পৌনঃপুনিক ইতিবৃত্ত না হয়ে গতিশীল ও কর্মনিয়ামক হয়, তা হলে শ্রেণী-প্রত্যয়টি এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে এবং শ্রেণী-বিরোধকে ঐতিহাসিক প্রগতির একটি মূল শক্তি স্বীকার করতেই হবে; (৪) জনসঙ্ঘ ঘনীভূত হবার প্রকৃষ্ট উপায় হল বিরোধ; (৫) বিরোধের প্রকৃতিই হল লাভের আশা ও উৎপাদন-কেন্দ্রের ওপর একাধিপত্য বিস্তার। অন্য ভাষায় বলতে গেলে,

"Classes are groups of people, such that one group may appropriate to itself the toil of the other owing

to the difference of their (historic) situation, which is itself determined by the mode of their economic life."—*Moscow Dialogues (Hecker).* (৬) নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন না হলে শ্রেণী হয় না এবং শ্রেণী-বিরোধ সম্বন্ধে সজ্ঞান না হলে সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না। বলা বাহুল্য, সব প্রতিজ্ঞাই একটি মূল সূত্রের চারপাশে দানা বেঁধে রয়েছে। (৭) অনেকের মতে অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক উৎপত্তি ছাড়া শ্রেণীর অন্য উৎপত্তি আছে, যেমন ধর্মসংস্কার, সামাজিক সংস্কার, রাষ্ট্রের রীতিনীতি। রাজনৈতিক কারণগুলি বিরোধের মধ্যে সর্বদাই বর্তমান, তাই আমাদের সংজ্ঞায় তারা ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের সামাজিক কারণগুলি মূলতঃ অর্থনৈতিক। ধর্মসংস্কারের পার্থক্যে যে সামাজিক বিভাগ হয় সেটি শ্রেণীবিভাগ নয়। অনেক সময় সংস্কারগত পার্থক্য শ্রেণীবিভাগকে বাধা দেয়, কিংবা প্রচ্ছন্ন রাখে। তাই বলে এই কারণগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তারা আছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে। তাদের ইমারত সুদৃঢ়, তবে তাদেরও ভিত্তি অর্থনৈতিক মনে রাখা চাই।

গত অধ্যায়ে শ্রেণীর পুরানো ইতিহাস বর্ণনা করেছি। এই অধ্যায়ে ইতিবৃত্ত ও সমসাময়িক ইতিহাসের ধর্ম বোঝবার জন্য একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যয় ব্যাখ্যা করলাম। ভবিষ্যতে শ্রেণী কি আকার নেবে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যাঁর নখদর্পণে বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তর্কবুদ্ধির দিক থেকে বলা চলে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-জ্ঞান, উৎপাদনের উপর একাধিপত্য এবং স্বার্থবুদ্ধি কমলে বিরোধের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হবে ও সেই সঙ্গে শ্রেণীও ব্যাপক হবে, সমাজের মধ্যে প্রসারিত হবে। তখন শ্রেণী-বিরোধের ভীষণতা থাকবে না। বিরোধ এক প্রকারে না হোক অন্য প্রকারে থাকবে, কেন না বাধা-বিপত্তি, বিবাদ ও বিরোধের মধ্য দিয়ে অগ্রস্মৃতিই হল বোধ হয় বিশ্বচরাচরের নিয়ম। বিরোধের অবসানে বিশ্ব

ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সচেতনভাবে এই বিশ্বশক্তিকে শ্রেণীবিভাগ তুলে দেবার কাজে নিয়োজিত করাই ঐতিহাসিকের একমাত্র সামাজিক কর্তব্য। সমাজের দিক থেকেও বটে, ব্যক্তির দিক থেকেও তাই। কারণ, শ্রেণীতে বিভক্ত হবার জন্যই মানুষ মানুষ হতে পারছে না। অথচ এ না হয়ে উপায় ছিল না। সমাজের প্রকৃতিতে যে সব অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য, বিরোধ-বিসম্বাদ রয়েছে তাদেরকে প্রকাশ, খণ্ডন ও সমন্বয় করতে করতেই সমাজের অভিব্যক্তি হয়েছে ও হবে। যখন সচেতনভাবে কোনো একটি মণ্ডলীর দ্বারা এই কার্য সাধিত হয়, তখন সেই কার্যের নাম হল শ্রেণী-বিরোধ। এই হল শ্রেণী-বিরোধের প্রকৃত তাৎপর্য। আমি জানি, এই অধ্যায়ে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা স্থাপন করা হল না। আমরা যেভাবে ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করছি, তার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা খাপ খায় না। আমাদের প্রত্যয় পথ দেখিয়ে দেয়, অগ্রসর হতে সাহায্য করে, গন্তব্য নির্দেশ করে।

।। পরিচয় ।। ।। কার্তিক ।। ১৩৪১ ।।

সংস্কৃতি-চিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা

৭ই অগস্ট থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিলাম, অনেক প্রবন্ধ লিখলাম। তারও বেশী অনেক শুনলাম ও পড়লাম। আমার যা অবস্থা তাই যদি সকলের হয় তবে প্রত্যক্ষ আচরণের সাধ্য কি মনের কথা প্রকাশ করে! হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে তবু কলম ধরতে হবে, সম্পাদকের ভয়ে নয়, টাকার লোভে নয়, কেবল এই ভেবে, এত দিনের অনাদর, মূর্খ আলোচনার যদি সামান্য একটুও ক্ষতিপূরণ হয়। ছেলে-বয়সের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, পঞ্চাশ বছর থেকে যা গালিগালাজ তিনি খেয়েছেন, যা কানাঘুষো তাঁর বিপক্ষে চলেছে এবং তিনি শুনেছেন, তার খানিকটা আমরা জানি। একপ্রকার উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, অশ্রদ্ধার যান্ত্রিক বৈপরীত্য। রামানন্দবাবু নিজের অবস্থাকে বৈধব্যের সঙ্গে তুলনা করেও লিখছেন—সজ্ঞান শ্রদ্ধা চাই। এই তো মানুষের মতন কথা! কিন্তু, মানুষ হওয়া ভারী শক্ত।

শক্ত না হলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই রকম পাগলের মতন লোকে তুলনা করে! এক নিঃশ্বাসে দ্য ভিঞ্চি, গ্যেঠে, হ্যুগো, ব্যাস, তুলসীদাস, কালিদাস প্রভৃতির নাম বেরুচ্ছে বক্তার মুখ ও লেখকের কলম দিয়ে। বিদেশের পটভূমি না হলে আমাদের আত্মসম্মান বজায় থাকতো না এককালে, যখন তাঁকে ভারতের শেলী বলতাম, কিন্তু ১৯১১ সালের পর, অন্ততঃ বাঙলা সাহিত্যে, ঐ প্রকারের পরাশ্রয় আত্মার পরাজয়

এবং রবীন্দ্রনাথের শোকপ্রকাশে তাঁরই অপমান। তিনি আর মহাত্মাজী আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছেন। তাঁর আশীর্বাদে বাঙলা সাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্যে আসন গ্রহণ করেছে, তাঁর কৃপায় ভারতীয় অনুশীলনে লজ্জাবোধ বিদূরিত হয়েছে, তাই বিদেশী মহারথীদের নাম গ্রহণ আজ নিতান্ত অশোভন। লোকে বলতে পারে যে, তাঁর বিশাল সৃষ্টি ও লোকোত্তর প্রতিভায় আমাদের বিচার-বুদ্ধি এতই বিমূঢ় হয়েছে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমার বিশ্বাস, উপায় আছে—নীরব থাকা।

তুলনা কোথায় জানতে ইচ্ছে হয়। আমি ঐ সব মহাজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নই। তবে যাঁরা তুলনা দিচ্ছেন তাঁরা যতটা ও যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে জানেন তার চেয়ে কম চিনি না আমি ঐসব মহাজনদের এক আধজনকে। গর্ব করছি না, সত্যি কথা লিখছি। ধরা যাক গ্যেঠেকে। তাঁর রচনার—নাটক, নভেল, কবিতা, কথোপ-কথন প্রভৃতির—অনুবাদ ইংরেজীতে আছে এবং তাঁর অন্ততঃ পাঁচখানা জীবনচরিত ইংরেজীতে লেখা হয়েছে। আমাদের যুগে ঐ বইগুলোর সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার অঙ্গ বিবেচিত হত। আমরা অনেকেই সেগুলি পড়েছি—জার্মান ভাষা না জানার জন্য উপভোগ আমাদের অসম্পূর্ণ রয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু খানিকটা ক্ষতিপূরণ হয়েছে কার্লাইল, ক্রোচে, রবার্টসন, লিউইস, সাইম প্রভৃতির ব্যাখ্যায়। এই আংশিক অধিকারে আমি গ্যেঠের সমালোচনা করতে অক্ষম, কিন্তু গ্যেঠের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের প্রভেদ দেখাতে অক্ষম নই। আমার উক্তিকে পাঠক যদি দম্ভ ভাবেন তবে নাচার।

দু'জনের মধ্যে মিল প্রতিভার ক্ষেত্র ও প্রভাব নিয়ে। গ্যেঠে একাধারে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। সাহিত্যে তিনি নভেলিস্ট, নাট্যকার ও কবি বলেই বিখ্যাত। তাঁর চিঠিগুলোও চমৎকার। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর দেহতত্ত্বের পরীক্ষা বিপ্লব এনেছিল এবং অপ্‌টিক্‌স ও রঙ সম্বন্ধে মতামত আজ অগ্রাহ্য হলেও অন্য হিসেবে

মূল্যবান। তা ছাড়া, গ্যেঠে ছিলেন মন্ত্রী ও শাসক, অর্থাৎ স্টেট্স্ম্যান। হ্বীমার ছোট হলেও তার সংস্কার খুবই উঁচু ধরনের। গ্যেঠের প্রতিবেশ ছিল জার্মানীর ছোট ছোট চল্লিশটি রাজ্য, ফরাসী বিপ্লব এবং তারই সঞ্জাত নেপোলিয়নের একীকরণের সভ্যপ্রচেষ্টা। গোটাকয়েক উৎকৃষ্ট গানের কথাও তিনি লিখেছিলেন। ছোট গল্প, আমার যতদূর জানা আছে, তিনি লেখেননি। নাট্যমঞ্চের প্রতি তাঁর প্রীতি ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তার নতুন রূপ তিনি দিয়েছিলেন বলে জানা নেই। নৃত্য সম্বন্ধে তাঁর দান শূন্য। অন্য ধারে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক নন, বিজ্ঞান তিনি ভালবাসতেন। কবিতায় বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন, বিশ্বপরিচয় লিখেছেন, জ্যোতির্বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ভূগোল-সংক্রান্ত নতুন নতুন বই তিনি অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন—যাতে মানসিক প্রসারতা, ভূমার আভাস, বিশ্বসংসারের প্রাথমিক ও সর্বব্যাপী রীতিনীতির সাক্ষাৎ মেলে। গ্যেঠের মনোভাব ছিল ভিন্ন। তিনিও 'arche-type' খুঁজতেন কিন্তু পরীক্ষার মারফত। রবীন্দ্রনাথের 'arche-type' উপনিষদের, অর্থাৎ ব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব করেননি, জমিদারি চালিয়েছেন, হয়তো তাঁর জমিদারির আকার হ্বীমারের চেয়ে কম ছিল না, তবু জমিদারি বিদেশী রাজার অধীন এবং হ্বীমার ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র। গ্যেঠে যখন নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করেন তখন তাঁর আশে-পাশে গুপ্তচর ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথকে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী সাবধান করেছিলেন, বিদেশেও তাঁকে একাধিকবার বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দু'হাজারের উপর, চিত্রের সংখ্যাও তাই শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নৃত্য, রঙ্গমঞ্চ ও নটশিল্প দেশে যুগান্তর এনেছে। গ্যেঠে 'ফাউস্ট' লিখেছিলেন, যেটা সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতার অভিব্যক্তি ও পরিপূরণের নাটক। রবীন্দ্রনাথের নাটক ঐ ধরনের নয়। দু'জনের প্রতিবেশ ভিন্ন। গ্যেঠে স্বাধীন দেশের লোক, রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশের। গ্যেঠের রাজনৈতিক সমস্যা ছিল রাষ্ট্রিক একীকরণের, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র

স্বাধীনতার। ফরাসী বিপ্লবের দূত হিসেবে নেপোলিয়ন এসেছিলেন তাঁর দেশে এবং যারা 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজী সংস্করণ বাজেয়াপ্ত করলে তারা নিশ্চয়ই স্ট্যালিনের বংশধর নয়।

এই পরাধীনতার চাপ তাঁর উপর কতখানি পড়েছিল তার বিচারের স্থান নয় এখানে। কিন্তু ভীষণভাবেই যে পড়েছিল তা অনেকেই জানেন। তিনি যে সেটা কাটিয়েও বিশ্বের সামনে দাঁড়ালেন, এটা তাঁর কৃতিত্ব, বৃটিশ সাম্রাজ্যের নয়। গ্যেঠের বিশ্বজনীনতা অনেকটা ফরাসী বিপ্লবেরও প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথ স্টেট্‌স্‌ম্যান হবার সুযোগ পাননি। মহামানবত্বে, ঋষিত্বে, ঐ রুদ্ধ কর্মপ্রবৃত্তি পরিণত হয়ে আজ যদি মানবের কল্যাণ বেশী সাধিত হয়ে থাকে, তবে শ্রদ্ধা দেব একাই তাঁকে, যিনি ভারতবর্ষের বাণীতে বিশ্বাসের জোরে এবং স্বকীয় প্রতিভার সমর্থনে এই বিরোধী সমাবেশের অসুযোগ অতিক্রম করতে পারলেন। য়ুরোপীয় সভ্যতায় তাঁর বিশ্বাসকে অমান্য করছি না, কিন্তু টিকল কোনটা? গ্যেঠে তার জয়গানই করে গেলেন, আর রবীন্দ্রনাথ তার মুখোস ছিঁড়ে তার লোলুপ মূর্তিটা দেখালেন শেষ বয়সে। ইংরেজী পরিশীলনের ফলে রবীন্দ্রনাথ, মিথ্যে কথা এবং ফরাসী বিপ্লবের ফলে গ্যেঠে, সত্যি কথা, কেন বেশ বোঝা যায়।

দু'জনের মানসিক গঠনের পার্থক্য প্রথমে চোখে না পড়লেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। গ্যেঠের কোনো রচনায় রসিকতার চিহ্ন নেই; তাঁর চিঠি ও কথোপকথনে গভীর তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু ঔজ্জ্বল্যেব পরিচয় পাই না। রবীন্দ্রনাথের রসিকতা সর্বজন-বিদিত, সে সম্বন্ধে বাক্যব্যয় নিরর্থক। গ্যেঠের রচনা যে জ্ঞানে ভরপুর সেটা অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত, তাই তাঁর শান্তিতেও কলঙ্কের দাগ কখনও কখনও চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে জ্ঞান আছে সেটা অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে বলছি না; অভিজ্ঞতা আত্মার ভূমিকায় প্রস্থাপিত ও উন্নীত হয়ে যে শান্তি লাভ করেছে, সেই শান্তিতে তাঁর জ্ঞান প্রদীপ্ত। এক্ষেত্রে ললাটে জয়ের উদ্ধত তিলক কিংবা পরাজয়ের লাঞ্ছনা থাকতেই পারে না। অভিজ্ঞতাকে যিনি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-

উপকরণ ভাবেন, তিনি উপকরণগুলোর ব্যবহার করবেন নিতান্ত সহজভাবে, সানন্দে, শান্তভাবে। কারণ, ব্যবহারটাই আত্মার প্রকাশ এবং আত্মার প্রকাশে আড়ষ্টভাব নেই। গ্যেঠের জ্ঞান আত্মজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান আত্মার বিকাশ। কোনটা কার ভালো লাগবে নির্ভর করছে রুচি ও শিক্ষাদীক্ষার ওপর। কিন্তু এটা ঠিক যে দু'টোর অন্তরে পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে, রসিকতায় ঝলমল করছে এবং গ্যেঠে একটা বই লিখতে প্রায় ত্রিশ বছর লাগালেন। দু'জনের মুখ দেখলেই বোঝা যাবে, একজনের মুখে বিশটা দাগ, অন্যের মুখ সূর্যের মতন প্রশান্ত, ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত ভাস্বর। একজনের মুখ দেখলে মনে ওঠে—ওক্ গাছের গুঁড়ি, আর অন্যজনের মুখ দেখলে মনে হয়—সীডার-এর উচ্চ অভিলাষ। জীবনটাকে বিরোধ ভেবে ভারসাম্যে অবস্থান এবং তাকে আত্মার ক্রমবিকাশ জেনে সুখ-দুঃখের সমন্বয়—দু'টি প্রত্যয় এক নয়।

তার পর ওঠে প্রভাবের কথা। পূর্বেই লিখেছি গ্যেঠের প্রভাবকে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত। কিন্তু কিছুতেই রবীন্দ্রনাথকে বিদেশী সভ্যতার প্রণালী ভাবা যায় না। অবশ্য, এক-কালে লোকে তাই ভাবতো, সে ভাবনার মূল্য নেই আজ। বরঞ্চ মাইকেলই সর্বপ্রথম সাহিত্যের সাহায্যে বিদেশী মনোভাবের প্রচার করেন; সে কাজ ন্যস্ত হয় বঙ্কিমের উপর। ফলে যে ইঙ্গ-বঙ্গ মনোভাবের প্রসার হয়, তার অনেকখানি ছিল মেকী, ঝুটো মাল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাকে পরিত্যাগ তো করেনই, তাঁর কৃপায় আমরাও খানিকটা তাকে বর্জন করতে শিখেছি। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সাহেবিয়ানায় বাঙ্গালী যদি অবিশ্বাসী হয়ে থাকে তার জন্যে তিনিও ধন্যবাদার্হ। মাতৃভাষার ব্যবহার থেকে চিত্তশুদ্ধি, পল্লীসংগঠন, ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে আত্মনিষ্ঠা—এ সবই প্রমাণ করে যে, তাঁর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয় চিন্তায় ও কর্মে পূর্বের দানই বেশী ছিল এবং সেই শক্তিতেই তিনি আপন আসন জোর করে কেড়ে নেন। গ্যেঠের সমন্বয়ে 'জার্মান'-অংশ কম ছিল অনেকেই বলছেন। যদি কোনো ভারতবাসী ভক্ত আপত্তি

তোলেন, তবে 'খাঁটি জার্মান' আর্থার রোখেনবার্গ তাঁর সম্বন্ধে কি লিখেছেন স্মরণ করাচ্ছি। একাধিক জার্মান দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, গ্যেঠের মধ্যে জার্মান রক্ত ও তেজ এতই কম ছিল যে, তাঁর ছেলেকে 'স্বাধীনতার যুদ্ধে' যোগ দিতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। আশ্চর্য হই যখন শুনি জার্মানীতে গ্যেঠের প্রভাবের কথা। অন্যধারে, রবীন্দ্র-নাথের হাতের লেখা পর্যন্ত বাঙ্গালী আত্মসাৎ করেছে। আমরা আজ ভাবি তাঁর ভাষার দৌত্যে, প্রেমে পড়ি, বন্ধুকে চিঠি লিখি, শরতের আলো দেখে উৎফুল্ল হই, কাল-বোশেখীর রুদ্ররূপে ভয়ার্ত হই, ছড়া শুনে, আলপনা দেখে উল্লসিত হই, তাঁরই কৃপায়। জাতীয় মনে এমন ছড়ানো শিকড় আর কার? বাঙ্গালী মেয়েদের নাম তো তাঁরই দেওয়া। আন্নাকালী থেকে সমিতা নমিতায় পরিণতিকে আমি জাতির প্রাথমিক রুচি-পরিবর্তন বলি। গ্যেঠের পর মাত্র মারগারেট, মিনঁ আর ডরথির প্রচলন হয়।

আবার বলি যে, গ্যেঠের সমালোচনা করতে আমি অপারগ। তাঁর মাহাত্ম্যে আমি পূর্ণ বিশ্বাসী। য়ুরোপে তাঁর জুড়ি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আমাদের কাছে অদ্বিতীয়। তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে তাঁর বিশেষত্বের জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজন। সেটার অভাবে তুলনা হয়ে ওঠে ভাবোচ্ছ্বাস এবং দাসমনোভাবের চরম নিদর্শন।

॥ উত্তরা ॥ ॥ আশ্বিন ॥ ১৩৪৮ ॥

রবীন্দ্র-সৃষ্টি

খড়দা'র বাগানবাড়িতে একদিন সমালোচনা সাহিত্যের কথা উঠল। কিভাবে তার উন্নতিসাধন সম্ভব, সাধারণ বিচারের পর দু'টি পথ দেখা গেল। প্রথম, কবির নির্বাচিত জনকয়েক লেখক 'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠায় 'কবিতা ভালো লাগে কেন?'—এই প্রশ্নের ব্যক্তিগত উত্তর দেবেন; দ্বিতীয়, কোনো একজন বিশেষ কবিকে উপলক্ষ্য করে গোটা কয়েক প্রবন্ধ লেখা হবে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণ করতেই উপদেশ দিলেন। পরে, ঠাট্টার সুরে বললেন, "দেখো, এমন কবি নিও যে ভার সইতে পারে।" মাইকেলকে ধরাই ঠিক হল। তাঁর উপদেশ এখনও পালন করা হয়নি। আজ আবার সেই ভার সওয়ার কথা মনে হচ্ছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য কত ভার সইতে পারে তার ইয়ত্তা নেই; বহু যুগ ধরে তার আলোচনা চলবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ফলে ক্রমশই তার নতুন নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার আলোচনা-সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে নিশ্চয়ই। অনেকদিন যাবৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালী হয় নিরাগ্রহ না হয় বিরূপ ছিল। মাত্র বছর ত্রিশ থেকে বাঙ্গালী ও অন্যান্য ভাষী তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই ক'বছর হল যৎসামান্য বিচারও শুরু হয়েছে। প্রারম্ভেই আমাদের উপলব্ধি হল যে, এমন বিরাট প্রতিভা জগতে দুর্লভ। এখনকার সমস্যা এই: কিভাবে রবীন্দ্র-সৃষ্টির সম্মান প্রদান, উপভোগ ও সুবিচার সম্ভব। কাজটি একার নয়, এক যুগেরও নয়।

কিন্তু দীর্ঘ কালের জন্য সঙ্কল্প এখন থেকেই করতে হবে। বলা বাহুল্য, ভাবপ্রবণতা স্বল্পায়ু। এই প্রবন্ধে আমি সঙ্কল্পের নকশা দিচ্ছি না, সে কাজ আমার শক্তির বাইরে। রবীন্দ্র-সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ে আমার মনে যে ধারণাটি বদ্ধমূল হয়েছে আমি তারই ইঙ্গিত দিচ্ছি।

আমার প্রাথমিক ধারণা এই ঃ তাঁর সৃষ্টি প্রায় একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রকৃতির মধ্যে আছে অঙ্গাঙ্গী যোগ, প্রতিবেশের সহযোগে বৃদ্ধি এবং একটা সমুত্থিত ঐক্য। তা ছাড়া, সমগ্রের ইতিহাস বিশেষে পুনরাবৃত্তিও প্রকৃতির ধর্ম। 'প্রায়' লিখেছি এই জন্য যে, মানসিক নির্বাচন সর্বদাই বর্তমান, যদিও তার সীমা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে অঙ্গাঙ্গী যোগের দৃষ্টান্ত খুঁজতে কষ্ট নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য, তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত, তাঁর সমাজ ও রাজনীতি, তাঁর ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্ববোধ, এই যুগ্ম প্রত্যয়গুলির একটি অন্যটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কেবল চিত্রের বেলা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে সেটি একক, যূথভ্রষ্ট। অর্থাৎ, যাঁকে আমরা সৌন্দর্যের উপাসক ভেবে এসেছি, যাঁর প্রতিভা আর লিরিসিজ্‌ম্‌কে সমীকরণ করাটাই আমাদের মধ্যে প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁর হাত দিয়ে এমন অদ্ভুত কল্পনার প্রকাশ 'খাপছাড়া'ই লাগে। কিন্তু এই ভাবনার মূল ধারণাটিই মস্ত ভুল। রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক ঘটনার মতন ভাবলে বিস্ময়ের হেতু থাকে না। রুদ্র, অবাস্তব, ভয়ঙ্কর প্রভৃতির স্থান প্রকৃতিতে আছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আছে। নেই ভেবে যাঁরা খুশী হতে চান, তাঁদের জন্য জীবজগতের 'স্পোর্ট'-এর উল্লেখ করছি। 'স্পোর্ট' আকস্মিক হলেও অভিব্যক্তিরই নিদর্শন।

প্রতিবেশের সহযোগে বৃদ্ধিকে লোকে প্রভাব বলে। 'প্রভাব' কথাটিতে সাধারণতঃ একাংশ নিষ্ক্রিয় ও অন্যাংশ সক্রিয় বোঝায়। যে অংশ অন্যান্য দিকে সক্রিয় তার একটি প্রতিপত্তি থাকে, তাকে যখন কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন সঙ্গীত, সক্রিয় বলি, তখন আমাদের অজানিতে, অন্যাংশটিকে কেবল নিষ্ক্রিয় নয়, পঙ্গুই বিবেচনা করি। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উপর য়ুরোপীয় প্রভাব বিচারের সময়

এই ভুল আগে অনেকেই করেছেন, সঙ্গীতে এখনও অনেকে করে থাকেন, চিত্রেও তাই। কিন্তু প্রকৃতির কাজে প্রভাব নেই, আছে সক্রিয় সহযোগ, active adaptation। সহযোগের ক্রিয়ায় বিরোধ, প্রতিকূল আচরণ, পরিত্যাগ বাদ পড়ে না। মন যখন নিতান্ত শক্তিশালী তখন নির্বাচন সহজ ও গুণগত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্র-সৃষ্টির স্বাদেশিকতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বিদেশী সঙ্গীতের হারমনি ও উচ্চারণ এবং আধুনিক বিদেশী চিত্র ও কবিতার আঙ্গিক প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। প্রত্যেক বিষয়েই রবীন্দ্র-সৃষ্টি গ্রহণ ও বর্জনের ফলে প্রাকৃতিক সঙ্গতি লাভ করে নব সমন্বয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। এককালীন গ্রহণ-বর্জনের জন্যই সেটি একত্রে স্বদেশী ও বিশ্বজনীন, একত্রে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, একত্রে ভারতীয় ও বিদেশী, সনাতন ও পরীক্ষাশীল, অর্থাৎ আধুনিক।

অনেকেই ৭ই আগস্টের পর থেকে শোকপ্রকাশের সম্পর্কে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিরাটত্ব উল্লেখ করেছেন। বিরাট তো বটেই, কিন্তু সুসম্বদ্ধ। কোথা থেকে, কেমনভাবে অতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ একটি প্রধান ছকে, অতি সহজে, সুন্দরভাবে বিন্যস্ত এবং বিন্যস্ত হবার পর নতুন ও ব্যাপক সমন্বয়ে সজ্জিত হচ্ছে, বিশ্লেষণ করবার সময় দৈব-প্রেরণায় আস্থাবান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আপাতত অন্য ব্যাখ্যাতেই চলে। জীবধর্মের মর্মই হল বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে, ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে ঐক্য-সাধনা। রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রত্যেক নতুন অধ্যায়ের পূর্বেকার ইতিহাস হল এই—যেই একটি রূপ ছাঁচ হয়ে উঠছে, অমনই আদিম জীবন-শক্তির ভাঁড়ার থেকে নতুন রূপের প্রেরণা আসছে। অনবরত জীবনের কাছ থেকে শক্তি আহরণই হল রবীন্দ্র-সৃষ্টি-পদ্ধতির মৌলিক বন্ধন। রবীন্দ্রনাথের ভাঁড়ার ছিল দু'টি: সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণ, অর্থাৎ, গ্রামের জনগণের জীবনধারা; ও আদর্শের ক্ষেত্রে সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্মের পূর্বেকার সরল ঔপনিষদিক শান্তি, শিব ও অদ্বৈত প্রত্যয়ে ও অজেয় আত্মায় প্রগাঢ় বিশ্বাস। দু'টি নিদর্শন যথেষ্ট হবে। (১) সমাজের আড়ষ্টতা ভাঙবার, সঙ্গীতে মুক্তিলাভের উপায়, গ্রাম্য জীবনের উদ্ধারে এবং বাউল,

ভাটিয়ালি, কীর্তনের আশীর্বাদে। (২) কবিতার অভিব্যক্তির এক যুগে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', দ্বিতীয় যুগে 'এবার ফিরাও মোরে' ও তৃতীয় যুগে বলাকার গতিরাগ। চরম সংক্রান্তি সাধিত হল বের্গসঁর জীবন-শক্তিকে উপনিষদের সাহায্যে creative unity-তে পরিণত করে। জীব-ধর্মকে মনন এইভাবেই প্রয়োগ করে।

জীবতত্ত্বে বলে যে, জাতির ইতিহাস ব্যক্তিবিশেষের বিবর্তনেই পাওয়া যায়। সব ক্ষেত্রে সত্য না হলেও জগতের মহান কীর্তিতে ঐ তথ্যের প্রমাণ আছে। অবশ্য মানসিক অভিব্যক্তিতে সময় সংক্ষিপ্ত হবেই। কিন্তু যে সৃষ্টি অর্ধ শতাব্দী জুড়ে রইল, তার ক্রম এত দ্রুত নয় যে আমাদের চোখে ধরা পড়বে না। রবীন্দ্র-সৃষ্টির বৃহৎ অধিশ্রয়ণে অন্ততঃ ভারতবর্ষের মানসিক গতির সন্নিপাত হয়েছে। কবিতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; সংস্কৃত, বাঙলা সকল ছন্দই এখানে রয়েছে, তা ছাড়া বিস্তর নতুন ছন্দেরও সাক্ষাৎ পাচ্ছি। রাজনীতিতে ইংরেজ জাতির উদার মতে বিশ্বাস থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া, প্রত্যেক অধ্যায়টি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক রচনায় বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে আধুনিক কালের প্রিমিটিভ বলা হয়। এক হিসাবে মন্তব্যটি খুব সারবান। যখন বস্তুর অনুকরণে বিদেশী আর্টিস্ট দিশে হারাল, তখনই তারা ছুটল আফ্রিকায়, টাহিটিতে, গুহায়, মধ্য এশিয়ায়, ভারতবর্ষে, চীনদেশে, জাপানে। এই সন্ধান আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে ও-দেশে চলছে। রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে এই সন্ধান দশ বৎসরের সীমায় আবদ্ধ। 'খাপছাড়া' ও 'চিত্রলিপি'র চিত্রে আধুনিক সমগ্র য়ুরোপীয় চিত্র-প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত, ঘনীকৃত হয়েছে। চোখ মেলে দেখলে উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবিকতা নাক, মুখ, চোখ ও দৃশ্যপটে পাওয়া যাবে। অথচ চিত্রগুলি যেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর কল্পনা। মনোবৈজ্ঞানিক তাদের বলবেন অবচেতনার বুদ্‌বুদ। একই কথা প্রায়, আজকালের অবচেতনাতেই আদিমতা আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু নামকরণটাই প্রধান নয়। ভুললে চলবে না যে, নতুন সৃষ্টির শক্তি বাইরেকার চৈতন্যের নীচু তলাতেই জমা হয়ে

যায় এবং বিপ্লবের সময় সেখানেও হাত পাততে হয়। অন্তরের ও বাইরের লেন-দেনে জাতির বিবর্তন ব্যক্তিবিশেষের ক্রমবিকাশে পরিস্ফুট হওয়াই প্রাকৃতিক জীবনের একটি বড় রীতি।

পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিপক্ষে দু'টি আপত্তি উঠতে পারে। কেউ বলতে পারেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৃষ্টি একপ্রকার জৈব-ঘটনা। কিন্তু এটা বিশ্বাস্য নয়। সাধারণতঃ যেসব রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তাদের পটভূমি এতই ছোট ও তাতে শক্তির চিহ্ন এতই কম যে, তাদের উৎপত্তি জীবনের একাংশ থেকেই মনে হয়। সভ্যতার ইতিহাসে এমন দশ জনও আছেন কি না জানি না, যাঁদের রচনায় প্রাকৃতিক সম্পূর্ণতার রাজটিকা আছে। দ্বিতীয় আপত্তিটাই আলোচ্য। অনেকের ধারণা হতে পারে যে, আমি এতক্ষণ উপমারই বিস্তার করছি, প্রকৃতপক্ষে মানসিক সৃষ্টি জীব-জগতের অভিব্যক্তির ধার ধারে না, দু'টি ক্ষেত্রের মধ্যে সম্বন্ধ উপমিতির, জোর সাদৃশ্যের। আমার উত্তর এই ঃ মননশীলতার নিদর্শন নির্বাচনে এবং যদি রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে সজ্ঞানে গ্রহণ ও পরিত্যাগের সন্ধান পেয়ে থাকি তা হলেই যথেষ্ট। (ইতিপূর্বে, আমার প্রাথমিক ধারণার বিবৃতির পরই আমি 'প্রায়' কথাটি ব্যবহার করেছি।)। এই মনস্বিতা বিশাল, সূক্ষ্ম ও পরিব্যাপ্ত, প্রাকৃতিক ঘটনার উদ্‌ঘাটনেরই উপযোগী। আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় একাধিক লোকের পক্ষে সম্ভব, সেটা অসাধারণ প্রক্রিয়া নয়, মাত্র সজাগ মনের কর্ম। রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে যা বর্তমান, সেটা অত্যন্ত গভীর ও নিতান্ত প্রাথমিক।

ধরা যাক মৃত্যু-কল্পনাকেই। এই যুগের মানুষের চোখের সামনে যা ঘটছে তাকে মৃত্যুলীলা বলা যায়। যুদ্ধবিগ্রহের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা দেখি যে, সমগ্র য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে মৃত্যু-ইচ্ছা মূর্তিমান। এই যে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যে প্যাশানের চর্চা, এই যে সমাজের বুকে বিনাশের ভীত কম্পন, যাকে ভুলতে, জয় করতে এত প্রচেষ্টা, অনুষ্ঠানে, নাটকে, সঙ্গীতে, এই যে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রলাপ—এ সমস্তই মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বিশেষ য়ুরোপীয় প্রত্যয় থেকে উঠেছে।

প্রত্যয় অবশ্য সর্বত্র স্পষ্ট নয়, পুরুষকার ও দম্ভের দ্বারা অনেক সময় আবৃত। কিন্তু য়ুরোপীয়ান সাহিত্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতের প্রাণবস্তু যদি 'প্যাশান' হয়, যদি সেই সভ্যতার মর্ম হয় প্যাশানের মত বাঁচা, তবে রবীন্দ্র-সৃষ্টির মতন য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ পরিণতির সমকালীন ও তথাকথিত প্রভাবান্বিত সৃষ্টির অন্তরে যে প্রত্যয় পাব, সেটা ঐ মৃত্যু-ইচ্ছার সমগোত্রেরই হবে। যদি অবশ্য, নির্বাচন-শক্তিবিহীন প্রাকৃতিক ঘটনাতেই সেই সৃষ্টি আবদ্ধ থাকে। কিন্তু তা থাকছে না। আমরা দেখছি, রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি'র পর প্রেম আর প্যাশান এক বস্তু নয়, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ অন্ধ নিয়তির ক্রীড়নক নয়, যাকে sense of doom বলা চলে, যেমন ইসোল্ট-ট্রিস্টামে, আনা ক্যারেনিনা-ভ্রন্‌সকিতে, আবেলার্ড-হেলয়তে, সেটি অবর্তমান। তার পরিবর্তে আছে মুক্তির আস্বাদ ও প্রেরণা। ঠিক এই জন্যই আবার মৃত্যু সম্বন্ধে কবিতায় মৃত্যুকে মধুর, অসত্য, শান্তি ও মঙ্গলের দ্বার বলা হয়েছে। মাত্র একটি কবিতায় মৃত্যুকে য়ুরোপীয়ভাবে কল্পিত হতে দেখি। কিন্তু ইদানীংকার ও শেষ কবিতার মৃত্যু কি ইয়েট্‌সের মৃত্যু? কিছুতেই নয়। মহুয়ার প্রেম কি পেত্রার্কের? মোটেই নয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কি হ্বাগনারের সমপর্যায়ে? নিশ্চয়ই নয়। রবীন্দ্র-প্রত্যয় ভারতীয়, একান্তভাবে স্বদেশী, উপনিষদের। প্রেমকে বেদনা না ভেবে সম্পূর্ণতা ও মুক্তির উপায় ভাবা এই দেশেরই ভাবনা। শেলী, কীট্‌স, বাইরন প্রভৃতির প্রভাব কাটিয়ে আত্ম-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা, ধ্বংসলীলার অবসানে জীবনের, মঙ্গলের, সত্যের অধিষ্ঠান শুভবাদীর স্বপ্ন নয়, রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ নয়, নির্বাচনের নিদর্শন, এবং তার পর, স্বধর্মের ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন, জীবনের প্রগতিরই সমর্থন।

এই প্রবন্ধে যা লিখলাম সেটি রবীন্দ্র-সৃষ্টির আলোচনা সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণা। আমার বিশ্বাস এটি দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়েও আরো কিছু।

॥ রবীন্দ্র-স্মৃতি ॥ পূর্বাশা ॥ ১৩৪৮ ॥

রবীন্দ্র-সমালোচনার পদ্ধতি

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'পূর্বাশা'য় শ্রীশৈলেন ঘোষ 'প্রকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে একটি মূল্যবান অংশ উদ্ধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি।" ··· "এই যে বিচিত্ররূপী সমগ্র, এর সঙ্গে ব্যবহার রক্ষা করতে হলে একটি ছন্দ রেখে চলতে হয়,—যদি তাল কেটে যায় তবেই সমগ্রকে আঘাত করি এবং তার থেকে দুঃখ পাই। বস্তুত যখন কিছুতে উত্তেজনার উগ্রতা আনে তার থেকে এই বুঝি, ছন্দ রাখতে পারলুম না,—তাই সমগ্রর সঙ্গে সহজ যোগসূত্রে জটা পড়ে গেল। তখন নিজেকে স্তব্ধ করে জটা খোলবার সময় আসে।" শৈলেনবাবুর মতে এই হল রবীন্দ্রনাথের সাধনার ইতিহাস। আমারও মত তাই এবং ইতিপূর্বে অন্যত্র সেই মত ব্যক্ত করেছি। অবশ্য সর্বাস্তিবাদের অর্থ আমার কাছে অন্য।

সমগ্রতার সাধনাই যদি রবীন্দ্রনাথের সাধনা হয়, তবে তাঁকে বোঝবার ও বোঝাবার, অর্থাৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা ঐ সমগ্র-সাধনার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। নচেৎ আমরা রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভায় দিশাহারা হয়ে যাব এবং তাঁর সৃষ্টির তাৎপর্য গল্প, নভেল, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, স্বদেশপ্রেম, সঙ্গীত,

শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মপ্রবৃত্তির তালিকায় পরিণত হবে—যা এতদিন ধরে হয়ে আসছে ও আজও হচ্ছে। সমগ্র হিসাবে তাঁর বিস্তারিত সমালোচনা এখনও হয়নি, কিংবা হলেও আমার নজরে পড়েনি। প্রথমেই তার কারণ খুঁজতে হবে।

সর্বপ্রধান কারণ আমার মতে রবীন্দ্রনাথ নিজে। অজস্র জায়গায় তিনি বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কখনও লিখছেন তিনি প্রথমতঃ কবি, কখনও প্রথমতঃ সঙ্গীত-রচয়িতা; কখনও ইঙ্গিত করছেন তিনি প্রথমে বাঙ্গালী. ভারতবাসী, এশিয়ান, আবার কখনও বিশ্বজনীন; কখনও আভাস দিচ্ছেন তিনি প্রথমে ভবিষ্যতের, কখনও বর্তমানের, অতীতের। এমন কি এও লিখেছেন যে আর্টিস্ট একাকী, আবার বলেছেন, যেমন ঐ চিঠিতে, তাঁর মত আর্টিস্টের সাধনা সমগ্রকে, অর্থাৎ অন্ততঃ সমাজকে, নিয়ে।* বস্তুতঃ, তাঁর পক্ষে মতামতগুলো স্বতঃবিরোধী নয়। মহৎ ক্ষুদ্র বৈপরীত্যের অতিরিক্ত, তাকে অগ্রাহ্য করে নয়, তাকে গ্রহণ করেই। একে কবির খামখেয়ালও বলা চলে না, যদিও তিনি খেয়ালী ছিলেন, এবং অনেক সময় শ্রোতা ও পাঠকের চাহিদা অনুসারে সমগ্রর পরিবর্তে মতামতের কোনো বিশেষ অংশ বা দিক তাকে দেখাতে হত। একটু উঁচু স্তর থেকে দেখলে মনে হয় যে প্রত্যেককে, বিশেষকে, অতটা শ্রদ্ধার ফলই তাই। এ তো গেল তাঁর ব্যক্তিগত দিক।

সমালোচনার দিক থেকে বিপদ ভয়ঙ্কর। অন্ধের হস্তীবর্ণনা সমালোচনার কাম্য নয়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় কারণ সমালোচকের অক্ষমতা। কে অস্বীকার করবে যে রবীন্দ্রনাথ বিশাল মানুষ? প্রতিভা যে সাধারণ গুণ নয় সকলেই মানতে বাধ্য। জীবতত্ত্বেরও তাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেক্‌সপীয়র, দান্তে, গ্যেঠে প্রভৃতির সমালোচনার ধারা বন্ধ হয়নি। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ অ-সাধারণকে হৃদয়ঙ্গম করতে সর্বদাই চেষ্টা করেছে। তারা, নক্ষত্র, বিশ্ব, পৃথিবী,

* একই দিনে, টাউন হলে এবং সেনেট-হাউসে, এই বিষয় তিনি দু'টি ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। দু'টি সভাতেই আমি উপস্থিত ছিলাম।

সমুদ্র, পর্বত, জোয়ার-ভাটা, অণু-পরমাণুর প্রকৃতি কিছু কোনো প্রতিভার প্রকৃতির চেয়ে কম মহান, কম জটিল নয়; তবু বৈজ্ঞানিক তাঁর কাজ থামিয়ে দেননি। প্রকৃতির বিশালতায় তিনি হয়তো হতভম্ভ হয়ে গেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অন্বেষণের বিরাম হয়েছে কি? খোঁজের মধ্যে যে দম্ভ আছে সেটি দোষের নয়, বরঞ্চ সেইটাই মানবতার একটি প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনায় যে বিনয় ধরা পড়ে সেটি মানবতায় অবিশ্বাস, একপ্রকার কাপুরুষতা। তারই ফলে খণ্ডবোধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সমালোচনায় তাঁর সমাজবোধের উল্লেখ থাকবে না; তাঁর ছন্দ-বিশ্লেষণে তাঁর সঙ্গীত-বোধের, সুরজ্ঞানের কথা আনলেই সেটা অ-সাহিত্যিক বিচার হবে; তাঁর রাষ্ট্রকল্পনায়, নাটক, গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে, নভেলে, কথাবার্তায় তাঁর কবিত্ব, বাঙ্গালীত্ব, ভারতবাসীত্ব নির্বাসিত করতেই হবে, নচেৎ 'বিশুদ্ধ' সমালোচনা হবে না; এমন কি তাঁর গোষ্ঠীর পারম্পর্য দেখানোও অ-বিচার, অসভ্যতা। ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখ তো দূরের কথা—এই ধরনের বারণ খণ্ডদৃষ্টির পরিচায়ক। বারণ না মানা ঠিক স্পর্ধার লক্ষণ নয়, কারণ মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয় তবে এও স্বীকার করতে হবে যে, সমগ্র-বোধ (গেস্‌টাল্ট্‌) চেতনার প্রকৃতি, সে-বোধ সব জীবজন্তুর, আদিম মানবের, শিশুর পর্যন্ত আছে, অতএব বাঙ্গালী সমালোচকেরও আছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের দু' তিনটি প্রবন্ধে অবশ্য আমি সমগ্রবোধের চেষ্টা লক্ষ্য করেছি। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনটাকেই আর্ট বলেছেন। এটাও কিন্তু ঠিক সমগ্রদৃষ্টি নয়, কারণ এর পিছনে জীবন, জীবনীশক্তি, কিংবা ঐ ধরনের একটা কিছু গুহ্য ঐক্যের প্রত্যয় আছে। এখানেও অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যবহারে, বহু রচনায় তার সমর্থন মিলবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বকে এখানেও ছাড়া চাই। বিশাল সমগ্রবোধ রবীন্দ্রনাথের অর্জিত ধন, শৈলেনবাবুর উদ্ধৃত চিঠিতে তার প্রমাণ রয়েছে, এ বোধ তাঁর পূর্বে ছিল না, অতএব একে পিছনের কোনো মৌলিক ধাক্কা ভাববার প্রয়োজন নেই। জীবন-বোধ প্রত্যয়টি

য়ুরোপীয় দর্শনের genetic fallacy of original substance, কিংবা অধ্যাপক রাইল সাহেবের ভাষায় "ghost in the machine", "mistake of category" বলা চলে।

পূর্বোক্ত দু'টি কারণ ছাড়া আরো অনেক কারণ আছে যেজন্য রবীন্দ্রনাথের সত্য সমালোচনা এখনও হচ্ছে না। তাদের উল্লেখ এখানে করব না। আমার বর্তমান উদ্দেশ্য একটু পৃথক। যদি সমগ্রবোধ তাঁর সাধনার মর্মকথা হয়—আমার মতে সেটি গুহ্য নয়, নিতান্ত স্পষ্ট —তবে সমগ্রভাবে, অর্থাৎ চোখ খুলে, তাঁকে বুঝতে হবে। এই বোঝবার অর্থ কি? অর্থ এই যে তার রীতিনীতি ভিন্ন। খণ্ডদৃষ্টি আর সম্পূর্ণ দৃষ্টির জাতি পৃথক। অনেকের ধারণা বুদ্ধির ধর্মই খণ্ড করে দেখা, অতএব বুদ্ধি ও যুক্তিসম্মত বিচার খণ্ডদৃষ্টির জাতি নির্ণয় করে এবং অনুভূতি ভিন্ন যখন সমগ্রবোধ অসম্ভব, তখন সমগ্রদৃষ্টি অনুভূতির ধর্মানুসারে চলবে। এক হিসাবে এই ধারণা সত্য। কিন্তু তার পরিণতি হল নীরবতা, কারণ অব্যক্তের সমস্তরের উপযোগী কোনো বর্ণনা নেই, সমালোচনাও নেই। সেজন্য অব্যক্ত থেকে নামতেই হবে। ফলে সমগ্র অনুভূতির প্রত্যক্ষ তীব্রতায় কিছু হ্রাস হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখানেই পাওয়া যাবে মজা, রস, পুনর্মিলনের প্রয়াসের আকুতি, সাধনা, সাহিত্য, কলা, প্রেমের প্রাণবস্তু। ব্রহ্মময় জগৎ বাদ দিলে বাকি প্রাণময়, মনোময়, বাঙ্‌ময়, রসময় জগতের সৃষ্টি-তত্ত্বই হল এই সামান্য দূরত্ববোধ, ঐটুকু হ্রাস, ঐ দ্বিত্ব, অর্থাৎ সমগ্র-বোধের স্মৃতি। রস-সমালোচনায় জাগ্রত স্মৃতির প্রয়োজন, কারণ তাকে ভাষায় রূপায়িত করতে হবে, নচেৎ সমালোচককে বলতে হবে 'পড়ে দেখ', যেমন সাধুরা শিষ্যদের বলেন 'করে দেখ'। অতএব উপলব্ধির স্মৃতিময় বুদ্ধিসম্মত বিচারকে অনুভূতি থেকে পৃথক না রেখে উপায় নেই। আমি অনুভূতি-ক্রিয়া অস্বীকার করছি না। তার প্রয়োজনও একান্ত। যে-পাঠকের মনে কোনো-না-কোনো মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার নকশা স্থিরভাবে প্রতীয়মান হয়নি, তার পক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার বক্তব্য মাত্র

এইটুকু ঃ উপলব্ধির পর তার স্মৃতি বজায় রেখে যে বুদ্ধিসম্মত সাহিত্য-সমালোচনা সম্ভব, তার রীতিনীতি খণ্ডবোধের সমষ্টিগত সমালোচনার রীতিনীতি থেকে ভিন্ন, খণ্ড সমালোচনার রীতিনীতি থেকে তো বটেই। আধুনিক ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্ক তুলতে চাই না। কেবল এই বললেই বোধ হয় চলবে যে, রসজ্ঞান একপ্রকার empirical knowledge, এবং empirical knowledge-এর প্রস্তাব, proposition, সত্য-মিথ্যা কাঠামোর ভেতরে ঠিক পড়ে না। সত্য-মিথ্যার কষ্টিপাথর অনুভূতি, এবং সমালোচনার অর্থ analysis of meaning, অর্থ-বিশ্লেষণ, causation নয়। সমগ্রের সঙ্গে যোগ ব্যতিরেকে যখন অর্থ অসম্পূর্ণ, তখন রস-সমালোচনার কাজই হল ঐ যোগের প্রক্রিয়া বোঝা ও বোঝানো।

এখানে গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত দিলে ঐ প্রক্রিয়া ব্যাপারটা বোধগম্য হবে।

(১) প্রথমে ধরা যাক কবিতা। মোটামুটি দুইভাবে রবীন্দ্র-কবিতার বিচার হয়েছে। (ক) সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে; অর্থাৎ, ছন্দবিন্যাস, শব্দচয়ন, বাক্যসঙ্গতি এবং ভাবার্থ ইত্যাদি। প্রতিরূপ, ধ্বনিসম্পাত, গঠন, ছক ও বুনানির দিক থেকে যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি, তবু এগুলো সাহিত্যিক বিচারের অন্তর্গত। প্রতিরূপ, প্রতীকের আলোচনা যথার্থভাবে না হলে সেগুলো সাহিত্যিক বিচার থেকে বেরিয়ে আসে। (খ) সাহিত্যের বহির্ভূত যে-কোনো স্থান থেকে। একে অ-সাহিত্যিক আলোচনা বলা হয়। সেটা হয়তো পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ 'অ'-এর অর্থ যথামত বিপরীত নয় সর্বক্ষেত্রে, যেমন অ-সহযোগ, অ-জ্ঞান, অ-স্বাভাবিক-এর অর্থ অন্যক্ষেত্রে সহযোগ, আংশিক জ্ঞান ও ভিন্ন স্বভাব হওয়াও সম্ভব। তা ছাড়া অ-সাহিত্যিক সমালোচনার উদ্দেশ্য সাহিত্যসৃষ্টি-পদ্ধতির গুপ্ত কারণ (motive meaning নয়) অভিব্যক্ত করা। আজকাল সামাজিক বিচারের চলন বেশী। এর খুবই দরকার ছিল ও এখনও আছে। আর একপ্রকার অ-সাহিত্যিক সমালোচনা দার্শনিক, যথা রবীন্দ্র-

সাহিত্যের উপর উপনিষদ, সাধুসন্ত, বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্বের প্রভাব, কিংবা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকল্পনা। পূর্বোক্ত দুই প্রকার অ-সাহিত্যিক বিচারধারা কখনও কখনও মিশে যায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্ব-আলোচনায়।

এখন সাহিত্যিক ও অ-সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণের দোষগুণের খবর আমরা সকলেই জানি, কেবল ব্যবহারে মনে রাখতে পারি না। বিশুদ্ধ কবিতা (pure poetry) যেমন সুরের স্পর্শে অশুদ্ধ, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচনাও তাই। যদি রবীন্দ্রনাথের সুরবিন্যাস-রীতি, সুর, অর্থাৎ—স্বর, ধ্বনি, তাল, মান, লয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকে, তবে রবীন্দ্র-কবিতার 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য-সমালোচনা অ-সার্থক হয়। এবং তাই হয়েওছে। তেমনই সামাজিক বিচার-পদ্ধতিও পুরোপুরি সাহিত্যরসের সন্ধান দিতে পারছে না। তার প্রধান কারণ আগেই বলেছি। অর্থাৎ genetic fallacy। কার্যকারণ-পরম্পরার উদ্‌ঘাটন (causation) বিশ্লেষণ (analysis of meaning) থেকে পৃথক সংজ্ঞার, বিশেষতঃ সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনার মতন ব্যবহারিক (empirical) জ্ঞানে। দ্বিতীয় কারণ sociology of knowledge-এ নিহিত রয়েছে। মার্ক্সীয়, এবং তৎপরবর্তী শেলার, ম্যানহাইম প্রবর্তিত sociology of knowledge-এর বিচারস্থান অন্যত্র। এখানে কেবল এইটুকু বলা চলে যে, যদিও সামাজিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সাহিত্যিক অভিব্যক্তির একটা মোটামুটি সমান্তরালতা, এমন কি পারস্পরিক সম্বন্ধ (correlation) লক্ষিত হয়, তবু তার সাহায্যে সাহিত্যিকের প্রত্যেক, বিশেষ রূপসৃষ্টির ব্যাখ্যা অসম্ভব। কারণ স্পষ্ট : সাহিত্যের একটা নিজস্ব ধারা, গতি তৈরী হয়ে যায়, যার বেগফল সামাজিক কার্যক্রম থেকে কক্ষচ্যুত হওয়া স্বাভাবিক। ম্যালর' যে-কথা বলেছেন সেটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না : চিত্রকর সাধারণতঃ চিত্র থেকেই প্রেরণা সঞ্চয় করেন। অন্ততঃপক্ষে এটুকু মানতেই হবে যে, সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ (immediate, primary নয়) জ্ঞান সাহিত্য থেকে এবং পরে সমাজ-জীবন থেকে আহৃত হয়; আরো পরে অবশ্য

পরম্পরা বদলে যায়, উল্টে যায়, যেমন বিপ্লবের মুখে। এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার priority সামাজিক ব্যাখ্যার priority থেকে ভিন্ন, এমন কি কখনও কখনও বিপরীত।

অতএব সমালোচকের কর্তব্য কি? দেখতে পাচ্ছি দুই দৃষ্টিভঙ্গীরই সীমা আছে। কেবল তাই নয়, বিচারের সততা রাখতে হলে সীমা লঙ্ঘন করতেই হয়। এটা সমালোচকের ত্রুটি নয়, মানুষেরই স্বভাব, মানবচেতনারই প্রকৃতি, অতএব লজ্জার কারণ নেই। লঙ্ঘনবৃত্তিকেই কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কবিতার সাহিত্যিক বিচারে চলবে না, যেখানে কবিতা সঙ্গীতের কোলে মূর্চ্ছিত হচ্ছে তার সন্ধান দিতে হবে; কেবল সামাজিক বিচারও অসম্পূর্ণ, যেখানে সমাজ কবিকে, ঐতিহ্য কবিতা রূপ ও বিষয়কে মুক্ত হবার সুবিধা দিচ্ছে তার ঠিকানাও জানা চাই। এইভাবে দেখলে খণ্ডবোধের দোষ বিনষ্ট হয় এবং সমগ্রবোধের আভাস ফিরে আসে, অথবা জন্মায়।

(২) দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কথা, সুর ও ভাবসমন্বয়ের যৎসামান্য বিচার হয়েছে। কিন্তু কবিতার ওপরই বেশী জোর পড়েছে। আমার বিশ্বাস এই ধরনের বিচারই অসম্পূর্ণ; কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরবিন্যাসে যে প্রতিরূপ (image) ও প্রতীক (symbol) সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সেই সঙ্গীতের কথাকৃত ও ছন্দকৃত প্রতিরূপ ও প্রতীকের সন্ধান দেখানো হয়নি, দু'য়ের মধ্যেকার যোগ স্থাপিত হয়নি। কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রচিত্রের চিত্রগত প্রতিরূপ ও প্রতীক বাইরে পড়ে রয়েছে। অথচ কথা, ছন্দ, ভাব ও ধ্বনিগত রূপ ও প্রতীকের সঙ্গে সুরগত প্রতিরূপ ও প্রতীকের সম্বন্ধ নিগূঢ় এবং সেগুলো চিত্রগত প্রতিরূপ ও প্রতীকের অঙ্গাঙ্গী। কবিতায় মৃত্যুকল্পনা, চিত্রে সাদাকালো অর্ধ উন্মুক্ত রহস্যময়ী মূর্তি এবং জীবনের শেষ দিকের বহু সঙ্গীতের সুরবিন্যাসের (যথা, পূরবী) সাহায্যে সৃষ্ট প্রতিরূপ,—এইসব একই অখণ্ডিত সমগ্র পরিকল্পনার রূপান্তর। এই তথ্যটি মূল; তার ব্যাখ্যায় যদি উপনিষদের তত্ত্ব আসে আসুক যদি তাঁর সুরজ্ঞানের আলোচনা আসে আসুক, যদি চিত্রসাধনার ইতিহাস আসে তো

আসুক—এবং প্রত্যেকটিই আসবে—কিন্তু কোনোটাকেই মূলতত্ত্ব বলব না; কারণ পূর্বে লিখেছি, আবার লিখছি—তাতে সমগ্রতার বিশ্লেষণ কিংবা বিচার হবে না, একটির সঙ্গে অন্যটির কার্যকারণ-পরম্পরাই দেখানো হবে।

(৩) নাটকের সমগ্র নকশা নিতান্ত সুস্পষ্ট। ধরা যাক চিত্রাঙ্গদা—এটি নাটক, কিন্তু নাট্য-কাব্য; তার কবিতা লিরীক্যাল, অর্থাৎ ড্রাইডেনের নয়, এলিয়টেরও নয়; লিরীক কবিতা সুরধর্মী; সুরের সঙ্গে প্রচলিত চরিত্রধর্মী নাটকের একটু বিরোধ আছে; সেই বিরোধের হ্রাস হয় ভাবজগতে, যেখানে বিরোধের তীব্রতা নির্ভর করে ভাব-ঐতিহ্যের দৃঢ়তার উপর, যেমন স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ঐতিহ্য, বীরত্ব, ত্যাগসংক্রান্ত ভারতীয় ধারণা—এই দু'টির ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের নাটকীয় অভিব্যক্তি; অন্য দিকে লিরীক কবিতার সুর; ভারতীয় সুরের মেলডি যতটা লিরীক কবিতার অনুকূল *ঠিক ততটাই প্রচলিত নাট্যধর্মের প্রতিকূল*; ইতিমধ্যে নাট্যধর্ম ভাব-জগতে পৌঁছে পরিবর্তিত হয়েছে; তবুও অসামঞ্জস্য থেকে যায়; তার অবসান চাই; এখন এল রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা; সে কথা, বাঙলা ভাষার জন্য, ও রবীন্দ্রনাথের কথা বলে, একটি বিশেষ ধরনের; তার একটি অংশ চিত্রপ্রধান, আর একটি 'গল্প', ও আর একটি সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে, অন্ততঃ চেষ্টা করে। চিত্রাংশের যোগ সাজসজ্জায়, আলোকসম্পাতে দৃশ্যপটের রঙবাহারে; গল্পাংশের যোগ অভিনয়ে; আর সুরাংশের হল তালে ও কথায়। যোগসূত্রে বাধা পড়ে যেখানে সেখানেই 'নাটকীয়' মুহূর্ত; গাছপালার nodes, antinodes-এর মতন। যদি জট পাকিয়ে যায় তবেই মুশকিল। জট খোলবার আঙ্গিকও আছে, কিন্তু সেজন্য চাই নীরবতা, শৈলেন ঘোষের উদ্ধৃত চিঠিতে তার উল্লেখ আছে: "তাই সমগ্রর সঙ্গে সহজ যোগসূত্রে জটা পড়ে গেল। তখন নিজেকে স্তব্ধ করে জটা খোলবার সময় আসে।" চিত্রাঙ্গদার অভিনয়ে এমনই কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত আছে যেখানে কথা নেই, সুর নেই, তাল নেই। এই স্তব্ধতায় রবীন্দ্র-

কবিতা ভরা। শান্তিময় 'বলাকা'র আরম্ভ স্তব্ধতা-ভঙ্গে, কিন্তু সমগ্র কবিতাটি স্তব্ধতায় পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সাধনায় ভোরবেলাকার ধ্যানের কথা কে না জানে! ঐ সময় সমগ্র থেকে বিচ্যুতির ফলে যেসব জট সারাদিন জমতো সেগুলি তিনি খুলতেন।

আমার বক্তব্য ঠিক পরিষ্কার হল কি না জানি না। অনেক পাঠকই বলবেন হয়নি। কিছুটা আমার দোষ নিশ্চয়ই; কিন্তু সমগ্র-বোধটাও বুদ্ধির দিক থেকে ঠিক সহজ নয়, যদিও শিশু, আদিম মানবের পক্ষে নিতান্ত সহজ। শুনেছি সাধুসজ্জনের দৃষ্টিভঙ্গীও সম্পূর্ণ। পড়েছি আইনস্টাইনও শিশুসুলভ সমগ্রদৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বকে দেখেন। রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই সহজ বোধের কথা লিখেছেন; এবং এইজন্যেই অধ্যাপকীয় সমালোচনার উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। সে যাই হোক, আর তিনটি সাবধানতাসূচক মন্তব্যের সাহায্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। (১) সমগ্রতাবোধ খণ্ডতাবোধের পাটিগণিতের যোগবিয়োগ নয়, যদিও তাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে খণ্ডের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু তখন যদি মনে থাকে যে খণ্ড পূর্ণের অংশ, তবে গোলমাল হয় না। (২) সমগ্রবোধের পর অংশবিচার যুক্তির অবরোহী প্রথা নয়; সমগ্রতা অংশের মধ্যে ওতপ্রোত, পরিব্যাপ্ত, বোরন্‌সনের ভাষায় যেমন tactile quality। পটুয়া যেমন মাটি, তেল ও তুলি দিয়ে দেবীর দেবীত্ব প্রতি লেপে ফুটিয়ে তোলে, তেমনই সমগ্রবোধও অংশকে সর্বদাই প্রবুদ্ধ করতে থাকে। (৩) সমগ্রবোধ চেতনার স্বভাব, অতএব সব সৃষ্টিরই স্বভাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বিশাল, তাই তাঁর সমগ্রতাও বিশাল, তাঁর ছকের সূত্রও বহু, সম্বন্ধও বিবিধ এবং অংশকে অনুগত করাতে তাঁর বেশী কৃতিত্ব। এ ছাড়া প্রতিভার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু থাকলেও এক্ষেত্রে আপাততঃ অবান্তর, এবং সেই অজুহাতে রবীন্দ্র-সমালোচনাকে কৃতিত্বের তালিকায় পরিণত করা নিরর্থক।

॥ পূর্বাশা ॥ ॥ আষাঢ় ॥ ১৩৫৭ ॥

রবীন্দ্রনাথের চিত্র

পঁচিশে বৈশাখ। প্রাতঃস্নানের পর রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে গোটা কয়েক কবিতা ও একটি প্রবন্ধ পড়লাম। মন-প্রাণ-বুদ্ধি তাজা হয়ে উঠল। দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম, সরকার আজ ছুটি দিয়েছেন এবং বহু অনুষ্ঠানে কবির জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব হবে। খবর ভালো, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছুটি ও উৎসবে, দু'টিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেন না বুঝে মনে যতটা ক্ষোভ জমেছিল, তার খানিকটা কম্‌ল আমাদের প্রান্তিয় সরকারের ঔচিত্য-বোধে। কিন্তু শহর ও বাংলা দেশব্যাপী উৎসবের খবরে মনটা বেশীক্ষণ উৎফুল্ল রইল না। পুরাতন অভিজ্ঞতা বিভীষিকাময়। আবৃত্তির উচ্চারণ, গানের বেসুর, নৃত্যের বেতাল, উদ্যোক্তাদের গণ্ডগোল, বক্তৃতার অবান্তরতা ও সর্বোপরি প্রত্যেক অনুষ্ঠানের রাজকীয় মতের কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথকে পুরে দেওয়ার প্রাণপণ প্রয়াসের স্মৃতি কিছু পিপাসিত চিত্তের পানীয় নয়। তবু ছুটি, তবু উৎসব, তবু চারুকলার সংস্পর্শ, তবু রবীন্দ্রনাথের নাম, গান, কবিতা! কোনো অনুষ্ঠানে কি তাঁর ছবি দেখানো হবে? সেখানে যেতে মন চায়।

একটু বেশী বয়সে কবি ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন বলে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, চিত্রাঙ্কন ছিল কবির বৃদ্ধ বয়সের বিলাস। বিলাস কথাটারই উপর আমরা জোর দিয়েছি। অর্থাৎ, সেটা তাঁর

স্বধর্ম ছিল না, এবং যে কালে স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ ও পরধর্ম ভয়াবহ, তখন কবি হিসাবে তাঁকে আমরা নিধন করলেও চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁকে দেখতে ভয় পাওয়াটাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক—এই প্রকার ধারণা আমাদের মনের মধ্যে কাজ করেছে। তবু ভয় পেলেও আমরা তাঁর ছবিকে অতটা অবহেলা করিনি যতটা তাঁর কবিতাকে করেছি। তার কারণ এই যে, ছবিকে লিখে ঠাট্টা করা বেশী শক্ত, কারণ এই যে, ছবির প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ কম এবং কারণ এই যে, চিত্রকর তখন যে কারণেই হোক জগদ্‌বিখ্যাত, নোবেল লরিয়েট এবং বৃদ্ধ। আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর কবিতা, গল্প, গানের মতনই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সঙ্গে একপ্রকার জৈব সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাঁর নিজের অনেক মন্তব্য অবশ্য আমাদের ভুল ধারণার সাহায্য করেছে। এই যেমন তিনি বলেছিলেন যে, সাহিত্য-রচনার সময়কার কাটাকুটি থেকেই তাঁর চিত্রের জন্ম, ছবি তাঁর খামখেয়াল, অশিক্ষিত-পটুতা ইত্যাদি। (গান সম্বন্ধেও তাই: এই যেমন বলতেন, তিনি গান শেখেননি, তাল ভালো জানেন না)। এক দিক থেকে এ সব কথাই সত্য; আবার অন্য দিক থেকে এগুলো বিনয়ের চিহ্ন, বৈষ্ণবী বিনয় নয়, বহুমুখী ঐশ্বরিক প্রতিভা, তার প্রাচুর্য, তার অবিশ্রান্ত উৎসের সম্মুখে তার স্বত্বাধিকারী, এক জন মানুষের বিনয় মাত্র। আমরা এ কথাটা বুঝিনি, কারণ, না বোঝাই ছিল আমাদের সুবিধা।

তাই এক এক সময় সন্দেহ হয় যে, আমরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে অবহেলা করে আমাদের নিজেদের সৌন্দর্য্যবোধের অভাবই প্রতিপন্ন করেছি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে একটা ঘনতা আছে, এবং ঘনতাকে অশ্রদ্ধা করা সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন নয়। তাঁর যে-সব কবিতা জনপ্রিয়, তাদের মধ্যে অনেক সময় ঘনতার অভাব আছে। অবশ্য একটা বাহন কি পটভূমির নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কোনো ভাব প্রকাশ করতে গেলেই যে সেটি গাঢ়সম্বন্ধ হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। উইলিয়ম ব্লেক ছিলেন একাধারে কবি, চিত্রশিল্পী ও মিস্টিক; অর্থাৎ, খানিকটা রবীন্দ্রনাথের সমজাতি, স্বগোত্র না হলেও। এই ব্লেকের কবিতা নিতান্ত গাঢ়,

কিন্তু তাঁর ছবি প্রায়ই অসম্বন্ধ, অলস, ঢিলে। আবার নামজাদা চিত্রকরও চিত্রে অসংযত, এক রকম বেসামালই হয়ে পড়েন, যেমন টার্নার। যাঁদের ডিজাইন নিতান্ত পাকা, যাঁরা ওস্তাদ ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান, যেমন র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, তাঁদের যে কয়েকটি কবিতা আছে তার জোরে তাঁদের কবি বলা চলে না। তবুও তাঁদের মতন চিত্রকরও যে ধর্মবহির্ভূত ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিলেন, এইটাই এখানে লক্ষ্যণীয়। আর্টের মহাপুরুষদের মধ্যে এমন একটা শক্তি থাকে, যেটা কোনো বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সেটা উপ্‌চে পড়বেই পড়বে; কোথাও গোপনে, কোনো ক্ষেত্রে সর্বজনসমক্ষে। এই গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়াটা জীবনের তাগিদ হলেও তার প্রকাশ-পদ্ধতির দু' একটা মোটামুটি নিয়ম আছে। একটা নিয়ম এই: যদি আর্টিস্ট তাঁর বিশেষ, নির্বাচিত রাজ্যের কার্যাবলীতে প্রধানতঃ স্ব-ইচ্ছা, স্ব-প্রকাশের চাহিদা পূরণ করে থাকেন, তবে তাঁর নতুন ক্ষেত্রের, তাঁর উপনিবেশের শাসন একটু কড়া, একটু নিয়মিত হয়ে যায়। তখন তাঁর নতুন দায়িত্ববোধ আসে, তিনি নিয়মশীল হন। বিপরীত পন্থাটাও সত্য। আইনস্টাইন বেহালার সুর সৃষ্টি করেন, ফরাসী সার্জন ম্যালার্মের উপর বই লেখেন, প্যাস্‌কাল ভক্ত হন—এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একে ঠিক ক্ষতিপূরণ বলা যায় কি? ক্ষতি-পূরণ ব্যাপারটা নিতান্ত যান্ত্রিক।

অন্য একটি নিয়ম এই, আর্টিস্ট যে স্তরের বিশেষজ্ঞ, সেই স্তরের নিয়মকানুন মেনে নেওয়া যখন তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয় এবং যদি তাঁর প্রতিভার উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে, তবে তখন তিনি অন্য স্তরে যেতে চান। অলিভার লজ, ব্যারেট, রিশে প্রভৃতিকে আর্টিস্ট বলা হয়তো যায় না, কিন্তু এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার তাঁরা সাধারণ দৃষ্টান্ত। ক্ল্যাসিক সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত অবশ্য গ্যেঠে। তিনি শরীরতত্ত্ব ও বর্ণ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর বাহাদুরি এই যে, তিনি এক স্তরের নিয়মকে অন্য স্তরে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। অনেকে তা পারেন না, যেমন দ্য' ভিঞ্চি—তিনি মূলতঃ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এবং এই

স্তরেই আবার ফিরে আসেন—অন্ততঃ এই হল ডাঃ মার্টিন জন্‌সন নামক পদার্থবিদের মত। রবীন্দ্রনাথকে আমরা অন্ততঃ দু'টি স্তরে বিচরণ করতে অনুমতি দিয়েছিলাম, সাহিত্যে ও গানে। তবু তিনি পলিটিক্‌স, ইকনমিক্‌স, বিজ্ঞান, চিত্রচর্চা না করে থাকতে পারেননি। এ সব তাঁর পক্ষে অনধিকারচর্চা হচ্ছে লোকে যে ভাবে, তা তিনি জানতেন। তবু মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠির উত্তর, নাইট পদবী ত্যাগের চিঠি, স্বদেশী গান, দেশপ্রেম, ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ আমরা উপভোগ করেছি, কেবল তাই নয়, অধিকাংশ ভারতবাসী ঠিক ঐ সবের জন্যই তাঁকে আজও পর্যন্ত খাতির করে। আমরা, বাঙ্গালীরা, জানি যে, তাঁর পলিটিক্‌স কাব্যধর্মী ছিল, এমন কি তাঁর বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়ে', এ উপমার ছড়াছড়ি। অর্থাৎ আমরা এতটুকু মানতে রাজী যে, অন্য স্তরের কর্মে তাঁর কাব্যস্তরের কৃতিত্ব প্রকাশ পেত।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো একটু তলিয়ে দেখা দরকার। তাঁর স্তর ছিল চেতনার উর্ধাংশে যেখানে বাক্য ফুটে ওঠে, অন্ধ গন্ধ চক্ষুষ্মান হয়, কথা লুটিয়ে পড়ে সুরের বাহুল্যতায়, এবং ভাসমান প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হতে চায়। এটা মনের উর্ধতম অবস্থা নয়; সেখানেও তিনি বিচরণ করেছেন উপনিষদের হাত ধরে—প্রমাণ, শান্তিনিকেতন সিরীজ। এখানে তিনি উপনিষদের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাকে ঠিক সাহিত্যিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। কিন্তু চেতনার নিম্নতলে তিনি সাহিত্যের সিঁড়ি দিয়ে কখনও নামেননি। অবচেতনার টান, ঠেল কিংবা ঠেস তাঁর সাহিত্যিক রচনায় নিতান্ত কম, নেই বললেই চলে। এ রকমের ভদ্র, প্রায় পিউরিট্যানিক সাহিত্যিক জগতে ছিলেন, কি আছেন কি না জানি না। কিন্তু যে আর্টিস্ট বড় তাঁর হাতে সব রুটেরই টিকিট থাকে, তা তাঁর যাতায়াতের অভ্যাস মাত্র চৌরঙ্গী রুটেরই হোক না কেন। তাঁকে উঠতে হয় আবার নামতেও হয়। তিনি স্বর্গের অধিবাসী হলেও মধ্যে মধ্যে তিনি পাতাল-প্রবাসী। দান্তে, মিল্‌টন, দস্‌তয়েভস্কির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম—তাঁরা ছিলেন খৃষ্টান—কিন্তু ব্যাস বা কালিদাসকেও পাতালে না হয় অন্ততঃ প্রাসাদের

তয়খানায় নামতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রঙের তুলির ও চিত্র-কল্পনার বিষয়ের সাহায্যে এই অবচেতনার স্তরে প্রবেশ লাভ করেছিলেন। তাঁর চিত্রিত মূর্তি তাঁর সাহিত্যে নেই; সেগুলি অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু, গোটা কয়েক পৌরাণিক দানব; তাদের রঙ ভয়ঙ্কর, তাদের লাল ঘন রক্তের; তাদের রেখা সর্পিল; এমন কি ফুলটি পর্যন্ত পারিজাত নয়, নারকীয়। এই বর্ণচ্ছটায় রবীন্দ্র-সাহিত্যে তথাকথিত চাঁদের আলো নেই; এইসব মূর্তি আপন লালিত্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে না। তাদের শরীর আলোয় ভেসে যায় না, যেমন যায় রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকাদের; তারা সর্বদা থাকে একটা কালো পর্দার পিছনে, আড়ালে-আবডালে। তাদের দেখলে সন্দেহ হয়, বুঝি বা রবীন্দ্রনাথ আঁকবার পূর্বে কাপড়ের উপর একটা কালো পৌচ দিতেন। কে বলবে এ সব অন্ধকারের জীব চিত্তরঞ্জন দাশের কল্পিত কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত! একেও আমি ক্ষতিপূরণ বলতে নারাজ।

আমার মতে ব্যাপারটা এই: জীবনের ধর্ম কাব্যরচনা নয়; চিত্রাঙ্কনও নয়; জীবনের ধর্ম প্রসার, সীমানার বাইরে, সর্ব স্তরে। জীবনের ধর্ম এই প্রসারণের সঙ্গে সঙ্কোচন; এবং এই দু'টি প্রক্রিয়ার সাহায্যে নিয়মসৃষ্টি ও সেই নিয়মের অনুবর্তিতা। পন্থাটিকে চক্রবলয়, কিংবা কম্বুরেখার আকারে হয়তো পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু পন্থার চেয়ে পথিকই প্রধান। তাই আজ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ নামে পুরুষকে বুঝতে চেষ্টা করাই ভালো, তার সমগ্রতাকে, তার মূলকে গ্রহণ করাই মঙ্গল। চিত্রাঙ্কন তাঁর ধর্ম-বহির্ভূত ছিল বলেই লোকের ধারণা, এবং ঠিক সেইজন্যই তাঁর অধার্মিক ব্যবহারের সাহায্যেই তাঁর পুরুষত্বের (পার্সনালিটির) অদ্ভুত সন্ধান মিলবে, আমি আশা করছি আজ।

এই সন্ধানের সুবিধা বাঙ্গালীরই আছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষা আমাদের ভাষা, অন্ততঃ এখন। অন্য প্রদেশের ভারতবাসীদের এই সুবিধা নেই। তা ছাড়া, মনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে তাঁদের একাধিক বাধা আছে। তাঁদের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালীরা তাঁকে

নিয়ে একটু বেশী হুজুক করেছে, অবশ্য বাঙ্গালীদের অভ্যাস বলেই। ভারতবর্ষে আজকাল ইকনমিক্স, পলিটিক্স ছাড়া আর কিছু নেই। সেই ইকনমিক্সে বাংলার দাম মাড়োয়ারের উপনিবেশ ও কলকাতার দাম তার রাজধানী বলে এবং পলিটিক্সে বাংলার মূল্য যা না হওয়া উচিত তার দৃষ্টান্ত হিসাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মনে বাংলার স্থান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। যা দেখছি, তাতে মনে হয় যে, আজ না হয় কাল পশ্চিম বাংলা চীফ কমিশনারের প্রদেশ কিংবা পাকিস্তানের সীমান্ত হয়ে দাঁড়াবে। এতে অভিমানের কিছু নেই, কর্তব্য ও দায়িত্বই আছে। আমরা বাঙ্গালীরা আজ মনেও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত, অন্যান্য ভারতবাসী যা নয়। মানুষ হিসাবে কোনো সম্পূর্ণ বাঙ্গালী চোখে তো পড়ে না; কারুর মূলের সঙ্গে যোগ আছে বলে সন্দেহ হয় না। রবীন্দ্রনাথের ছিল; তিনি ছিলেন গোটা আস্ত মানুষ। তাঁর সাহিত্য, তাঁর গান, তাঁর চিত্র সব একসূত্রে গ্রথিত। চিত্রকর হিসাবে তাঁকে ভিন্ন মনে হয়; কিন্তু বিচারের ফলে দেখি যে তা নয়; দেখি সবই একটি পুরুষের, একই মানবের, একই পার্সনালিটির বিকাশ। আরো দেখি যে সেই বিকাশের নিয়ম আছে। বিখণ্ডিত মনকে একত্রিত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় অখণ্ডিত, পূর্ণ পুরুষের মর্ম-বিচার, তার ফলে প্রকাশের নিয়ম আবিষ্কার ও সেই নিয়মের সদ্‌ব্যবহার। এই জন্যই অমি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসবে যোগ না দিয়ে তাঁর ছবি দেখতে চাই প্রধানতঃ, তার পর তাঁর গান ও কবিতা শুনতে চাই, এবং তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা থেকে দূরে পালাই।

॥ মাসিক বসুমতী ॥ ॥ আষাঢ় ॥ ১৩৫৫ ॥

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও গায়ন-পদ্ধতি

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে আমি এখানে একটি মূল বিষয়ের আলোচনা করছি। আমার এক বন্ধু কথাটি পাড়লেন: "বুঝলাম তো সব। তবে হিন্দী গানের পর রবীন্দ্রনাথের ভালো গানগুলিও জমে না কেন?" তাঁর এই মনোভাব অন্য বন্ধুরাও সমর্থন করলেন। এঁরা কেউ সঙ্গীতজ্ঞ নন। তানসেন, বৈজু বাওরা, সদারঙ্গ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রতিই তাঁরা অধিক শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান। তাঁরা প্রত্যেকেই রসজ্ঞ আর দায়িত্বহীন মন্তব্যে অনভ্যস্ত। এখন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তুলনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত জ'লো ও পাতলা ঠেকে কেন, তার বিচার চাই।

প্রথমেই বলে রাখি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরই অঙ্গ। যেসব গানে অঙ্গভঙ্গ হয়েছে মনে হয়, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি রীতি-বিগর্হিত কাজ করেননি। রাগভ্রষ্টতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী কবিতার কোনো বিশেষ ভাব, যাকে মূর্তি দেওয়া প্রচলিত বিশেষ রাগরূপের মধ্যে একপ্রকার অসম্ভব। তবুও রবীন্দ্র-সঙ্গীত বর্ণসঙ্কর নয়।

দ্বিতীয় কথা, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরে অনেক গায়ক গলা ছেড়ে গান করেন না। ফলে বহু গান জমতে পায় না। মাইকের সামনে সভায় গাইবার অভ্যাসকে কেউ কেউ এর জন্য দায়ী করেন। খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই, যদিও খোলা গলায় গাইলে মাইকের গান কেন দুর্বল লাগবে, বুঝি না। ফৈয়াজ খাঁ স্বাভাবিক শক্তিতে বেতারে গান

করতেন না, মানি। তবু তিনি মাইকের সামনে ঝিমিয়ে কি ঘুমিয়ে পড়তেন না। মাইকের সামনে গলা চাপতে হয় না। শান্ত, ধীর ও শ্রুতিপ্রধান করতে হয়। তবে কি শিক্ষার দোষ? এ অভিযোগও শুনে থাকি। দিনুবাবুর শিক্ষা-পদ্ধতি একটু অন্যরকমের ছিল। তিনি প্রাণ দিয়ে গাইতেন—জোরে, স্ফূর্তি করে, যে জন্য শিক্ষার্থীরাও নিদ্রালু হতে পারতেন না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বর্তমান শিক্ষকদের শিক্ষাপদ্ধতি লক্ষ্য করবার অবকাশ মেলেনি। তবে সন্দেহ হয়, তাঁরা যে কোনো কারণেই হোক, রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে যথোপযুক্ত প্রাণবান করে তুলতে পারছেন না। এ বিশ্বাস ঠিক নয় যে, রবীন্দ্রনাথের গান কেবল প্রাণস্পর্শী। যদি তাই হয়, তবে অনেকের মতে সভামণ্ডপে সে সঙ্গীতের স্থান নেই। কারণ, প্রাণস্পর্শন গোপন ও সূক্ষ্ম কর্ম এবং সভার প্রাণ নেই, আছে একটি শ্রোতার। সভায় থাকে একটি অস্পষ্ট সমবেত ভাব—যেটি চঞ্চল ও জাগ্রত হতে উদ্‌গ্রীব। আর সে আশা যদি কোনোও কারণে অপূর্ণ থাকে, তবে ভাব হয়ে যায় আড়ি। কথাটি পুরোপুরি সত্য না হলেও, এটুকু বলা চলে যে, শিক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। সংখ্যাধিক্যের জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সবিশেষ, ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া যায় না, আর তারাও নিজের পড়াশুনো, কাজকর্ম সেরে যথেষ্ট রেওয়াজের সময় পায় না। এর উপর আছে অর্থ-চিন্তা ও স্বাস্থ্যহীনতা।

গায়ন-পদ্ধতির উল্লেখ করছি বিশেষ কারণে। একেই আমাদের কণ্ঠ-সাধনার প্রক্রিয়া অবৈজ্ঞানিক। অন্ততঃ যা ছিল—যেমন জাকরুদ্দিন, আলাবন্দে, নসীর উদ্দিন, বিষ্ণু দিগম্বর কি অঘোরবাবুর গলায় —তাও গেছে ঘুচে। তবু, হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতির কণ্ঠ থেকে স্বর তোলাই সাধারণ নিয়ম। ভাত্‌খণ্ডেজী ছাত্রদের হাঁ করে গাইতে, দীর্ঘ আ-কারের সাহায্যে স্বর বার করতে শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষায় কণ্ঠই স্বরের ভূমি, নাক নয়। সত্যিই তাই। কণ্ঠের শ্বাস যেমন বুক থেকে ওঠে, স্বরের শ্বাসও তেমনি সেখান থেকে উঠবে। কেসর বাঈ, মুস্তাক আলি প্রভৃতি যে কোনো বড় গায়কই গলা চেপে গান না।

বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁরা আজকাল খেয়াল গাইছেন, তাঁরাও এ বিষয়ে ততখানি অবহিত নন। কেবল মাইকের জন্যই নয়। আবদুল করিম ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের প্রভাবের জন্যও বাঙ্গালীর কণ্ঠও আজ ওজসের পরিবর্তে তথাকথিত মাধুর্যকে বরণ করেছে। ধ্রুপদের অবসানও অপর একটি কারণ।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ন-পদ্ধতিতে কণ্ঠের সহজ উদাত্ত স্বরের ব্যবহার বরাবরই কিছু কম। এখন আরো কমে আসছে। সভায় সকলেই যদি ঠোঁট, গাল ও গলা বুজে গান, তবে আওয়াজ বেশী দূর পর্যন্ত ছড়াতে পায় না। সভাগৃহের দেয়াল থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে না শ্রোতার কানে। যতদিন নাকী আওয়াজের সঙ্গে ন্যাকামির যোগ রয়েছে এবং লজ্জা অথবা স্বাস্থ্যহীনতার তাড়নায় মেয়েরা হাঁ করে মুখ খুলে না গাইছেন, ততদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে এই প্রকার মতামতের জন্য গায়ন-পদ্ধতিকেই দায়ী করবার সুযোগ থাকবে। দোষটি কিন্তু সহজেই কাটানো যায়। উপায়—তানপুরার সাহায্যে বছর দুই কণ্ঠস্বরের সাধনা। আ-স্বর যতদিন না কণ্ঠে বাসা বাঁধছে, অর্থাৎ স্থিত হচ্ছে, ততক্ষণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত মুখ-স্থ করা উচিত নয়। সভাস্থ তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথের গানে সব ক'টি স্বরবর্ণের প্রয়োগ করতে হয় এবং সাহিত্যের আদি অক্ষর অ-কার হলেও সঙ্গীতের আদি অক্ষর আ-কার। আ-কার পাকা হলে তার দৌত্যে শ্রোতার সঙ্গে গায়কের সম্বন্ধ পাকা হবে। নচেৎ শ্রোতাকে কান খাড়া ও মন সজাগ রাখতে হবে—যে কাজটি প্রিয় নয়। তা ছাড়া, উপভোগ সর্বদাই সম্ভোগ।

পূর্বোক্ত যুক্তির বিপক্ষে, অর্থাৎ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বর্তমান গায়ন-পদ্ধতির স্বপক্ষে একটি কথা অবশ্য বলা যায়। সঙ্গীত, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীত হচ্ছে ললিতকলা এবং লালিত্য প্রকাশের কণ্ঠসাধনা একটু অন্যরকমের হবেই হবে। নাকী স্বর সাধারণতঃ মিষ্টত্বসূচক—যথা, দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে নাঁ নাঁ নাঁ .....কী মিষ্টি! শব্দতাত্ত্বিকদের মতও শুনেছি খানিকটা তাই, পুরোপুরি নয়। তা, থা, দা, ধা-র মতনও কিছু

'না' শব্দটির উচ্চারণ সম্ভব নয়। অতএব, গলা খুলে গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অনুচিত। অন্ততঃ সব সময় উচিত নয়। মানলাম, নাকী স্বর বর্জনে মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হবে এবং ধ্রুপদিয়া-খেয়ালিয়ারাও নাকী স্বর ব্যবহার করেন। তবুও প্রশ্ন ওঠে—কার মাধুর্য, কিসের মাধুর্য ও কতখানি মাধুর্য। হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতিতে মাধুর্য রাগের ও বন্দেশের—গায়কের নয়। এবং এতটাই নয় যে, গায়কের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত গৌণ। বন্দেশের মাধুর্যও বজায় রাখতে হয়—এই কথাটি অনেকে বোঝেন না, কি মনে রাখেন না বলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হল। বন্দেশী গানে, যেমন সেনিয়া ধ্রুপদ-ধামারে কি সদারঙ্গী খেয়ালে, রাগ ও বন্দেশ অভিন্ন। এইখানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে 'পাক্কা' গানের মিল। গরমিল আরও গভীর। কিসের মাধুর্য, বিশ্লেষণ করলেই সেটি ধরা পড়বে। শ্রোতা রবীন্দ্র-সঙ্গীত যখন শুনছেন, তখন তাঁর সামনে রয়েছে গায়ক-গায়িকা আর কানে আসছে সঙ্গীতের রূপ। কিন্তু ঐটুকু; অর্থাৎ কানে আসছে না রাগ-রূপ। বেশ—কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতার রূপও আসা উচিত ছিল না, কারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বহুব্রীহি সমাস কিংবা emergent value-র দৃষ্টান্ত হয়, তবে তাকে অত সহজে ভাঙা যায় না, ভাঙা উচিত নয়। অথচ শ্রোতার কানে সঙ্গীতের সাহিত্যিক (কবিতার) রূপটা ভেসে উঠছে। এই প্রকার partial fission-এর জন্য মাধুর্য কবিতায় ও গায়ক-গায়িকার ব্যক্তিত্বে, এমন কি রূপে আশ্রয় করে। Fission সম্পূর্ণ হয় হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতিতে। ওস্তাদ কথাকে অবহেলা করেন—এটা সত্য নয়। তিনি বন্দেশ দেখাবার পর তান ও বাটোয়ারার সাহায্যে সমন্বয়টি ভেঙে দেন। ফলে শক্তি মুক্ত হয়, শতগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্ততঃ পুরোপুরি প্রকাশ পায়। মনোযোগের কেন্দ্র কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে নড়ে বেড়ায় কবিতা ও গায়ক-গায়িকার মধ্যে। লিখতে খারাপ লাগে, কিন্তু শ্রীহীনা কুরূপার মুখে রবীন্দ্র-সঙ্গীত তেমন ফোটে না। কিসের মাধুর্যের উত্তর আর যাই হোক, মিষ্টি মুখের নয়। অতএব গায়ন-পদ্ধতির জন্য রবীন্দ্র-

সঙ্গীতে সুরাংশ আরো কমছে এবং কবিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য আরো বাড়ছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরে বাঁয়া-তবলা, খোল-পাখোয়াজ এবং তান-পুরার সহযোগে গান হয়। এটা খুবই শুভ লক্ষণ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ধ্রুপদাঙ্গের তাল আছে, যদিও অনুপাতে কম। সাধারণতঃ লঘু ত্রিতালীর সংখ্যাই বেশি। অনেক গানে কবিতার মেজাজের সঙ্গে তালের মেজাজ খাপ খায় না। নাচন্ত তালে গম্ভীর ভাব ও শব্দসম্পদ ঢেলে দেওয়া একপ্রকার bad investment। অবশ্য তালের ছকে গানকে বাঁধলে কবিতার মেজাজ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাঁচানো যায়, যদি দ্রুত কিংবা বিলম্বিত করার স্বাধীনতা গায়কের থাকে। শুনলাম এই স্বাধীনতা দিতে শিক্ষকরা তেমন রাজী নন। এখন বোধ হয় পুরাতন ও হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের তাল ও লয় সম্পর্কে একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভালো।

এতক্ষণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 'নির্জীবতা'র জন্য গায়ন-পদ্ধতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনেকের মতে গলদ গোড়ায়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যেই। তার প্রকৃতি সাহিত্যিক কাব্যধর্মী। কবিতার আবেদনে সুরের আবেদন চাপা পড়ে; মনোযোগ বিভক্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং যেহেতু কথার আবেদন সহজ ও মর্মস্পর্শী, তখন সুরের দিক থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত খাটো হবেই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর মুখ্য। কথাকে গৌণ মনে হয় আলাপ, তান ও অন্যান্য অলঙ্কার ব্যবহারের সময়। কথার ফাঁকে ফাঁকে সুর মধুচক্র সৃষ্টি করে ও তারই গুঞ্জন কথার অর্থকে ঢেকে রাখে। হিন্দুস্থানী গানে সুরের সাতত্য, অবিচ্ছিন্নতা প্রায় অটুট, এক তালের প্রয়োজন ছাড়া। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চমৎকার শব্দ ও অর্থগুচ্ছ গায়নকে সুরবলয় থেকে বিচ্যুত করে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর 'তৈলধারাবৎ'। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে স্বরকে কথার উপলখণ্ড অতিক্রম করতে হয়। স্বরের যদি সুরগত শক্তি থাকে, তবে উপলগুলিও সঙ্গে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তার সে শক্তি কম না হলেও উপলখণ্ডেরই ওজন ভারি, তার সৌন্দর্য সত্ত্বেও। এই কারণেই রবীন্দ্র-

সঙ্গীতে 'আ' করে, মুখ খুলে উদাত্ত স্বরে গাওয়া চলে না, তালের বৈচিত্র্য ও মর্যাদা রাখা যায় না। সুরের দিক থেকে এই ব্যাখ্যার পালটা উত্তর দিতে পারি না।

কিন্তু শ্রেণী-বিভাগের দিক থেকে বোধ হয় উত্তর দেওয়া চলে। অর্থসঙ্গীত আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং সঙ্গীত নানা প্রকারের। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই বলতেন। তাঁর জবাবদিহি না মানবার কোনো কারণ দেখি না। বাস্তবিকই তাই। ল্যাংড়া, আলফন্সো, দশেরী, মালিয়াবাদীর স্বাদ পৃথক, যদিও প্রত্যেকটি সুস্বাদু আম। তা ছাড়া অন্য আমেরও রস আছে, কেবল তাকে গোপনে চুষে খেতে হয়। এই গোপনতাই হল রবীন্দ্র-সঙ্গীতে রসোপলব্ধির প্রাণের কথা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগরাগিণী ও গায়ন-পদ্ধতি ব্যক্তি-নির্বিশেষ ও সাধারণ। বর্ষার জন্য মল্লার রাগটাই স্থায়ী ভাব, আদি ভাব। তাকে বজায় রাখো প্রথমে। তারপর তাকে সাজাও একটি স্বর বসিয়ে, কমিয়ে হালকা ছুঁয়ে। তাইতেই যা বৈচিত্র্য হল, সেই যথেষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি গান এক একটি বিশেষ মেজাজের। তার আদিভাব নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু সেটি সব সময় সুরগত ভাব নয়, সাহিত্যিক ভাব। 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা' গানটিতে মিঞা-মল্লার সুস্পষ্ট। 'আকুলা দুকূলারে' পদে কাফির অংশ এবং মল্লার কাফি ঠাটের অন্তর্গতঃ। অতএব বিচ্যুতিতে গুরুচণ্ডালী দোষ অর্সায় নি। অন্যদিকে 'বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে' গানটি পাকা ইমন এবং ইমনে কখনও বর্ষার হিন্দুস্থানী গান শোনা যায়নি। কেদারা ও হাম্বীরে বর্ষার হিন্দী গান ও রবীন্দ্রনাথের গান উভয়ই রয়েছে। কিন্তু যিনি 'বরখা ঋতু', 'কৈসে চাঁদিনী' প্রভৃতি কেদারার খেয়াল শুনেছেন, তিনিই বুঝবেন যে, 'তিমির অবগুণ্ঠনে' এই বর্ষার গানটি কত বিশেষ specific মনোভাব ব্যক্ত করছে। 'কে তুমি'র স্বরবিন্যাসে যে নতুন ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়, সেটি নিতান্ত ব্যক্তিগত।

আমার নিজের ধারণা, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা,—এই বিশেষ, অ-সাধারণ specific গুণের জন্যই রবীন্দ্র-সঙ্গীত নির্জীব মনে হয়

সাধারণ সভায়। যেটি রবি-বাসরে শোভন, সেটি সাধারণ আসরে শোভা পায় না। দিগ্‌বিজয়ী প্রতিভার জোরে রবীন্দ্রনাথ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা রবীন্দ্রভক্ত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নই। আমরা তাঁর গান গাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব নেই যার কৃপায় আমরা বিশেষকে নির্বিশেষ ও সাধারণে পরিণত করতে পারি। প্রতিভা, এমন কি ব্যক্তিত্বের প্রসাদও যখন নেই, তখন শিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি দিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে।

॥ শারদীয় যুগান্তর ॥ ॥ ১৩৬০ ॥

রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে সারা দেশে উৎসব চলেছে। কোলকাতা শহরে রবীন্দ্র-সপ্তাহ খোলা হয়েছে, এবং ছয়টি অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। এখনও সপ্তাহ শেষ হতে তিন দিন বাকি, অতএব আরো দু' একটি সভায় বোধ হয় যোগ দিতে হবে। কিন্তু ইচ্ছে নেই। অনিচ্ছার কারণ অনেকগুলি।

ব্যক্তিগত বাধা, যেমন যাতায়াতের অসুবিধা, বসবার কাষ্ঠাসন, ভিড় এবং জাতীয় সঙ্গীত শোনবার সময় পাঁচ দশ মিনিট খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা, সভার মধ্যে সিগারেট খাবার ইচ্ছে থাকলেও সঙ্কোচ বোধ, এসব না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু যেগুলি ছাড়া যায় না তাদের তালিকাও কম নয়। আমার বিশ্বাস, যেসব দুর্লঙ্ঘনীয় বাধাগুলির উল্লেখ করব সেগুলি জনসাধারণের। আর যদি তা না হয় তবে এই রচনাটি স্বদেশ-প্রত্যাগত এক জন মধ্যবয়স্ক প্রবাসী বাঙ্গালীর নতুন বাংলার প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হোক। সুস্পষ্টতার জন্য বক্তব্য দফা পিছু সাজাচ্ছি।

১। রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসবে অ-বাঙ্গালীর কোনো উৎসাহ নেই। সন্দেহ হয় কর্তৃপক্ষরা তাঁদের উৎসাহ জাগ্রত করবার চেষ্টা করেননি, কিংবা করতে জানেন না। কারণটিকে হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ব্যাপারটা এই ঃ বাঙ্গালী ভাবে যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার! সেটা

অবশ্য সত্য। নিতান্ত প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী; তিনি বাঙলায় লিখেছেন, বাংলার বিশেষত্বে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেছেন, বাংলার নদী, মাঠ, দৃশ্য তিনি ভালবেসেছেন, এমন কি বাঙ্গালী মেয়েদের রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁর একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার কাজে ও মতে অবাঙ্গালীদের আপত্তি নেই। কেবল তাঁদের আপত্তি বাঙ্গালীর দাবিতে যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলার। বাঙ্গালীরা অবশ্য মুখে তা বলেন না, কিন্তু ব্যবহারে প্রকাশ করেন। অথচ, প্রত্যেক বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র ভারতের ঐক্য-সাধনার একজন প্রধান সাধক ভাবেন। অবাঙ্গালীরা ভাবেন, যদিও মুখে বলেন না, 'তাই যদি হয় তবে রবীন্দ্রনাথকে অতটা প্রাদেশিক করে দেখা অনুচিত। তাঁর মধ্যে ভারতীয় অংশটা দেখানো, তাঁর সভায় অবাঙ্গালীকে সভাপতি করা, তাঁর স্মৃতি-সভামঞ্চে অবাঙ্গালীকে বসানোই শোভন। অবাঙ্গালী আরো ভাবেন, 'বিশ্বকবি' আখ্যাটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো, কারণ এই ক্ষণে বিশ্ববোধের বদলে দেশাত্মবোধটাই সকলের মনকে অধিকার করেছে। এবং দেশাত্মবোধ তাঁর নেহাৎ কম ছিল না। সে বোধ হয়তো তাঁর ভিন্ন রকমের ছিল। বেশ তো, কতটা ভিন্ন, কতটা উৎকৃষ্ট তাই বুঝিয়ে দিন।' বলা বাহুল্য, মুসলমানদের উৎসাহ জাগাতে হলে তাঁর দেশাত্মবোধের উপর জোর দিলে চলবে না। তাঁদের রবীন্দ্রপ্রীতি অন্য কারণে। সে যাই হোক, তাঁরাও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেন। এখন আমার বক্তব্য এই : বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী উভয়েই ভাবছে রবীন্দ্রনাথ ভারতের, কিন্তু বাঙ্গালীরা কাজে দেখাচ্ছে যে, তিনি একা বাংলার। প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক। যত দিন নেতাজী না ফিরছেন তত দিন বাঙ্গালীর প্রাণ খালি, তার মানের ঘর শূন্য থাকবে। কিন্তু শূন্যতা পূরণের জন্যই কি রবীন্দ্র-জন্মতিথির উৎসব চলছে ?

২। আমার অন্য সন্দেহ আরো মারাত্মক। আমি অন্ততঃ চারটে বক্তৃতা শুনেছি যাতে রবীন্দ্রনাথকে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি

চিরজীবন না হয়, অন্ততঃ শেষ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর দল ছাড়া হয়ে কাটালেন, যিনি দলাদলিতে দেশের সর্বনাশ হয়েছে বলে গেলেন, যিনি ব্যক্তিবিশেষকে পূজা করা মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায় ভাবতেন এবং যাঁর স্থান দলের উপরে বলেই বিশ্বের ও চিরকালের, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার বেলা তাঁকে বক্তার দলে টেনে আনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ে। এ প্রক্রিয়াটাও স্বাভাবিক ; কারণ, সব কাজ ছেড়ে আমরা এখন দলই গড়ছি। তবু উপলক্ষটার দাবি থেকে যায়। রাজনৈতিক সভায় যেটা চলে সেটা জন্মতিথিতে অচল। রবীন্দ্রনাথ স্ট্যালিনকে, জওহরলাল, গান্ধীজী, সুভাষকে শ্রদ্ধা করতেন—কে না জানে! কিন্তু সেই সঙ্গে সকলেরই জানা উচিত যে, তিনি কারুর পায়ে নিজকে কি দেশকে অর্ঘ্য দিতে চাইতেন না। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সম্বন্ধে কাল কি রায় দেবে জানি না, কিন্তু তিনি মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন, তাঁর স্বপক্ষে এ ডিক্রী দিতে কালের কলম কখনও কাঁপবে না। দই-সন্দেশের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের নাম দেখে এক কালে দুঃখ হত, কিন্তু এ দুঃখ তার চেয়ে বেশী। দই-সন্দেশে দেহ পুষ্ট হয়, দলাদলিতে মন হয় অসুস্থ।

৩। শ্রদ্ধার অর্থ কি? প্রথমতঃ, সেটা ভক্তি নয়। তাঁর রচনাবলী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি নামজাদা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর গান যখন রেডিওতে গাওয়া হয়, তখন নিশ্চয়ই তিনি গান লিখতে জানতেন। তাঁর স্মৃতিসভায় যখন ভিড় জমে, তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজী-জওহরলাল থেকে বহু ইংরেজের ধারণা যখন উঁচু, তখন নিশ্চয়ই তাঁকে অবহেলা করা যায় না। অতএব ভক্তিভরে তিনি অমুক তিনি তমুক ছিলেন বলার মধ্যে মানুষের পুনরাবৃত্তির ও কালক্ষেপের প্রবৃত্তি ছাড়া আর কি জাহির হয় বুঝি না। পুনরাবৃত্তিরও প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য ; সময় কাটাবার দরকার আছে মানি, সদ্‌ব্যবহার থেকে অব্যাহতির জন্য ; কিন্তু দশ হাজার লোকের সামনে তাঁর উদ্দেশে হৃদয় বিগলিত করা এক রকম মানসিক রোগ। শ্রদ্ধা সুস্থ মনের কাজ,

পবিত্র মনের ব্যবহার। শ্রদ্ধা অর্থে বিনয়। বিষয়বস্তুকে যখন নিজের সম্পত্তি ভাবা যায় তখন ওঠে ভক্তি, আর যখন তাকে ব্যক্তি-সম্পর্ক-রহিত হিসাবে দেখা হয়, তখনই জন্মায় শ্রদ্ধার সূচনা। আত্ম-নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে বহু সাধনার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ও আর্টিস্ট সশ্রদ্ধভাবে বিষয়বস্তুর সাধনা করেন। বৈজ্ঞানিক যখন পরমাণু কি জীবাণুর রূপ দেখেন তখন তিনি হৃদয়াবেগ সংযত করেন; চিত্রকর ও কবি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখে কিংবা কল্পনা করে পাগল হন না। তাঁরা গঠনকে, কল্পিত রূপকে পৃথকভাবে জানতে চান প্রথমে এবং জানবার পর গঠন ও রূপের নিয়মানুসারে তাদের ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তির কি রূপ, কি গঠন, কি নিয়ম ছিল জানাটাই শ্রদ্ধা এবং সেই জ্ঞানের প্রকাশই জন্মতিথি উপলক্ষে সভাসমিতির উপযোগী বক্তৃতা।

২। উপযোগী শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উপায় আছে এবং সে ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা করেছিলেন। 'মুক্তধারা'র অভিনয় দেখলাম। রবীন্দ্রনাট্য শান্তিনিকেতন ছাড়া অন্যত্র অভিনীত হতে দেখলেই মনে হয় বাড়িতে বসে পড়লে বেশী মজা পেতাম। এটা রবীন্দ্রনাট্যের দোষ নয়, কারণ সেক্সপীয়রের নাটক সম্বন্ধেও অনেকে এই ধরনের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাট্যে নাটকত্ব অবশ্য আছে; এবং সেটা রঙ্গমঞ্চে ফোটানোও যায়। তবে সেটা ভাবাশ্রয়ী বলে, অর্থাৎ নাটকের স্থায়িভাবের সূক্ষ্মতার দরুন ও তার প্রকাশে নিতান্ত সুচারু স্পর্শালুতার প্রয়োজন থাকার জন্যই, অভিনয় সাধারণতঃ অসার্থক হয়। যদি চরিত্রের সংঘাত বেশী থাকতো, তবে ব্যাপারটা সহজ হত। এ ক্ষেত্রে অভিনেতারা কবিতার যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তবু অভিনয়টি জমেনি, বোধ হয় রিহার্সেলের অভাবে। মোটামুটি, নাটকত্ব অটুটই ছিল। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অভিনেতাদের মধ্যে পার্ট সামান্য অদলবদল করলে পরের অভিনয় নিশ্চয়ই আরো জমবে। অবশ্য দর্শকবৃন্দ সাহায্য না করলে কিছুই হবে না। বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নাট্যগৃহে অভদ্রতা করবার সহজাত প্রবৃত্তি কবে কমবে

জানি না। তাঁরা হয়তো বলবেন, স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা কমালেই সুযোগ মিলবে। কোন্‌টা ঠিক জানি না; কিন্তু এ কথা জানি, অন্ততঃ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে কচি বাচ্চার চিল-চেঁচানি ও সোডা-লেমনেড বিক্রির কর্কশ চীৎকার অচল। আবৃত্তি যা শুনলাম, সে সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখতে চাই না। আবৃত্তির জন্য ছন্দজ্ঞান থাকা চাই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিংবা শিশির ভাদুড়ীর, যে কোনো ভঙ্গীই হোক না কেন, উচ্চারণ স্পষ্ট অর্থাৎ একটু গঙ্গার ধারের, মাত্রাবোধ, লয়জ্ঞান, বিরামবোধ, এগুলি নিতান্ত প্রাথমিক। কই, তার কোনো সাক্ষাৎ পেলাম না তো! অথচ বাঙ্গালী মাত্রেই কবি শুনেছি। অবশ্য একজন আবৃত্তিকার ছাড়া, কিন্তু সে ছিল সাহিত্যের রসজ্ঞ। গান সম্বন্ধে লিখতে গেলেই মন্তব্য কটু হবে, তাই একটু সামলে লিখছি। ত্রিশ-চল্লিশ জন যুবক-যুবতী একটি পুরানো উৎকৃষ্ট গান গাইলে। সঙ্গে পাখোয়াজ বাজল; তাল ছিল সুরফাক্তা। তানপুরো ছিল একটা, জোর দু'টো। তবু আমি চতুর্থ সারিতে বসেও গানটা শুনতে পাইনি। একে গান-গাওয়া বলে না। বাসরঘরে নতুন বৌ ও শালীর দলও এর চেয়ে জোরে গায়। শিক্ষার দোষ দিতে মন চায় না, কারণ সমস্যাটি সঙ্গীত সম্পর্কিত নয়, অর্থনৈতিক! দুধের দাম কমলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে যাব মনস্থ করেছি। দু'টি যুবকের রসাল গান শুনলাম। তাঁদের বেশের পারিপাট্য দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা কোন্ গান দু'টি গাইলেন বুঝতে পারলাম না। কথার উচ্চারণ এতই অস্পষ্ট যে পাশের শ্রোতাকে প্রশ্ন করতে হল, "রবীন্দ্রনাথ লুকিয়ে-চুরিয়ে উড়িয়া কি আসামী ভাষায় কবিতা লিখতেন না কি?" আরেকটি জিনিসের উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। জানি আজকালকার যুবক-যুবতীদের প্রবেশিকায় অনেক কিছু বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, নোট মুখস্থ করতে হয় ও সেই সঙ্গে পুস্তিকার মারফত ল্যাস্‌কী-লেনিনের মতবাদ পড়তে হয়। তাতে নিশ্চয় স্মৃতির শক্তির উপর টান পড়ে, যার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাই বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে এসে দশ-বারো

লাইনের গানটাও যদি মনে না থাকে ও সেজন্যে চোখের সামনে গানের কথা যদি ধরে থাকতে হয় তবে বলতে হবে—এই সব ছেলে-মেয়েদের গান গাওয়া কেন? লেখাপড়াও বন্ধ করা উচিত। এটাও কি মাছের দামের দরুন।

একটি মাত্র মেয়ের গান ভালো লাগল। সুচিত্রা মুখার্জি চারখানা গান গেয়েছিল, তার মধ্যে একটি, 'সার্থক জনম আমার' সত্যই ভালো হয়েছিল। মেয়েটির গলায় জোর আছে, টপ্পার দানা আছে, আর ভাবও আছে, এবং প্রত্যেকটারই সংযত ব্যবহার করতে সে জানে। শুনলাম মেয়েটি কমিউনিস্ট। কমিউনিজ্‌মে দেশে সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছে কি না জানি না, তবে ঐ মেয়েটির গলার কোনো ক্ষতি হয়নি। বছর পাঁচেক প্রাণপণে ভালো লোকের কাছে শিখলে এ-মেয়ে রীতিমত গায়িকা হবে, যদি ইতিমধ্যে গৃহিণী না হয়। কিন্তু গোখরোর সলুই এ-দেশে ঢোঁড়া-ঢ্যামনা হয়ে যায়। কথাটা আমার নয়, রবীন্দ্রনাথের।

আদত কথা এই: রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না। জন্মতিথি উপলক্ষে এই মাতামাতির মধ্যে কোথাও একটা মনের জুয়াচুরি আছে, নচেৎ অনুষ্ঠানে অতটা ফাঁকি থাকতো না। একবার সুরেশ সমাজপতি আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের রবি ঠাকুর আর কি চান বলতে পার? মাথা বিকিয়ে দিয়েছি ওঁর পায়ে, তবু আশা মেটে না!" এখন দেখছি রবীন্দ্রনাথ সমাজপতির চেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মাথার কেনা-বেচা চাননি, যার মাথা তার কাঁধেই থাক চেয়েছিলেন। হৃদয় থাকলে মাথা থাকতে নেই?

এখন আমাদের কর্তব্য কি? কর্তব্যটা হল ভক্তিকে শ্রদ্ধায় পরিণত করা। জনসাধারণের মনোভাব যা লক্ষ্য করলাম, তাতে কর্তব্যসাধন সহজ হবে না মনে হয়। আমাদের মন এখন ফাঁকা এবং কাব্যালোচনা দিয়ে সে বিশাল ফাঁক ভরানো যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতেই হবে। ইতিমধ্যে যেটা সম্ভব তাই লিখছি। রবীন্দ্র-সৃষ্টির যথার্থ বিচারই হল, আমার মতে, একমাত্র সাম্প্রতিক বিধান।

আমাদের দেশে একাধিক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন বিশ্ব-ভারতী, সাহিত্য-পরিষৎ, রবীন্দ্র-চক্র প্রভৃতি। তা ছাড়া, মাসিক-পত্রিকাও বেরুচ্ছে বিস্তর। অধ্যাপকের দলও কম নয়। এখন যদি রবীন্দ্র-সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ অঙ্গবিচারের ভার বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা যায়, তবে বিচারের সুবিধা ঘটে। ন্যস্ত কাঁরা করবেন, কাজ কতটা এগুচ্ছে কাঁরা দেখবেন, কাজের বিচারকর্তা কাঁরা হবেন, এ প্রকার সমস্যা প্রাথমিক নয়। 'বিশ্বভারতী'তে কিছু কাজ চলছে দেখছি। কিন্তু কোথাও যেন প্ল্যানের অভাব আছে। একটা প্রমাণ না দিয়ে থাকতে পারছি না। ধরুন, যদি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি ছিল জানতে চাই, কি লিখতে চাই, তবে আমাকে তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলী তন্নতন্ন করে খুঁজতে হবে। মহাত্মাজীর রচনাবলী গুজরাটে এমনভাবে সম্পাদিত হচ্ছে যে যৌন-সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর মতামত একটা ছোট, পৃথক বইএ পাওয়া সম্ভব। প্রচারের দিক থেকে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা ভালো নয়। অথচ প্রচারের প্রয়োজন আছে, অন্ততঃ বিচারের জন্য। বড় বড় কাগজের সম্পাদকরাও প্ল্যান করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারে সাহায্য করতে সহজেই পারেন। অধ্যাপকবৃন্দের কাছে বিশেষ প্রত্যাশা করি না। সাহিত্যের ডিগ্রী সাহিত্য-বিচারে অন্তরায়। তা ছাড়া, অধ্যাপকরা বড়ই ব্যক্তিতান্ত্রিক ; বিশেষতঃ এই দেশে যেখানে সকলে মিলে রিসার্চ করার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডারে টাকা উঠছে, যদিও নিতান্ত মন্থর গতিতে। যদি কোনো কালে পঁচিশ লাখ টাকা ওঠে, তবে যেন অন্ততঃ দশ লাখ টাকা রিসার্চ ও প্রচারের জন্য রাখা হয়। আপাততঃ যে প্রতিষ্ঠান, যে ব্যক্তি যতটা পারে ততটা বিচার করুক।

॥ মাসিক বসুমতী ॥ ॥ ১৩৫৬ ।

কবির নির্দেশ

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর জন্মতিথি উৎসবের বিপক্ষে ছিলেন ; কিন্তু আমরা প্রতি বৎসরই উৎসব করছি। স্মৃতিসভাতেও তাঁর মত ছিল না ; তবুও আমরা সভা ডাকি, তাতে যোগদান করি এবং বক্তৃতা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি। আদেশভঙ্গের পাপ আমাদের হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমরা সে পাপ মোচন করি নানা উপায়ে, প্রধানতঃ ভাবের সাহায্যে। বাঙ্গালীর দুর্দশা দেখে যখন মন বিষণ্ণ, পশ্চিমী সভ্যতার দোর্দণ্ড প্রতাপে যখন ভীত, তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়। সেই বলে আমরা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করি ; তাঁর কবিতা, গল্প ও সঙ্গীতের মাধুর্যে বিগলিত হই, উচ্চকণ্ঠে এবং কখনও কখনও অশুদ্ধ বাঙলায়, তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করি। এই প্রকার উচ্ছ্বাস আমি বহুবার পড়েছি ও শুনেছি এবং কতদিন পড়ব আর শুনব, তাও জানি না। তাই আজ আমার মনে হচ্ছে তাঁর আদেশ-ইঙ্গিত মেনে চলাটাই বোধ হয় ভালো ছিল।

অবশ্য অনেকেই বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ জাতি বলেছেন। সংস্কৃতির দিক থেকে এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল, এবং জাতির চরিত্র বলে কোনোও গুহ্য বস্তু নেই। এও শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা যে-কালে মূলতঃ ভাব-প্রধান, তখন সমালোচনাও সমগোত্রের হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধারণাটিও ভ্রান্ত। অবশ্য তিনি বুদ্ধি-সর্বস্ব ছিলেন না। মানুষের

অযৌক্তিক অংশ ও ব্যবহারকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন অত্যন্ত। তাই বলে যে-ব্যক্তি আজীবন স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠ মূল্যের চর্চা ও সমগ্র সৃজনী শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে এলেন, তাঁকে ভাবপ্রধান বলা মোটেই চলে না। বাঙলা ভাষায় ক্রিয়ালঘিষ্ঠ অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবার প্রয়াসে, হলন্ত শব্দ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রধান যুক্তাক্ষরকে শাসিত ও নিয়মাধীন করবার ও সেই সঙ্গে ভাষাকে মুক্তি দেবার সাধনায়, তাঁকে কিছু কম সংযম করতে হয়নি। সম্ভবতঃ তাতে শাসনের রুক্ষতা কিংবা প্রবীণ প্রথার নিয়মানুবর্তিতা ছিল না, তবু কি তাকে বাধাহীন, অনিয়ন্ত্রিত ভাবসর্বস্বতা বলা যায়? আমার মতে যায় না।

যাঁরা তাঁর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার মতে সায় দেবেন। আর কিছু হোক না হোক, ষাট-সত্তর বৎসর ধরে যিনি ভোর চারটায় শয্যা ত্যাগের পর উপনিষদের মন্ত্র জপ করে এলেন, তাঁর ধর্ম সত্যকারের ধর্ম—ধৃতি, জীবনের প্রতি অঙ্গকে ধারণ করে। এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উচ্ছ্বাসবিহীনই হওয়া উচিত নয় কি? অর্থাৎ, বুদ্ধি-বিচারই রবীন্দ্র-রচনার উপযোগী পদ্ধতি, কারণ রবীন্দ্র-রচনায় ভাবজাত বিপ্লবী পরীক্ষার বহু নিদর্শন থাকলেও তার মর্মকথা ঐতিহ্যের সংযত অগ্রস্থৃতি, যে সম্পর্কে উচ্ছ্বাস, হা-হুতাশ, অতিরঞ্জন, একান্ত অচল, অবান্তর। তা হলে দাঁড়ায় এই, রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভিমান নয়, তিনি কেবলমাত্র সম্মানের পাত্র নন, বর্তমান বাঙ্গালী, ভারতবাসী, এশিয়াবাসী, এমন কি মানবের পরিমাণ, মানদণ্ড।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। বাঙ্গালীর আজ কি অবস্থা বুঝুন। আমি থাকি বাংলার বাইরে, তাই আমাদের অবস্থাটি একটু স্পষ্ট হয়েই দেখা দিচ্ছে আমার চোখে। বাঙ্গালীর গর্ব ছিল সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা এবং কল্পনার আশীর্বাদ, যে জন্য তার ন্যায়, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ধন্য হয়েছিল। দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে একটি সত্য কথা বলার। আজ বাংলার তার নিজের ক্ষেত্রেই কোনোও স্থান নেই, না আছে সাহিত্য, না আছে সঙ্গীত। বোধ হয় চিত্রকলায় এখনও আছে, তাও ক'জন বাঙ্গালী ছবি কেনেন বা বোঝেন?

অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই। আজ যদি একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে পশ্চিম বাংলা ধ্বংস পায়, তবে এ দেশে ঐ রিলিফ-কেন্দ্র খোলা ছাড়া আর কিছু হবে না—সংস্কৃতির ক্ষতি হল বলে কেউ সত্যিকারের এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। হয়তো মন্তব্যটি রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু নাচার। এর কারণ কি? অনেকে বলেন, কারণ পলিটিক্স, পলিটিক্যাল হিংসা। জানি না কতটা সত্য। অন্য প্রদেশ জেগেছে, অতএব বাংলার একাধিপত্য তো যাবেই। হিংসা অবশ্য কিছু আছে; কিন্তু কিছু থাকলেই তো লোকের চোখ টাটায়। কিন্তু হিংসার কিছুই যে নেই আজ, কিংবা যা আছে তা যৎসামান্য, যেটা দু'দিন পরে লোপ পাবে। অবস্থাটি অত্যন্ত শোচনীয় নিশ্চয়ই। সেজন্য কি অভিমান-ভরে বসে থাকব, না হা-হুতাশ করব, না অন্য প্রাদেশিক সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করব? আমার মতে সদুপায় রবীন্দ্রনাথের রচনাতে আছে। অর্থাৎ, বাঙ্গালীকে বাঁচতে হলে রবীন্দ্রনাথের পথে চলাই ভালো। বলা বাহুল্য, এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষেরও ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করা যায়, বিশ্বজনেরও। সর্বত্রই আজ দুর্দশা। বিশ্বের কথা আজ তুলব না, দেশের কথাই বলব।

রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট দু' একটি পথের উল্লেখ করব আজ। প্রথমেই মনে ওঠে স্বাবলম্বন। কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, ভাষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, সাজসজ্জা, গ্রহের উপকরণ, জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তিনি আপন-আপন চেষ্টাকেই নবজাগরণের মূলমন্ত্র বলেছেন। রাজনীতিতে তখন ভিক্ষাবৃত্তি চলছিল, তিনি সে-বৃত্তিকে ত্যাগ করতে বললেন এবং এই কারণেই, তাঁর সঙ্গে বালগঙ্গাধর তিলক এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ উগ্রপন্থীদের হৃদয়ের মিল হয়। তখনকার সরকার রবীন্দ্রনাথকে 'এক্সট্রিমিস্ট' ভাবতেন এবং তাঁর পিছনে গুপ্তচর রাখতেন। কিন্তু এই আত্মসন্ধান, আত্মসাধনা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নামান্তর ছিল না। সমবেত সামাজিক প্রয়াসই তাঁর উপায় ছিল। সমাজ অর্থে তিনি হিন্দু-মুসলমান বুঝতেন না। প্রথমতঃ গ্রামের সমাজই তাঁর মতে স্ব-অধীনতার কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু গ্রাম তখন দারিদ্র্যে

ও রোগে মুমূর্ষু। তাঁর বিধান হল, সমবায় এবং কুটিরশিল্প। তাঁর কল্পিত সমবায় কেবল 'ক্রেডিট সোসাইটি' নয়, একত্রে কনজ্যুমার্স ও প্রোডিউসার্স সোসাইটি। অধিকন্তু গ্রাম্য সমবায়ের হাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এমন কি আমোদ-প্রমোদেরও ভার থাকবে। আজকাল এই সর্বাঙ্গ-সমবায়কে 'Multi-purpose Society' বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, "একে আমি চিনি। কিন্তু purpose-ই বা কেন, multi-ই বা কেন? Purpose তো জীবনেরই অভিব্যক্তি এবং জীবন তো সমগ্র, বহুর সমষ্টি নয়। অতএব এগিয়ে চল, কেবল ব্যাপারটা যান্ত্রিক করে তুলো না।" রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ উন্নতিকেই জাতীয় উন্নতির চরম অভিব্যক্তি ভাবতেন না। অবশ্য গ্রাম ছিল ভিত্তি, মূল, শিকড়। কিন্তু গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে তাঁর কোনোও প্রকার অন্ধ মোহ ছিল না। গ্রামের কূপমণ্ডুকতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, নচেৎ ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে বিশ্বভারতীতে পরিণত করতেন না।

আজ আমাদের জীবনে একটি ভীষণ শূন্যতা এসেছে। সেটা আমরা ভরে দিচ্ছি অনিশ্চিত ব্যর্থতা-বোধে। কোনো দেশে স্বাধীনতা পাওয়ার পর এত অল্পদিনের মধ্যে অমনতর ঘটনা ঘটেনি। শূন্যতা এসেছে নানা কারণে। প্রধান কারণ আমার মতে এই: আমাদের নিজেদের ভিত্তি নিতান্ত কাঁচা, শিথিল। জাতির ভিত্তি সর্বদাই জনসাধারণের সমবেত প্রয়াস। অন্য দেশে যাই হোক, ভারতবর্ষের জনগণ গ্রামবাসী, অর্থাৎ ভারতবাসীর জীবনধারা গ্রাম্য উপকরণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, ভাবধারাও তাই। ইংরেজ-আমলে এই উপকরণগুলি নষ্ট হয়েছে। তাই প্রতিটি মানুষ যূথভ্রষ্ট, একলা, নিরালম্ব। তার অবলম্বন চাই। এতদিন ছিল এক নৈর্ব্যক্তিক শাসন-পদ্ধতি। এখনও শাসন-পদ্ধতি চলছে, তবে সেটা স্বজাতি-চালিত বলে নৈর্ব্যক্তিক থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই সেটি হয় জওহরলাল, না হয় অন্য কোনো ব্যক্তির কার্যকলাপ হতে বাধ্য। অথচ পদ্ধতি না হলে চলে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কর্তব্যের তালিকা বেড়েছে, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র-

পদ্ধতির সঙ্গে তাকে তাল ফেলে চলতে হচ্ছে। আমাদের শাসন-পদ্ধতি হয়ে উঠল রাষ্ট্র। অথচ রাষ্ট্র চালাচ্ছেন আমাদেরই স্বজাতীয় ব্যক্তি-গোষ্ঠী। একধারে গ্রামের অসহায় বুভুক্ষু প্রতিটি মানুষ, অন্যধারে রাষ্ট্র ও তার পরিচালক। তাই এই প্রকাণ্ড শূন্যতা। মধ্যে কিছু নেই। তাই প্রতি নিরালম্ব ব্যক্তি অবলম্বনের ব্যক্তিসম্পর্কহীনতা লক্ষ্য করে হতাশ হয় এবং পরিচালকবৃন্দকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে। এই শূন্যতা আসত না, যদি গ্রাম্য সমবায় আত্মনির্ভরশীল হত, যা রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই কামনা করেছিলেন। অতএব যদি রাষ্ট্রের প্রতি অশ্রদ্ধা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আত্মবিলাস না হয়, যদি আমরা সত্যই দেশের কল্যাণ চাই, তবে রবীন্দ্রনাথের এই মূল কথাটি শোনবার এবং শুনে কাজ করবার সময় এসেছে। এখনও দেশ মরে যায়নি ; তাকে বাঁচানো যায়, সমবেত প্রয়াসের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ কেবল উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে তাঁর জমিদারিতে তিনি অসংখ্য সমবায় সমিতি, স্বাস্থ্য সমিতি, কুটিরশিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের নিজেদেরই উদ্যোগে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নির্দেশ আরো মৌলিক, আরো ব্যাপক, আরো জাতীয় জীবনের ধারণক্ষম। অবাঙ্গালীরা প্রধানতঃ তাঁকে দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তার মহাকবিই ভেবে থাকেন। আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁর স্বদেশী গান, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাকে উচ্চ স্থান দিয়ে থাকি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই ধারণাটি অসম্পূর্ণ। আরেকটি কথা, যাঁরা তাঁর স্বদেশপ্রেমকে তাঁর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ মনে করেন না, তাঁরা তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় মুহ্যমান হন। অবশ্য হবারই কথা। দু' একজন ছাড়া সর্বতোমুখীনতায় তাঁর সমকক্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তবু সেইটাই তাঁর ধর্ম নয়। একই বহু হয়। সেই ঐক্য আমাদের স্বীকার করতে হবে। একই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ-ব্যাখ্যাকার, কবি, চিত্রকর, গল্প-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ-লেখক, এবং কর্মী। একই ব্যক্তি একাধারে দেশপ্রেমিক, দেশসেবক এবং বিশ্ববোধে প্রবুদ্ধ। একই ব্যক্তি বিদেশের ও স্বদেশের গুণগ্রাহী। একই ব্যক্তি সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রবর্তক। একই

ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের বিপক্ষে মাথা তোলেন, আবার দেশবাসীকে কটু-কথা শোনাতে কসুর করেন না।

একই মানুষ—এইটাই প্রধান কথা। অর্থাৎ তাঁর ধর্ম সর্বাঙ্গীণ; যেমন ফুলের, গাছের, ফলের, মানুষের আত্মার। ফুল যখন ফোটে, তখন একটির পর অন্য পাপড়িটি খোলে না। অনেকেই ভোরবেলায় পদ্ম ফোটা দেখেছেন, কমল একই মুহূর্তে বিকশিত হয়। মানুষ যখন ধর্ম-পরিবর্তন করে, তখন আগে বেশভূষা বদলে, তারপর ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন করে, তারপর কল্‌মা পড়ে কিংবা ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী হয় না। একই সঙ্গে সবটা বদলে যায়। তারপর তাকে আর চেনা যায় না। জাতীয় জীবনেও তাই: সেটি অর্গ্যানিকই বলুন আর স্পিরিচ্যুয়ালই বলুন, তার পরিবর্তন সর্বাঙ্গীণ। অর্থাৎ, আগে তো ইংরেজ যাক, তারপর যা হয় দেখা যাবে। তারপর গান, ছবি, অভিনয়, সাহিত্য, চারুশিল্প এবং শিক্ষা—এই পদ্ধতিতে হয়তো ইংরেজ তাড়ানো যায়, কিন্তু তাড়াবার পর আর শ্বাস থাকে না, দম ফুরিয়ে যায়। ফলে আমাদের আজ দম ফুরিয়ে গেছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ফিলজফিতে এই মস্ত গলদ ছিল যে, আমরা উন্নতিকে একটি অবিচ্ছিন্ন সরল রেখায় যাত্রা ভেবেছিলাম এবং সেই মত কার্য করেছিলাম। মনে হয়েছিল, স্বাধীনতা একটা দূরের রেল-স্টেশন, যেখানে পৌঁছতে হলে দু'টি সমান্তরাল লাইনের উপর গাড়িতে চড়ে, একটির পর অন্য একটি স্টেশন পার হতে হবে। অন্য পথে চললেই দুর্ঘটনা ঘটবে। এর মধ্যে পিউরিটান মনোভাব ছিল, কিছু কাজও হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিও হয়েছে ভীষণ। সমগ্রতাবোধ আমরা হারিয়েছি। সংস্কৃতির সংস্কারে আমরা পিছনে পড়ে গেলাম। তাই ছুটতে যাচ্ছে রাষ্ট্র; আর ব্যক্তিগতভাবে আমরা হাঁপিয়ে বসে আছি রাস্তার ধারে।

আজ সংস্কৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের প্রয়াস ও আমাদের প্রয়াসের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। বাংলা দেশের কথাই প্রধানতঃ আমার মনে আসছে। অন্য দেশেও একই পরিস্থিতি। তবে কি না বাংলার গৌরব

ছিল এককালে সংস্কৃতি সম্পর্কে। সে যাই হোক—উপায় কি? উপায় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখীনতার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ সমাজ-মনুষ্যত্বের ঐক্য। পলিটিক্স আর কালচারের খিচুড়িভোগে আমার রুচি নেই। তবে কে অস্বীকার করবে যে, পলিটিক্স আর কালচার দুইই ঐ মানবিক সর্বাঙ্গীণতার বিবিধ রূপমাত্র। এইটাই আমার ধারণায় রবীন্দ্র-জীবনের মূল ধর্ম। তাকে গ্রহণ করবার সময় এসেছে। নচেৎ যা হচ্ছে তাই হতে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের সাহিত্যের সঙ্গীতের চিন্তাধারার মানদণ্ড ভেঙে গেছে, কারণ প্রতিটি পৃথক করে ভাবছি, জীবনের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করারই দরুন। এটা মোটেই স্বাধীন জাতির পক্ষে সম্মানের নয়।

বড় পরিসর ছেড়ে দিয়ে ছোট গণ্ডীতে আসা যাক। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ, আমার কাছে বুনিয়াদী শিক্ষার চেয়েও বেশী মূল্যবান। আমি তাও ছেড়ে দিচ্ছি। আমি মাত্র গবেষণার উল্লেখ করব, তাও একটি বিষয়ে, ইতিহাসে। কেউ কেউ আশ্চর্য হবেন কি না জানি না, তবে একটু মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রবন্ধাদি পড়লে তাঁদেরও আমার মত বিশ্বাস হবে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল এবং সে বক্তব্য মূল্যবান। অধিকন্তু তাঁর নির্দেশ আমাদের ঐতিহাসিকরা (মাত্র একজন ছাড়া) কেউই গ্রহণ করেননি। তাঁরা খুবই ভালো কাজ করেছেন, অনেক পুঁথি-নজীর-ফলক সংগ্রহ করেছেন, তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের সাহায্যে অনেক তথ্য ও যৎসামান্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে তাঁরা ধরে দিয়েছেন। কিন্তু সত্য কথা বলুন তো, আপনারা এই সব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা, কি মূলধারা অবগত হয়েছেন কি? তার সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার কতটা পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়েছে? যৎসামান্য। আজ কোন্ ইতিহাসের পাঠ্য বই খুললে হতাশা ও গ্লানির অবসান হয়? কারণ নিশ্চয়ই ঐতিহাসিকের বিদ্যার অভাব নয়। কারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতির আংশিকতায়। বহু রচনায় বিজ্ঞানের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চিহ্ন আছে; গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়।

কিন্তু পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি 'মেকানিস্টিক্' ছিলেন না। তাই তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস-ব্যাখ্যা অত গভীর ছিল। মাত্র আরণ্য সভ্যতা (forest civilisation) নাম দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। অনেক দিন আগে চৈতন্য লাইব্রেরীতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলে যান, আমাদের ইতিহাসের রূঢ়-সামগ্রী (raw materials) হল জনগণের সংস্কার, আচার-ব্যবহার, পুরাণ, myths প্রভৃতি। ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অনেক বৎসর পূর্বে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার সূচনা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। সূচনাটি উদ্ধৃত হয়েছে অনেক জায়গায়। আমি তাই থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। "…বাঙলার প্রত্যেক জেলা যদি স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাঙলার রাজ-বংশের পুরাতন দপ্তরে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রছন্ন হইয়া আছে, 'ঐতিহাসিক চিত্র' তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই ঐ ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।" এই ধরনের কাজ কিছু হয়েছে ও হচ্ছে নিশ্চয়ই। যে কাজ এখনও হয়নি সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "সমস্ত জনশ্রুতি—লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা, এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কারণ ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।" এই শেষ মন্তব্যটি নিতান্ত মূল্যবান। মানবমন, বিশ্বাস, সত্য-মিথ্যা, তুচ্ছ-মহৎ জনশ্রুতির অর্থ হচ্ছে জনগণের মন, বিশ্বাস, শ্রুতি। অর্থাৎ রবীন্দ্রকল্পিত ইতিহাসের মালমসলা ethnology, কেবল archaeology, কিংবা state-record নয়। শিলালিপি, নজীরপত্র তো কোনো আদান-প্রদানের চরম অবস্থা, বোঝাপড়ার শেষ কথা। বিশ্বাস ও জনশ্রুতি হল চলিষ্ণু পদার্থ, সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত। কোনো এক নায়কের বা একটি শ্রেণীর একচেটিয়া ধন নয়। কেবল তাই নয়, এই সব বিশ্বাস অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং

প্রায় সব মানুষই বুদ্ধির বহির্ভূত অনেক কর্মই করেন। সে-সব বাদ দিয়ে rational ইতিহাস লেখা হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান ও নির্বোধ মানুষ, অর্থাৎ জনগণের ইতিহাস লেখা যায় না। তার চেয়ে আরো বড় কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা আশা করিতেছি, ঐতিহাসিক চিত্র যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা বন্ধ্যা (অর্থাৎ unproductive) হইবে না। কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে। একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাস পূর্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলেই ফলপ্রসূ হবে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে--আমাদের ইতিহাস কৌতূহল পরিতৃপ্তি কেন, দেশাত্ম-পরিতৃপ্তিসাধন নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু সহস্র শস্য লাভ করেছে কি ? এখানেও যে ঘাটতি, তা একই কারণে। পদ্ধতির দোষে, জনগণকে বাদ দেওয়ার ফলে।

আমার বক্তব্য সামান্য ও সহজ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণে কিংবা বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষ্যে উচ্ছ্বাস করার অর্থ, তাঁর যথার্থ নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা। তাঁর নির্দেশ একাধিক ; আমি দু' তিনটির উল্লেখ করলাম। আরো অনেক আছে। এই যুগে, এই চিত্তবিক্ষোভে, এই হতাশায়, এই শূন্যতাবোধে সেই সব নির্দেশগুলি আমাদের সহায়ক হবে নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ কর্মনিষ্ঠার দিক ছিল। আত্ম-নির্ভরতার ওপর বিশ্বাস ছিল প্রগাঢ়, আর ছিল জনগণকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা। এক এক সময় তাই মনে হয়, এই আশ্চর্য সহজ ক্ষমতার জন্যই তাঁর মানসিক সৃষ্টি সুচারুরূপে বিধৃত হতে পেরেছিল।

।। দেশ ।। ।। শারদীয়া ।। ১৩৬২ ।।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি

রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনার প্রারম্ভেই আমার দু'টি গল্প মনে পড়ে। সেবার দার্জিলিঙে চিত্তরঞ্জন ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি ক্যালকাটা রোডে বেড়াতেন, সঙ্গে অনেকে থাকতেন, নানা রকমের গল্প, সলা-পরামর্শ চলত। একদিন আমিও ছিলাম। সেদিন কথা উঠল রবীন্দ্রনাথের একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা নিয়ে। সকলেই প্রশংসা করলেন, চিত্তরঞ্জনেরও ভালো লেগেছিল। খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর চিত্তরঞ্জন বললেন, "কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ কবি।" রাত্রে যখন হোটেলে ফিরলাম ম্যানেজার বাবু এসে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সাহেবের থাকবার কষ্ট হচ্ছে অন্যত্র, আমার ঘরে যদি স্থান হয় তবে খুব সুবিধা হয়। ভূপেনবাবু বহু বৎসর বিদেশবাসের পর সদ্য দেশে ফিরেছেন, মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, যুগান্তরের ভূপেন দত্ত, বিবেকানন্দের ভাই, সানন্দে সম্মতি দিলাম। ভূপেনবাবুর সঙ্গে ভাব শীঘ্রই জমে গেল, রোজই একত্রে ঘুরতাম, খাবার পর গল্প চলত, আমি রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেতাম, তিনি ঘোড়-তোলা জুতো পরে হাঁড়ির মতন পাইপ মুখে পুরে, জার্মান-মিশ্রিত বাঙলা ভাষায় বিশ্বের তত্ত্ব আলোচনা করতেন। মনে পড়ে, এক গভীর রাতে তাঁর বিছানা থেকে একটা শব্দ উত্থিত হল। নিজে বুঝলাম গান এবং তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বাঙলা গান, রবীন্দ্র-

নাথেরই, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া···রী'। গান থামবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "রবিবাবু আর এই ধরনের স্বদেশী গান-টান লেখেন ?" উত্তর দিলাম, "ঝোঁক একটু বদলেছে সন্দেহ হয়। কিন্তু ওটা কি স্বদেশী গান ?" একটু মৃদু হেসে বললেন, "আগে আমিও ভাবতাম, না—কিন্তু, একদিন রাত্রে বার্লিনে—হঠাৎ গানটার noumenonটি প্রকট হল।" খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে গানটিকে phenomenon-এ পরিণত করতে ধরে বসলাম। লম্বা ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার সব কথা মনে নেই, তবে তাৎপর্যটা এই: "তরণী' ধরুন প্রথমে, 'তরণী' হল ship of state—'অমল ধবল পাল' হল গিয়ে আমাদের political consciousness, feudal যুগেরই পাল-তোলা জাহাজ; তবেই, 'মন্দ মধুর হাওয়া,' কি না moderate, liberal movement এই দাঁড়াল; 'দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু'···খুব খাঁটি কথা—কে বুঝবে বলুন যে কার্ল্ মার্ক্স্ না পড়েছে!" আমি বললাম, "কবিতার জন্য কার্ল্ মার্ক্সের প্রয়োজন আছে কি ?" "কে বললে নেই। পলিটিক্যাল কবিতার জন্য কার্ল্ মার্ক্স্ না হলে চলেই না। আপনারা একটা মস্ত ভুল করেন, রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ একজন পলিটিক্যাল জীব, যিনি কবিতার মারফত আমাদেরই কথাগুলি বেশ গুছিয়ে সাবধানে লেখেন। একটু যদি কার্ল্ মার্ক্স্ পড়তেন মনোযোগ দিয়ে তবে রক্ষা ছিল না!" "তা তো হল, কিন্তু 'হাওয়া···রী' বললেন কেন ?" "রী-টা হল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের টান, নববিধানের রে।" সে রাত্রে ভেবেছিলাম, কার কথা সত্য—চিত্তরঞ্জনের, না ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের। এই সেদিন 'আরোগ্য' নামে কবিতার বইটা এল। চিত্তরঞ্জনই ঠিক বলেছিলেন, নচেৎ রোগশয্যাতেও এত ভালো কবিতা বেরোয়! আবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে জন্মতিথি উৎসবে তিনি যে বাণী দিয়েছেন তাও পড়লাম ··· তবে কি ভূপেনবাবুই ঠিক বুঝেছেন! আজ এই সংশয়ের সমাধান করতে চেষ্টা করব। ভেবে দেখলে পলিটিক্স ও কবিতার দ্বন্দ্ব সমাধানের ওপর ভারতের সংস্কৃতি নির্ভর করছে অনেকটা।

দ্বন্দ্ব কিভাবে ওঠে বিশ্লেষণ করা যাক। কবিত্ব যদি জীবন-ছাড়া, সমাজ-ছাড়া একটা পৃথক শক্তি হয়, যদি জীবতাত্ত্বিকের ব্যাখ্যানুসারে সেটা জীবনধারণের পর যতটুকু বাকি থাকে, অর্থাৎ উদ্বৃত্তাংশের খেলা হয়, তবে এই শক্তির প্রকাশের জন্য জীবনীশক্তির মূলধনে টান পড়ে —এবং তখনই ভাগাভাগির কথা ওঠে। তার ওপর যদি জীবনটাকে স্রোতের জল না ভেবে কলসীর জল ভাবি, তখন সঞ্চয়ই হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান লক্ষ্য, কৃপণের মতন তাকে বজায় রাখতে চেষ্টা করি। আমি জানি এই ধরনের মতামত অনেকেই পোষণ করেন। কারণ সোজা; পাটিগণিতটাই সোজা মানুষের পক্ষে, তার ওপর আমরা দায়ভাগের বাঙ্গালী। আবার যদি রাজনীতি অর্থে দলাদলি, পার্টি চালানো হয়, যদি বিরুদ্ধাচারণটাই রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারের প্রথম ও শেষ কথা হয়, তবে কাজটা যে-কোনো কবির পক্ষে শক্ত। কিন্তু রাজনীতির এই অর্থটাও সোজা, কারণ আমরা বহুকাল ধরে পরাধীন, কারণ আমরা সমাজে শাসিতই হয়ে এসেছি, কারণ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসটা অন্তর্শক্তির স্ফুরণ নয়, শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচরণ; কারণ আমাদের মনে ইংরাজী বুক্‌নি, পলিটিক্যাল চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের ছাপ পড়েছে, কারণ আমরা, বাঙ্গালীরা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে কোন্দলই করি। ব্যাপারটা এই, আমাদের মানসিক ও কর্ম-পদ্ধতির মূল যুক্তিটা হল—হয় এটা, না হয় একেবারেই এটা নয়, অর্থাৎ যান্ত্রিক বনাম-মূলক। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের জন্মস্থানে এই বনাম-কীর্তন একটু অদ্ভুত লাগে। প্রকৃত পক্ষে এটা অদ্ভুত নয়—কারণ, মনে মনে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন, আর আমরা, যাঁরা তিনি কবি না পলিটিশিয়ান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করি, এখনও তাতে অভিভূত আছি। এইগুলো হল কালচার ও পলিটিক্‌সের মধ্যেকার বিরোধের হেতু। অপর পক্ষে, কবিও মানুষ, মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীব; তার স্ফুরণের জন্য চলিষ্ণু সমাজ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের আবশ্যক—অন্যদিকে, স্বাধীন মানুষই শক্তি থাকলে কবি হতে

পারে, কবিতা উপভোগ করতে পারে—এই প্রকার অর্গ্যানিক ধারণা সত্যই কঠিন এবং ইংরেজ-দ্রোহিতার চিহ্ন একপ্রকারের। কিন্তু ধারণাটি সত্য, সাধারণভাবে, অতএব রবীন্দ্রনাথের মতামতের বিচারেও। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, রবীন্দ্র-কল্পিত ও আচরিত কবির ধর্ম ঐ প্রকারের আদিম প্রতিজ্ঞারই উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের মোদ্দা কথা হল এই যে, পরাধীন দেশে ও আবদ্ধ সমাজে জনগণের অন্তর্নিহিত সৃষ্টির চরম বিকাশ, অর্থাৎ কাব্য-রচনা, এমন কি কাব্যোপভোগও একপ্রকার অসম্ভব। আপনারা যদি বলেন যে, তিনি এমন কথা কোথাও খোলাখুলি লেখেননি, তবে আমি উত্তর দেব যে, তিনি রাজনীতির পাঠ্য-পুস্তক লেখেননি নিশ্চয়, কিন্তু তিনি ঠিক এই কথাই তাঁর প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যাপারটা বিশদ করে বলছি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি বিদেশী ধরতাই বুলিগুলো মন থেকে প্রথমেই তাড়িয়ে দিন। যত ভুলের মূল ঐখানে, বনাম-যুক্তিরও একটা গলদ ঐ। ইংলণ্ডে ব্যক্তিত্ববাদ জন্মায় একটি আবহাওয়ায়—নিউটনী মেকানিক্‌সের, এবং দু'টি প্রয়োজনের সংযোগে। বেনথাম, যিনি ব্যক্তিত্ববাদের জন্মদাতা—তাঁর লেখা পড়ে দেখলেই মনে হয় যেন তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে নিউটনের তিনটি নিয়মের প্রয়োগ করতেই ব্যগ্র। এধারে, ইংরেজ রাজা পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা না যায় দেখতে গিয়ে নিজের একটা দল খাড়া করলেন—নাম তার কিংস্ পার্টি। পার্লামেন্ট সেই দল ভাঙতে চেষ্টা করল, অবশ্য রক্তকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না করে। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, অথচ আইন-কানুনের বাধায় মুনাফায় টান পড়ছে। এরা ধীরে ধীরে পার্লামেন্টের সভ্য হয়ে চেয়ে বসল বাধাগুলো তুলে দেওয়া হোক। অতএব দ্বন্দ্ব বাধল স্পষ্ট দু'টি দলে; একধারে রাজার দল ও যারা ডিউটি বসিয়ে তহবিল ভরতে ও জমিদারী স্বার্থ বজায় রাখতে চায়, এবং অন্যধারে পার্লামেন্টের নতুন ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সভ্য যারা বললে—অবাধ বাণিজ্যে ইংরেজ আরো ধনী হবে। এই হল ইংরেজ পলিটিক্‌সের

'বনামে'র প্রথম দফা। শুধু এইখানে ক্ষান্ত হল না ব্যাপারটা। বণিকেরা সেই সঙ্গে উপনিবেশের ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের বাজার অধিকার করে যাচ্ছিল। সেই বাজারকে বশে আনবার স্বাধীনতাকে তখন ব্যক্তিত্ববাদ বলা হল না—তখন বড় বেশী কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু, ক্রমে ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, জাপান বাজারে নেমে পড়ল, তখন তাদের ব্যক্তিত্ববাদ ইংরেজের অনুকরণে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার স্বার্থের বিপক্ষে। মুনাফাবৃদ্ধির অবাধ স্বাধীনতাই হল ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্ববাদের প্রাথমিক প্রয়োজন। এরই নাম ইংরেজী লিবারেলিজ্‌ম্।

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ও তাঁর যুবা বয়সে যে আন্দোলন চলছিল সেটা হল নকল লিবারেলিজ্‌ম্। বই পড়ে যে মতবাদ জন্মায় কিংবা যে আন্দোলন চালানো সম্ভব তার দাম কম। অনেকে বলেন যে আমরা সে সময় অনেক কিছু পড়ে ফেলি—বার্ক, মিল, বেনথাম, কোঁৎ, যাঁদের চিন্তাধারার প্রসার কেরানী তৈরী করার জন্য নিয়মমাত্র শিক্ষার বহির্ভূত ছিল। এক কথায় এঁদের মতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছিল। আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। জমি তৈরী থাকলেই গাছপালা সতেজ হয়, নচেৎ কাচের ঘরের ফুলের চারা দেখতে মজার, কিন্তু উপকারে লাগে না। বাস্তবিকই আমাদের ঐ সময়কার আন্দোলন একটু অবাস্তবই ছিল। কি করে বাস্তব হবে! ভারতবর্ষে কিংস্ পার্টি কোথায়! অবশ্য, এক হিসাবে লাট সাহেব থেকে ভিখিরীদেরই খাতির হয়। কিন্তু এইখানে দু'টি জিনিস স্মরণ রাখা উচিত। ১৯০৫ সালের পর থেকে দেশে যে extremism শুরু হয়, তার এক মুখ ছিল ধ্বংসের দিকে, অন্য মুখ ছিল গোঁড়ামির দিকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদ কোনোটাই তাঁর সমাজ-ধর্মের অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেন আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে, 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত বিস্তর রচনায় তার প্রমাণ পাবেন। যেটার প্রমাণ সহজে মিলবে না সেটা তাঁর কর্মের। কিন্তু যাঁরা তাঁর কর্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই

স্বীকার করবেন যে, শান্তিনিকিতনে বসবাস, জমিদারিতে সমবায়-সমিতি, পাঠশালা-হাসপাতাল খোলা, পুকুর কাটানো, গাছ বসানো, পল্লীসংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য, National Council of Education-এ যোগদান—তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল। সেটি হল এই—ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায়, জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয়, মিথ্যা ভান ত্যাগ করে কর্মীরা যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশকে জানতেন, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো মোহ ছিল না, যেমন শরৎচন্দ্রেরও ছিল না। কিন্তু তিনি কখনও হতাশ হননি। তা ছাড়া কি জানি কেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে বরাবরই বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন যে, এই ভূখণ্ডে নানা জাত এসে বসবাস করেছে, মিলেজুলে একটা সভ্যতাও খাড়া করেছে, তার ভালো খানিকটা, মন্দ খানিকটা, ফলে সেইসঙ্গে সে সভ্যতার একটা বিশেষ রূপও ফুটেছে, যে-রূপ গ্রামের সমবেত জীবনে, জীবনের ত্যাগে ও আধ্যাত্মবোধের প্রাধান্যে ধরা পড়ে। আজ সে-রূপ নেই অবশ্য, কিন্তু নতুন জীবন এলে সে-রূপে জলুস খুলবে। রবীন্দ্রনাথ সে প্রক্রিয়ার মানসিক সাধনারও ইঙ্গিত দিয়েছেন—বিজ্ঞান ও চিত্তশুদ্ধি। চরকা চালানো ছাড়া প্রক্রিয়ার অধুনা প্রচারের অন্য সব অঙ্গেরই নির্দেশ আছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ও কর্মে। তাই আবার বলি, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব ইংরেজের পলিটিক্যাল ফিলজফির কোটরে ঢোকে না। সেখানে রাষ্ট্র আছে, তাই স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক ··· অধিকারসর্বস্ব নয়, ত্যাগ-ধর্মী। এই হিসাবে তিনি বহু স্বদেশী নেতার চেয়ে স্বদেশী—কারণ আমাদের সমাজটাই ঐ ধরনের—অতএব, তিনি ঢের বেশী রিয়ালিস্টিক। লোকে তাঁকে যখন আদর্শবাদী বলে তখন তারা আইডিয়ালিস্ট কথাটির অনুবাদই করে, তার সম্বন্ধে সত্য ধারণার প্রমাণ দেয় না।

কিন্তু ভারতবর্ষে সামাজিকতার প্রাধান্য থাকলে কি হয়। ভাগ্য-চক্রের ঘোরে সে এসে পড়ল এমন একটা প্রাঙ্গণে যেখানে ন্যাশনালিজ্‌মের নামে রাষ্ট্রদৈত্যের পূজা অহরহ চলছে। আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথের *Nationalism* নামে বইখানি আবার পড়তে অনুরোধ করছি। ফ্যাসিজ্‌মের জন্ম-তারিখের বহু পূর্বে লেখা। আজকাল যাকে totalitarianism বলা হয়, তারই পূর্বাভাষ, statism-এরই বিপক্ষে প্রতিবাদ এই বইখানিতে পাবেন। অবশ্য ইকনমিক ব্যাখ্যা নেই তাতে, কিন্তু তাতে প্রতিবাদের তীব্রতা কমেনি তিল মাত্র। বইখানি বেশী জনপ্রিয় হয়নি, দেশোয়ালীরা ভাবলে তিনি দেশদ্রোহিতা করেছেন, এবং বিদেশীরা ভেতরে ভেতরে ভীষণ চটে বাইরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, স্বপ্নবিলাস। এখন তাঁরা বুঝছেন স্বপ্নবিলাস কি আর কিছু। সে যাই হোক—রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ দেশে রাষ্ট্র-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে মাথা তোলেন, এটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। এই সেদিনও যে সাম্রাজ্যবাদের কুফল দেখালেন তারও সংযোগ ঐ statism-এর সম্বন্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোড়ায় রয়েছে ঐ রাষ্ট্রবাদ—সেটি কোনো একটি বিশেষ জাতির একচেটে সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্রবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ তাঁর মতে একই বস্তু, অর্থাৎ লোভের এ-পিঠ ও-পিঠ। আত্মসম্মানবোধে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়।

এই লোভের প্রকৃতি কি ? উত্তরে ভাষা রুচিসাপেক্ষ। মানুষের দিক থেকে প্রকৃতিটা মানসিক, মানুষ বাদ দিলে প্রকৃতিটা ইকনমিক। মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে যার কারবার, সে বলবে লোভের জন্যই যত অত্যাচার। যে আবার ইতিহাসের রীতিনীতি খুঁজতে ও কাজে লাগাতে ব্যগ্র, তার মতে অত্যাচার ধনোৎপাদন ও তার নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত, অতএব মানুষের দোষ কই যখন মানুষের প্রবৃত্তি ঐ সব পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানেরই প্রতিবিম্ব। প্রথম দল অত্যাচারের নিঃশেষ করবার জন্য আত্মশক্তি, চিত্ত-শুদ্ধির ওপর জোর দেন, দ্বিতীয় দল বলেন—নির্যাতিত শ্রেণীকে

বিপ্লবী করে তোলা। কনেস্টবল পর্যন্ত সকলেই ঐ দলের সভ্য। কিন্তু পার্থক্য আছে।

ভারতবর্ষে বিলেতী ধরনের state-ও নেই, গভর্নমেণ্টও নেই, আছে administration- -যেটা একদল প্রবল পরাক্রম আমলাদলের হাতে—তাঁরা যা হুকুম দেবেন তাই হল গভর্নমেণ্ট। রাজা বলতে তখন লোকে কি বুঝত আপনারা অনেকে ধারণাই করতে পারবেন না। আমার একটুখানি মনে আছে। রানী ভিক্টোরিয়ার ছেলের পায়ের তলায় একজন বিশিষ্ট সদ্‌ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়েন, আর একজন মস্ত নেতা এক রাজপুত্রের কাছে ভারতবর্ষের প্রতি করুণা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হাঁটু গেড়ে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা জানান। অতএব crown-এর বিপক্ষে কোনো আপত্তিই উঠেনি ভারতবর্ষে, কোনো কারণেই। বরঞ্চ আমরা বলতাম যে, মহারানীর প্রোক্লেমেশন মানা হচ্ছে না বলেই যা কিছু গোলমাল। সেইজন্য আন্দোলনটা চলল, বুরোক্রাসীরই বিপক্ষে। আমরা চাইলাম তাঁদেরই দলভুক্ত হতে, যেমন প্লিবীয়ানরা প্যাট্রিশিয়ান হতে গিয়েছিল। অন্যধারে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর তখনও অভ্যুদয় হয়নি যে, অবাধ বাণিজ্য চেয়ে বসবে, কিংবা জাপান, জার্মানী, আমেরিকার মতনও স্বদেশী ব্যবসা বাঁচাবার অজুহাতে প্রোটেক্‌শন নিয়ে সোরগোলটা জমাবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য দেশে, যেখানে বাণিজ্যে পিছিয়ে ছিল, প্রোটেক্‌-শনের মারফত লিবারেলিজ্‌ম্‌ আত্মপ্রকাশ করে। তাই ইংরেজী লিবারেলিজ্‌ম্‌ আর কন্‌টিনেণ্টাল লিবারেলিজ্‌ম্‌ এতই পৃথক। কন্‌টিনেণ্টে উদার মতের পরিণতি রাষ্ট্রে আত্মবিসর্জন, কারণ, রাষ্ট্র ভিন্ন কে দেশী ব্যবসা বাঁচাবে? ভারতবর্ষের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, কারণ ইংরেজ ব্যবসা আর দেশী ব্যবসা অহি-নকুল। এই পরিস্থিতিতে আমাদের লিবারেলিজ্‌ম্‌ যে ঝুটো হবে সে আর বিচিত্র কি! অতএব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এ-দেশে কোনো ঐতিহাসিক কারণ নেই, অর্থ নেই। থাকত, যদি সম্রাজ্যবাদের কূটনীতি আমরা বুঝতাম। ঐ যুগে বুঝতে পারার সুবিধাও ছিল না অবশ্য। কিন্তু যেসব মহারথীদের

নাম নিয়ে আজ আমরা গর্ব অনুভব করি, তাঁরা কি সত্যই এমন বড় ছিলেন না যে তাঁদের কাছ থেকে ও-টুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায়। সে যাই হোক—পূর্বোক্ত কারণে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে দু'টি মারাত্মক দুর্বলতা এসেছিল—ভিক্ষাবৃত্তি ও আবেদন-নিবেদনের পালা এবং সর্বসাধারণের জীবন থেকে বিচ্যুতি, পলায়নও বলতে পারেন।

রাজনীতির তো ঐ দশা। সমাজ সংস্কারও যে পাকা ভিতের ওপর ছিল তাও বলতে পারি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় অন্ন সমস্যার নিরাকরণে এমন কোনো বিপ্লব বাধেনি যার জোরে সমাজের বনেদ ভেঙে যায়। নতুন জমিদার তৈরী হয়েছে, তাঁরা নিয়মমতো রাজস্ব দিয়ে যাচ্ছেন, প্রজারা যা হয় করে দিন গুজরান করছে—নতুন ফ্যাক্টরী এত বেশী সংখ্যায় খোলা হয়নি যে তাদের আকর্ষণে গ্রামের লোক হুড়মুড় করে শহুরে হয়। অর্থাৎ, যা ছিল তাই চলছিল, কিন্তু সামান্য একটু গোল বাধল ঐ নতুন শহুরে ভদ্র-লোকদের জন্য। তাঁরা সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হলেন, আইডিয়ার তাড়নায়। ইতিমধ্যে ভিক্ষার ঝুলি খালিই রইল, জনকয়েক ঝুলি ঝেড়ে দেখলেন এক কুটো চালও পড়েনি। বিরক্তিটা স্বাভাবিক—তাই বিরক্তির মুখ ঘুরল প্রাচীন ভারতের দিকে—যখন ইংরেজ আসেনি। সেটা হল স্বর্ণযুগ ; আমরা হলাম আর্য ; আমাদের দর্শন পরিশীলন শ্রেষ্ঠ ··· ইত্যাদি। শিক্ষিত সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হলেন, তাঁদের চেঁচামেচির নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক চিন্তা। বলা বাহুল্য এটাও অবাস্তব—রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মতন। তবে এর কুফল বেশী—কারণ, জনসাধারণকে বাদ দিয়ে, তাদের তাগিদকে ব্যবহার না করে, সমাজ সংস্কার করতে যাওয়ার অর্থই হল জীবনকে প্রত্যাখ্যান।

এখন রবীন্দ্রনাথ ও-সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেই দু'টি কথা বল্লেন—ভিক্ষাবৃত্তি ছাড় এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হও। অবশ্য যে-সে সমাজ নয়, স্বদেশী সমাজ, পল্লীসমাজ; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শাসিত সমাজ নয়,

সকল সৃষ্টির বীজক্ষেত্র সমাজ। ভিক্ষাবৃত্তির উপর তাঁর কষাঘাত এতই তীব্র যে তার জ্বলুনি কেবল মডারেটদের গায়েই ধরেনি, সরকার বাহাদুরেরও সর্বাঙ্গে লেগেছিল। আমাদের ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে সাহেবরা extremist বলতেন। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', ছোট ও বড়, নাইটহুড পরিত্যাগের চিঠি, এমন কি সেদিনকার 'শান্তিনিকেতনে'র বক্তৃতা পড়ে সাহেবদের মনে তাঁর প্রতি অনুরাগ না আসাটাই স্বাভাবিক। এ পোড়া দেশে এটা কর্তব্যের ভাগ, উদ্দেশ্য এক। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মনুষ্যধর্মেরই নামে রাষ্ট্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে বিনিপাত বলে অভিসম্পাত করেছেন। সেই হিসেবে তিনি স্বধর্মই পালন করেছেন। অতএব চিত্তরঞ্জনের মতে অনেকটা সত্য পাচ্ছি, অন্যদিকে জীবনের সমগ্রতা-সাধনাই কবির ধর্মতত্ত্ব। পরাধীন, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, ভিক্ষাজীবীর শ্রেণী যদি ভারতীয় সমাজ-বহির্ভূত না হয়, যদি তাদের প্রাণবান না করা পর্য্যন্ত ধর্মসাধনা অপূর্ণ থাকে, যদি তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ আনা পলিটিক্সের প্রাণবস্তু হয়, তবে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ পলিটিশিয়ান—যেমন ভূপেন দত্ত দার্জিলিঙে আমাকে বলেছিলেন।

আমি একটি প্রশ্ন তুলে আমার বক্তৃতা শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ যে কবি সকলেই স্বীকার করছেন, পলিটিক্স ও সমাজনীতিতে তাঁর দান মূল্যবান, অনেকেই এই কাণাঘুষো শুনেছেন—তাঁর দু'চারটে স্বদেশী-গানও আপনাদের জানা আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বজ্রকণ্ঠে বলতে পারেন 'আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা', তাঁকে অভিধানে কি বলে? আমার অভিধানে বলে মহামানব। নতুন জগতে যদি তিনি সাধারণ মানুষ বলেই অভিহিত হন, তবে তিনি Saint Simon-এর মতনই বলবেন, 'খুশী হলুম, খুশী হলুম, এরই জন্যে বসেছিলাম।'*

* লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে বক্তৃতার অনুলিখন, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪০।

বিশ্ব

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি সর্বদাই যুক্ত থাকে। কি অর্থে এই কথাটি প্রযোজ্য ভেবে দেখা উচিত। যাঁরা জ্ঞানী পাঠক তাঁরা দেখিয়ে দিতে পারেন কাব্যের কোন্ উপকরণ দেশ ও কালের অতীত, কোন্ পদ্ধতি সার্বভৌমিক, কোন্ লিখন-ভঙ্গী অমর। সৃষ্টির রহস্য-উদ্‌ঘাটন করে, তার উপাদানের ও উপাদান-সংযোগের চিরন্তন মূল্য যাচাই করা সাধারণ পাঠকের শক্তিতে কুলোয় না। সকলেই কিন্তু একটা কথা বোঝেন, কবি হতে গেলেই দেশ ও কালের ভেতর থেকেও তাদের অতিক্রম করতে হয়, কবির কাছে তাঁর দেশ ও কাল উপায় মাত্র। এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কাব্য-বস্তু ও কাব্যাবস্থান আমাদের সুপরিচিত না হলেও তাঁরা আমাদের নিতান্ত প্রিয়। তাঁদের পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আপেক্ষিক অজ্ঞানতা আমাদের রস-গ্রহণের মাত্রা হ্রাস করে মনে হয় না। কিন্তু অন্য একটা দিক থেকে আমাদের কাছে দেশ ও কালের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে অন্ততঃ দেখার আনন্দ হয়, যাকে চিনি না তার কাছে সঙ্কোচ বোধ করি, তাকে আপন করতে সময় লাগে, অভ্যস্তকে আমরা সহজে গ্রহণ করি, অনভ্যস্তকে আমরা ভয় করি, পরিহার করি, নচেৎ অনিচ্ছায় গ্রহণ করি। আমাদের কাছে আমাদের দেশ ও কাল বন্ধুর মতই পরিচিত। অবশ্য জ্ঞানের দ্বারা অপরিচিতও পরিচিত হয়ে

ওঠে। কিন্তু সে জ্ঞানলাভের জন্য শক্তি খরচ করতে হয়, মনকে নিবিষ্ট করতে হয়, শক্তির এই 'অপ'-ব্যবহার, এই 'অপচয়' সহজ আনন্দ-উপভোগে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। কারণ, অন্ততঃ পরিমাণের দিক থেকে বলা যায় যে, কোনো এক বিশেষ অবস্থার পক্ষে মানসিক শক্তি স্থির ও নিত্য। স্থূলভাবে দেখলেই মনে হয় যেন একটা বিশেষ ঘটনা-সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ অ-ভিন্ন শক্তি বিকিরণ করছে। অতএব উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আনন্দের মাত্রা বাড়ানো সম্ভব হলেও, কবিতা পড়ে আনন্দ-উপভোগের মত সহজ মানসিক কার্যের জন্য সাধারণ পাঠক তার শক্তির মূলধনকে জ্ঞানার্জনের মতন অনিশ্চিত ব্যবসায়ে খাটাতে অনিচ্ছুক হয়। এই অপচয়ের অনিচ্ছা এবং পূর্ব-পরিচিতের সাক্ষাৎজনিত সহজ ভাব ও শক্তি-সংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতের অন্য কোনো বিশেষ মূল্য নেই। এর বেশী যদি মূল্য না-ই রইল, তা হলে দেশ ও কালের অতিরিক্ত ও অতিক্রান্ত বিশ্বের একটি অর্থ হচ্ছে—দেশ ও কালের মধ্যস্থিত সাধারণ মানুষের নিকট কবির রস-সৃষ্টির সহজ-বোধ্যতা, সহজ-উপভোগ্যতা। বিশ্ব-কবি সর্বসাধারণের কবি, সহজ কবি।

জ্ঞানী পাঠকদের বিশ্ব থেকে বহিষ্কৃত করা যায় না। অধ্যাপকদের সম্বন্ধে দুই মত থাকতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর কাছে বিশ্ব-কথাটির অর্থ প্রকাশ পায় তুলনামূলক বিচারের ফলে। অর্থাৎ বিশ্বের এই তাৎপর্য অর্জন করতে হয়। এমন একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তৈরি করা সম্ভব যার দ্বারা কবির প্রত্যেক কীর্তিকে সর্বদেশীয় ও সর্বকালীন রূপ-সৃষ্টির ধারার সম্পর্কে আনা যেতে পারে। বিনয়াবনত মনে জ্ঞানার্জনের ফলে সাহিত্যরূপ সম্বন্ধে গোটাকয়েক মূল তথ্য ধরা পড়ে। পৃথিবীর সব বড় কবিই গোটাকয়েক সাধারণ গুণ ও নিয়ম মেনে চলেন। বাস্তবিকপক্ষে নিয়ম নেই, কিন্তু সুবিধার জন্য সাধারণ গুণগুলিকেই নিয়ম বলা হয়। কয়েকটি গুণের উল্লেখ রসিক সমালোচক করে থাকেন, এই যেমন কবি ও আর্টিস্টের

অনুভূতি নিতান্তই গভীর ও সত্য হবে, সেই গভীর ও সত্য অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করতে প্রত্যেকেই সুসমর্থ হবেন, পাঠকের মনে সেই সব অভিজ্ঞতাকে পুনর্জীবিত করতে প্রত্যেকেই পারবেন; অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের মনের ও নিজের মনের সৃষ্টরূপের একটা মিল থাকবেই থাকবে। অতএব কিরকমভাবে কাব্যের ও আর্টের সাধারণ নিয়মাবলী আর্টিস্ট ও কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করছে জ্ঞানী পাঠক তাই দেখবেন। তুলনামূলক বিচার করে সেই প্রকাশকে বোঝাবার ও বুঝে আনন্দ পাবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিশ্ব-কথাটির অন্য একটি অর্থ সার্থক হতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে বিশ্ব-কথাটি যে ইঙ্গিত বহন করে, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, তুলনামূলক বিচারের এবং তারই ফলে 'সৎ'সাহিত্যের চিরন্তন লক্ষণ নির্ধারণ।

পূর্বেই বলেছি—একমাত্র সুবিধার জন্যই আর্টের সাধারণ লক্ষণ-গুলিকে নিয়ম বলা যেতে পারে। নিয়ম বললেই আইনকানুন কিংবা নীতি, অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের কথা মনে হয়। এই রকম নিয়মে আর্টিস্টের স্বাধীনতা খর্ব হয় মনে করা স্বাভাবিক। কে না জানে যে আর্টিস্টকে, কবিকে কেবলমাত্র ঐতিহ্যের সম্পর্কে এনে তার সৃষ্টিকে বিচার করলে, তার অন্য দিকটা, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ব্যক্তিগত সত্তার দিকটা ফাঁক পড়ে যায়? ঐতিহ্যের এই প্রকার ঐকান্তিক ধারাবাহিকতার ধারণার দ্বারা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করা সম্ভব হলেও, সে উপায়ে সৃষ্টি-রহস্যের একটি মূল কথা প্রকাশ পায় না। সৎসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলিকে নিয়ম মনে করা সুবিধাজনক বলে, এবং তারই ফলে নিয়মের ধারাবাহিকতা আর্টিস্টের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে অনেক সময় বাধা দেয় বলে, রস-সৃষ্টির ও রসোপভোগের অন্য একটি ঐক্য-বিধায়ক মূল তত্ত্বের সন্ধান করা দরকার। (রবীন্দ্রনাথ সে সন্ধান নিজেই দিয়েছেন)। মূল তত্ত্বটি হল পার্সনালিটি। ব্যক্তিত্বের এই সংজ্ঞাটিতে সৃষ্টির ভেতর ও বাইরের প্রধান তথ্যগুলি সূচিত হয়, ভেতরের সৃষ্টি-চাতুর্য এবং বাইরের সৎসাহিত্যের লক্ষণগুলি। কারণ দেশ ও কালকে যে

ঐতিহ্যের ধারা প্রাণবন্ত ক'রে অতিক্রম করে তার মূলেও থাকে পাত্র। পাত্রটি শুধু কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার অন্য গুণ যথেষ্টই রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য-বিকাশের ধারার মধ্যেও এমন অনেক সাধারণ গুণ রয়েছে যাদেরকে ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে পৃথক করে বাহ্য-বিষয় বলে গণ্য করা অসম্ভব নয়, বরঞ্চ স্বাভাবিক কারণ, প্রত্যেক সৎপুরুষের কার্যই হচ্ছে, নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্বাত্মক করে তোলা। পার্সনালিটির প্রধান লক্ষণ এই। রবীন্দ্রনাথ একেই ক্রিয়েটিভ্ ইয়ুনিটি বলেন। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে মৈত্রীভাব রয়েছে। সে-বিকাশের গোড়ার কথা এই—বিশেষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রেরণায় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সকলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে এবং সেইজন্য ঐক্য ও বিশ্বজনীনতা লাভ করে। পাঠকের বৈশিষ্ট্য যত বিচিত্র হোক না কেন, আর্টিস্টের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে, তাঁর বিকাশ-ধারায় এসে, তাঁর ও অন্যের থেকে নিজের পার্থক্যটুকু হারিয়ে ফেলে, একত্র সম্পূর্ণ হয়। এই ধরনের সম্পূর্ণতাই হল ব্যক্তিবিশেষের সফলতা। এক কথায়, আর্টিস্টের সৃষ্টিতে ছোট আমি-টা পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে বড় আমিতে পরিণত হয়। প্রত্যেক পাঠকেরই অভ্যন্তরে, নিজের অজানিত অবস্থায়, এই নতুন সৃষ্টি চলতে থাকে। অতএব এই সৃষ্টি কারুর নিজের সম্পত্তি নয়। তবুও লোকে ভাবে অন্য কথা, কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথম অভিজ্ঞতা তার নিজত্বটুকু নিয়ে। যদিও হয়তো কোনো সম্পূর্ণ অর্থাৎ সৎপুরুষের সাহায্যে সেই নিজত্বকে লোপ পাওয়ানোই তার শেষ অভিজ্ঞতা। কবির কাব্য সমুদ্র-বিশেষ, তার মধ্যে সকল বিশেষের নদ-নদী সম্পূর্ণ হতে পারে। তিনি সৎপুরুষ, অতএব তিনি বিশ্বের।

পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি সাধারণের বেলা এবং রসগ্রাহী জ্ঞানী পাঠকের বেলাতেও খাটে। সত্য কথা এই যে, মানুষই মানুষের প্রধান আগ্রহের বস্তু, তার আনন্দের প্রধান উপাদান। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে সম্পূর্ণ ও সার্থক হবার তাগিদ রয়েছে—সে জানুক আর নাই জানুক—যে জানে, সে-ই তাগিদ সম্বন্ধে সচেতন, সে-ই জ্ঞানী, যে জানে না

সেই সাধারণ। সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ হতে পারে না, অন্ধ জীবন-স্রোতে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলে। এর জন্য তার বরাবরই ক্ষোভ থেকে যায়। সে ক্ষোভ যখন ঈর্ষাতে পরিণত না হয়, তখনই কোনো সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশা মেটায় ক্ষতিপূরণ করে। এটা হয়তো বুদ্ধিমানের কার্য নয়, কিন্তু বুদ্ধি নামক ইন্দ্রিয়টা সকলের থাকে না, যাদের থাকে তারা আর্টিস্টের অসম্পূর্ণতা দেখাতেই ব্যস্ত। যাঁদের বুদ্ধি মার্জিত, তাঁরা সৎসাহিত্যের লক্ষণ নিরূপণ করতেই ব্যস্ত। নিজের আশা মেটানো, অর্থাৎ নিজের অপূর্ণতার ক্ষতিপূরণ করা অন্ততঃ বহির্মুখী স্বভাবের রীতি। যাঁরা অন্তর্মুখী তাঁরা একটি মহান ব্যক্তিত্বকে নিজের মধ্যে শ্রদ্ধা-সহকারে এনে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন। উভয়ক্ষেত্রেই পাত্রের বিশেষত্বটুকু বড় আধারের আশ্রয়ে সার্থক হয়। অতএব এই একীকরণ শুধু দেশ, কালের বাইরে নয়, পাত্রেরও বাইরে। আর্টিস্টের ব্যক্তিত্ব যদি সাধারণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের তাগিদ কিংবা ক্ষোভ মেটায়, তার মধ্যে প্রকাশ করেই হোক, কিংবা তাকে হৃদয়ে ধারণ করেই হোক, তাঁর সৃষ্টি যদি আমাদের সুপ্ত সৃজনী-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করে, তা হলে সেই আর্টিস্টকে বিশ্ব-কবি নাম ছাড়া অন্য নাম দেওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব-বিকাশই হল বিশ্বের মর্মকথা।

অবশ্য একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতিভাশালী ব্যক্তির পার্থক্য অনেক। সাধারণের আধার ছোট, তার প্রেরণা দুর্বল, তার তাগিদের জোর কম। কিন্তু কোথায় যেন একটা গভীর মিল থাকেই থাকে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে, যে জীবনীশক্তির লীলা সকলের মধ্যেই চলছে, সেই জীবনীশক্তিরই অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি হয়—তবে হয় দ্রুততরভাবে, সংক্ষেপে, অথচ সুস্পষ্টভাবে। প্রত্যেক জীবেরই জীবনে তার শ্রেণীগত ইতিহাসের পুনরাভিনয় হয়। যেসব জীবের জন্য শ্রেণীর উন্নতি সাধিত হয়, তার মধ্যে জীবনীশক্তি চৌদুনে চলে। মনে হয়, যেন জীবনের তাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুর ও লয় ভ্রষ্ট হয়েছে, নতুন কিছু সংসাধিত হচ্ছে। মানসিক জগতেও

এই নিয়মের বড় বেশী ব্যতিক্রম হয় না। মনের ইতিহাসে সাধারণ মানুষ এখনও যৌবনে, অর্থাৎ সভ্যতার স্তরে পদার্পণ করেনি। এখন যদি দেখি, কোনো মানুষেব সৃষ্টিতে, তাঁর সর্বাঙ্গে সভ্যতার রাজটিকা পরানো, শুধু তাই নয় মনের ভবিষ্যৎ গতির একাধিক ইঙ্গিত তাঁর প্রত্যেক কর্মে ও চিন্তায় নির্দিষ্ট হচ্ছে, তখনই সে মানুষের সঙ্গে 'বিশ্ব' কথাটি জুড়ে দিতে পারি। কেন না, মানসিক বিবর্তন ঘটছে এবং ঘটছে বলেই সেটি কোনো বিশেষ যুগের ও দেশের সম্পত্তি নয়; কেন না, স্থান ও কাল সেই বিবর্তন বোঝাবার সুবিধাজনক সঙ্কেত মাত্র। এই মানসিক বিবর্তনের গতিকে নিজের আধারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো, কিম্বা তার শক্তিতে শক্তিমান হওয়া যদি প্রত্যেক পাত্রের চরম সার্থকতা হয়, তা হলে স্বাতন্ত্র্য হয়ে উঠে বিশ্বজনীন। এবং যে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এই গতি সুন্দর ভাবে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হচ্ছে, তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বমানব।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভেতর দিয়ে প্রত্যেকেই, দেশ ও কাল নির্বিশেষে, নিজের বিকাশমর্ম উপলব্ধি করতে পারে। এতে নিজের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না, নিজের শক্তির অপচয় হয় না, সেই বিশেষ শক্তি সার্থক, সম্পূর্ণ ও সঞ্চিত হয়। প্রত্যেকের বিশেষত্ব তাঁর বিশেষত্বের মধ্যে, তাঁর বিরাট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে শতদলের মতন ফুটে উঠতে পারে। প্রত্যেকের স্বভাব তাঁর সৃষ্টিতে চরিতার্থ হয়। স্বভাব কথাটির দু'টি অর্থ আছে—একটি, মাত্র প্রকৃতির দান, যেটি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, অন্যটি সেই দানেরই সার্থক মূর্তি, পরিপূর্ণতা, সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুন্দর ইমারত। এ দু'টি অর্থ যেখানে এক হয়ে যায় সেইখানেই সার্বজনীন পরিমাণ, সর্বাঙ্গীণ পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়। (যেমন য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের পরিমাণ. পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়েছিল রোমান জুরিস্টদের সাধারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে) সেইভাবে যদি আমাদের দেশাত্মবোধ তাঁর বিশ্ব-বোধে পরিণত হয়, তা হলে তিনি কেবল আমাদের দেশের নন, সকল

দেশের। যদি বর্তমান সভ্যতার গতি ও উন্নতি তাঁর চিন্তায় ও কর্মে নির্দিষ্ট হয়, তা হলে তিনি ভবিষ্যৎকালের, অর্থাৎ বর্তমানের সম্পর্কে সকল কালের। যদি তাঁর রচনার মধ্যে আমাদের দেশের ও অন্য দেশের রস-সৃষ্টির ধারার প্রধান প্রধান পর্যায়গুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেই ধারার ভবিষ্যৎ গতি ইঙ্গিত করে, তা হলে তিনি কেবল আমাদের ও অন্যদের দেশের ঐতিহ্যে আবদ্ধ নন—তিনি হন, সৎ-সাহিত্যিক, অর্থাৎ বিশ্ব-সাহিত্যিক। যদি তাঁর সঙ্গীত রচনায় আমার সঙ্গীতপ্রিয়তার, আমাদের ও অন্য দেশের সঙ্গীত পদ্ধতির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি, তা হলে তিনি শুধু আমাদেরও নন তাঁদেরও নন, তিনি বিশ্বের। যদি তাঁর কাজের মধ্যে জীবনের সারধর্ম অনুস্যূত হচ্ছে দেখতে পাই, তা হলে তিনি সর্বজীবনের। যদি তাঁর মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা ভরসা, চিন্তা কর্ম ও ধর্মের নিষ্কর্ষসাধন হচ্ছে মনে হয়, তা হলে তিনি সর্বসাধারণের। এই রস-সৃষ্টির ধারার, এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের, এই জীবন-ধর্মের পুনরাবৃত্তির দিক থেকে তাঁকে আমি বিশ্বকবি বলি। লোকেও তাই বলে। অতএব এই আখ্যা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়ানো, সে দায়িত্বজ্ঞান দেশ কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হতে দেওয়া, এইটাই হল প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান। নামকরণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব লুকানো থাকে। সে সম্বন্ধে সচেতন হলে নামধারীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখানো হয়। তাঁর কর্তব্য তিনি করেছেন, এখনও করবেন—তাঁর দায়িত্ব তাঁর নিজের প্রতি; তাঁর প্রতি আমাদের এই কর্তব্য হচ্ছে বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। লিখে চিন্তা করেই তিনি ক্ষান্ত, আমাদের সাধনার কিন্তু অবসান নেই। রস-সৃষ্টি করে তিনি হন সারা, মোদের কিন্তু হল শুরু।

॥ পরিচয় ॥ ॥ বৈশাখ ॥ ১৩৩৯ ॥

প্রগতি

বহু পূর্বে প্রগতি নামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি। 'বিচিত্রা'য় সেটি প্রকাশিত হয়। তার শেষে লিখেছিলাম, 'আপাতত আমি এই বুঝি।' ইতিমধ্যে, অর্থাৎ গত দশ বৎসরে, আমার মতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রগতিশীল লেখকদের অনুরোধেই আমার বর্তমান মতামত সাজাবার সুযোগ হল। সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রগতির অর্থ পরিবর্তন, এবং যে ব্যক্তি প্রগতি কথা ব্যবহার করেছেন তাঁর মতানুযায়ী দিকে পরিবর্তন। কিসের পরিবর্তন? যে বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে তার ; এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের। কিন্তু সাহিত্য মানুষের কাজ, এবং মানুষ সামাজিক জীব, অতএব সর্ববিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গেই সমাজের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। সমাজ একটি নিরালম্ব বস্তু নয়, তার জন্মমৃত্যু উত্থানপতন আছে, অর্থাৎ জীবন আছে। সমাজের জীবন এক হিসেবে ব্যক্তির জীবনের সমষ্টি। কিন্তু একটি ব্যক্তিরও অন্য ব্যক্তি-সমষ্টি অর্থাৎ সমাজ ভিন্ন পৃথক সত্তা নেই। এই সংযোগ কেবল আধিভৌতিক দৈনন্দিন ব্যবহারে নিবদ্ধ নয়, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক আচরণেও সত্য। শেষের দু'টি স্তরের ব্যবহারও প্রথম স্তরের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। পূর্বে খাওয়া-পরার সংস্থান, পরে ভাবসম্পদ ; অতএব পূর্বে সেই সংস্থান-সৃষ্টির

পরিবর্তন তার ফলে ভাবসম্পদ সৃষ্টির পরিবর্তন। কিন্তু এদের মধ্যে হারের তারতম্য আছে। একটি সংস্থান-পদ্ধতির আশ্রয়ে যে জনকয়েক লোক লাভবান হয়, আইনকানুন, ধর্মনীতির সাহায্যে সেই লাভ অক্ষুণ্ণ রাখাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই সংস্থান-পদ্ধতি স্থানু হয়ে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে মন্দা পড়ে না। এই তু'টি হারের বৈষম্যই স্থিতিস্থাপক ও গতিশীল দলের চিরন্তন বিরোধের প্রধান হেতু। সমাজের দিক থেকে, অর্থাৎ মানবজীবনের সংজ্ঞায়, পূর্বোক্ত বৈষম্যই প্রগতির প্রকৃত তাগিদ্। বিরোধ না থাকলে গতি থাকতো না, অতএব প্রগতিও অসম্ভব হতো। বিরোধের রূপান্তর প্রগতির এক একটি ধাপ। এই বিরোধের অবসানে প্রগতি নিরর্থক। ইতিমধ্যের ইতিহাসেই প্রগতির আলোচনা করা চলে, কারণ জীবনটাই অনাদি ও অনন্ত।

বলা বাহুল্য, প্রগতি সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তনশীল। তবে এটুকু জেনে তার প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। যুক্তিকে নিরালম্ব না করলেই চলে। জ্ঞানের দ্বারা যে সমস্ত মূল্য ও স্বার্থ (values and interests) যাচাই করা হয়েছে তার সমর্থনই যুক্তির সামাজিক কর্তব্য।

এই হিসেবেই প্রগতির প্রকৃতি আলোচনা করছি। প্রগতির তিনটি স্তর আছে—তথ্য (facts), ঘটনা (events), এবং মূল্য (values)।

প্রত্যেক স্তরের একটি একটি উপযোগী মনোভাব আছে। তথ্যের বেলা বৈজ্ঞানিক, ঘটনার বেলা organismic (বাংলা প্রতিশব্দ পাইনি) এবং মূল্যের বেলা দার্শনিক। মনোভাব অর্থে কর্মরহিত, ও স্তর অর্থে ইতর-ব্যাবর্তক অবস্থার ইঙ্গিত করছি না। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যতদূর মেকানিস্টিক ব্যাখ্যা চলে ততদূর গ্রহণ করা, এবং তারপর যেখানে সহজে চলবে না সেখানেও সে ব্যাখ্যা খাটাবার চেষ্টা করাও প্রগতিশীল লেখকদের তথ্য সম্বন্ধে কর্তব্য। যদি নেহাৎ

অসম্ভব হয় তবে চুপ করে যাওয়াই ভাল, অন্ততঃ ইমার্জেন্ট এভোলিউশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার চেয়ে, কারণ শেষোক্ত ব্যাখ্যায় অজ্ঞানতাকে গালভরা নাম দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিণত করবার চেষ্টা অনেক স্থলে লক্ষ্য করেছি। আকস্মিক পরিবর্তন জীবনে ঘটে, কিন্তু প্রথমতঃ আকস্মিকতা সময় সংক্ষেপমাত্র, নতুন ধরনের পরিবর্তন নাও হতে পারে। তা ছাড়া অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, আকস্মিক পরিবর্তন নিতান্ত অস্থায়ী এবং ক্রমবিকাশের প্রতিকূল। আরেকটি কথা বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্বন্ধে বলা উচিত। এরও একটা ইতিহাস আছে; আদিম যুগের জাদুকরও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, মধ্যযুগের জ্যোতিষীও বৈজ্ঞানিক, আবার পদার্থ-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের অধ্যাপকও বৈজ্ঞানিক। এমন পদার্থবিদ্‌ও আছেন যাঁরা কাগজেকলমে সিদ্ধান্ত কষে দেন—অন্য লোকে তার যাচাই করে। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায়, অবরোহ ও আরোহ দুই প্রণালীকেই বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করেছেন, আজও করছেন। একই পরীক্ষায় অনুসন্ধানের অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুসারে আরোহ-অবরোহ-পদ্ধতি উপযোগী। অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্রমবিকাশ যখন আছে; তখন বৈজ্ঞানিক মনোভাবও চিরন্তন, সনাতন, শাশ্বত পদার্থ নয়। এ যুগে পরীক্ষার জয়জয়কার সব বিজ্ঞানেই; যেগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিণত সেগুলিতে, এবং পরিণত বিজ্ঞানে, যেমন ভূতবিদ্যায়, কিন্তু অবরোহ প্রথা পরিত্যক্ত নয়। কেন এই পদ্ধতির ও মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে গেলেই আমরা সমাজের দ্বারস্থ হব। হিন্দুদের মধ্যে বীজগণিতের এবং গ্রীকদের মধ্যে জ্যামিতির প্রত্যয়ের আবির্ভাবের জন্য সমাজে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর স্থানভেদই প্রধানত দায়ী, এ সত্য হগবেন দেখিয়েছেন। আধুনিক গণিতের equation-এর মধ্যে সমাজের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না, কিন্তু তার ব্যবহারে ও তার ফলে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের রূপভেদে সমাজের নির্বাচন প্রক্রিয়া চোখে পড়ে। ব্যাপারটা এই—কোন্ সময় কোন্ পদ্ধতির রূপটি প্রচলিত হবে তা নির্ভর করছে বৈজ্ঞানিক সমস্যার ইতিহাসের ওপর,

এবং সেই ইতিহাস ভালো করে পড়লে বোঝা যায় যে, সমস্যার আদিতে কোনো-না-কোনো ব্যবহারিক সমস্যা ছিল। মধ্যের অংশে সমাজ নির্বাচনের ক্রিয়া সুস্পষ্ট নয়। অন্ত্যে, অর্থাৎ কিছুকাল পরে ফলিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের পুনর্মিলন হয়। সে যাই হোক, প্রগতিশীল লেখকদের তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে মনোভাব বর্তমান ও আগামীকালের বৈজ্ঞানিক মনোভাব হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধাসহকারে তথ্যকে বোঝাটাই প্রথম কথা। সব তথ্য বোঝা অবশ্য নয়, যে তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে তাদেরই কথা বলছি। মানুষের মন, ভয়-ভাবনাকে কেন্দ্র করে তথ্য সাজানো পুরাতন সাহিত্যিকের লক্ষণ। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহানুভূতি দেখানো রোম্যান্টিক মনোভাবের নিদর্শন। প্রগতিশীল লেখকের চাই প্রাকৃতিক তথ্যের অন্তরানুভূতি, 'সিমপ্যাথী' নয় 'এমপ্যাথী'।

তথ্যের পর ঘটনা। পুরাতন সাহিত্যের পরিণতি ছিল একটিমাত্র সঙ্কটময় মুহূর্তে। সময় সম্বন্ধে কর্তাদের ধারণা ছিল আলোকের মত। আলোকের রশ্মিগুলি যেমন লেনসের ভেতর দিয়ে এসে একটি বিন্দুতে পরিণত হয়, তেমনি চরিত্রের অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে এসে গোড়াকার শান্ত জীবন একটি চরম মুহূর্তে পরিণত করানোটাই তখনকার রীতি ছিল। এরই নাম গল্প বলার টেক্‌নিক ইত্যাদি। এখন, সময় সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে, অতএব সঙ্কট ও কালান্তর এখন শেষে অবস্থান করে না। তারা গল্পের মধ্যে কবিতার মাঝ-মধ্যিখানেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার স্থান নির্দিষ্ট নেই, কারণ কাল সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।

ঘটনা সম্বন্ধে দু'টি মন্তব্য করতে চাই। কালকে উড়িয়ে দেওয়া একাধিক পণ্ডিতের মত। তাঁরা বলেন যে, প্রত্যেক ঘটনাই বিচ্ছিন্ন টুকরোভাবেই দেখা বৈজ্ঞানিকের কাজ, এবং জীবনটা পৃথক পৃথক ঘটনার সমাবেশ মাত্র, যেমন বায়স্কোপের চলন্ত ছবি ভিন্ন ভিন্ন ছবির দ্রুত পরিচালনা মাত্র। কিন্তু এ যুক্তিতে গলদ আছে। এখানে তথ্যের সঙ্গে ঘটনার পার্থক্য প্রকাশ পাচ্ছে না, অথচ সে পার্থক্যটা

প্রকৃত। তা ছাড়া, চলন্ত ছবি চালায় কে, কি ভাবে চলছে, কোন হারে চলছে—এসব প্রশ্নের উত্তর পূর্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে পাই না।

অথচ জীবনটা চলন্ত, বিশেষভাবে চলে, কখনও ঠায়ে, কখনও দুনে, কখনও আমাদের বাঞ্ছিত দিকে, কখনও উল্টো দিকে। কিন্তু যে কোনো অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত সময়ে জীবনের মধ্যে একটা না একটা ভালোমন্দ ছক খুঁজে পাওয়া যায়। এ ছক কি করে তৈরী হয়? উত্তর আসে—স্মৃতির সাহায্যে। কিন্তু স্মৃতির দোহাই দিলে জড়েরও স্মৃতি মানতে হয়। তাও আজকাল কেউ কেউ মানছেন। কিন্তু তার প্রকৃতিটা কি? লৌহদণ্ডের স্মৃতি আছে বলা হয়, তখন কি তার এই অর্থ নয় যে, পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে তার অনু-পরমাণুর নকশা একটি বিশেষ রূপে সজ্জিত হয়েছে? পুনরাবৃত্তিরই মধ্যে কালের খেলা রয়েছে। অথচ সময় থেকে বিভিন্ন ভাবে দেখলে বিজ্ঞানের চলে না। অথচ প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, সান্তরতা ভিন্ন অন্য পথ নেই। সমগ্র জীবনটাকে ঐভাবে দেখলে সাহিত্য হয় বিফলতার বিবরণ, ব্যর্থতার কাহিনী, অর্থাৎ মূল্যহীন। কিন্তু প্রগতির মূল্য আছেই আছে, যখন কথাটি ব্যবহার করছি।

অতএব ঘটনা সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে যে, কাল-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সদর্থক হওয়া চাই। কোনো দার্শনিক আলোচনা না করে বলা চলে যে, হিন্দুদের মতন মহাকাল নামক দেবতার কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই বটে, তবু কালবস্তুর নিতান্ত ব্যক্তিসম্পর্কহীনতা স্বীকারের প্রয়োজন আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি তথ্য অন্য তথ্যের সঙ্গে মিশে আছে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে, কার্যকারণ সম্বন্ধের তাগিদেই সাধারণতঃ। এই কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিচারের ফলে আমরা বুঝি যে, সব সময় যতটুকু কার্য একটি কারণের জন্য হওয়া উচিত তার বেশী কিংবা কম হচ্ছে। কখনও বা একই কার্যের একাধিক কারণ। এরূপ হয় কেন? তার ব্যাখ্যার জন্য কালাতিপাত মানতেই হয়। অর্থাৎ মাত্র অতিপাত কিংবা অতিক্রমের ফলে পূর্বেকার তথ্য একটি বেগভার অর্জন করে পরের তথ্যকে ধাক্কা

দিচ্ছে। যখন পরের তথ্য সেই বেগভার হজম করতে পারে না তখনই তাকে ঘটনা (event) বলাই শ্রেয়।

ঘটনার আবার বেগভার আছে যার ফলে অন্য ঘটনা তৈরী হয়। এই চলন চিরকাল। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার প্রত্যাশা করি, যার বেগভার থাকবে, নতুন ঘটনা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকবে। পারম্পর্য (sequence) প্রগতির মূল কথা নয়। বেগভার প্রকাশ পাবার ঠিক পূর্বেকার অবস্থা পর্যন্ত সমাবেশের প্রকৃতি বাঁধাছাঁধা জৈব দেহের মতন। অর্থাৎ, একটা তার ছক আছে। একটি 'ক্রাইসিস্' থেকে অন্য 'ক্রাইসিসে' যাবার মধ্যে এই নকশারই ছবি প্রগতিশীল সাহিত্যিককে আঁকতে হবে।

বর্তমান জগতে যে প্রকার জীবন সম্ভব তাতে নকশাগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে। এই সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে ঘটনা ঘটতে পারে না, যা পারে তার নাম তথ্যের পুনরাবৃত্তি ও বিচ্ছিন্নতা। সেজন্য যন্ত্রকে দায়ী করা রোম্যান্টিকেরই সাজে। যুক্তিতে বলে—যন্ত্রের সঙ্গে গতানুগতিকতার সম্বন্ধ থাকলেও তার নিকটতম আত্মীয় হল যন্ত্রের উপর অধিকার-বিভাগ। এক কথায়, সমাজে অধিকার-বৈষম্যের জন্যই জনসাধারণের জীবন অত একঘেয়ে। প্রগতিশীল লেখকদের এই সামাজিক তত্ত্বটুকু ধরতেই হবে। যেভাবে বাঁচছি তার চেয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চাওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ভালোভাবে মানে ঘটনাবহুলভাবে। এটা একাধারে তথ্য ও তত্ত্ব।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যের উৎপত্তি। ভালোভাবে এবং আরো ভালোভাবে জীবন চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছার মধ্যেই মূল্য নিহিত রয়েছে। যে হিসেবে ঘটনা ধরেছি সেই হিসেবে ঘটনা বাহুল্যকে মূল্যের একটি অঙ্গ ধরা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে মনে হয় যেন মূল্য একটি 'আবির্ভাব' (Emergent Quality)। 'যেন' কথাটিতে সত্য-সন্ধানের কাল্পনিকতা ও আনুমানিকতাই সূচিত হচ্ছে। স্বার্থ এবং প্রাসঙ্গিকতার দ্বারা যখন তথ্যসমুদয় গ্রথিত হচ্ছে তখনই, যখন ভাব উদ্দেশ্যের দ্বারা এবং পূর্ব ঘটনার বেগভারে নতুন ঘটনা সজ্জিত

হচ্ছে তখনই, মূল্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে গিয়েছে। মূল্যজ্ঞান জন্মায় সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে। পূর্বকাল থেকে, কিংবা পিছনে বসে সেটি পুতুল-নাচের মাস্টারের মতন নকশা কাটছে না। ভিন্ন ভিন্ন মূল্য যখন তৈরী হচ্ছে তখন মূল্যজ্ঞানও নিত্য নয়।

পূর্বেই বলেছি বর্তমান জগতে ঘটনা বড় একঘেয়ে এবং তার কারণ যন্ত্রের আধিপত্য নয়, যন্ত্রাধিপতির আধিপত্য। আধিপত্যের পরিবর্তনের অর্থ বিপ্লব। কথায় কথায় এবং কেবল কথার সাহায্যে বিপ্লব আসে না। তাই মূল্যের দ্রুত পরিবর্তন সহজ নয় এবং মূল্য-জ্ঞানের ইতিহাসও চলন্ত নয়। কিন্তু ভালোভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার উপায়ের জ্ঞানে অর্থাৎ বিজ্ঞানে ভাটা পড়েনি। মূল্যজ্ঞান আটকে রইল, অথচ বিজ্ঞান অগ্রসর হল। এ যেন আরবী ঘোড়ার সঙ্গে খোঁড়া গাধা জুতে গাড়ি হাঁকানো। তাই গাড়ি উল্টে যায়। পাছে বিপ্লব বাধে এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ বললেন যে, মূল্যজ্ঞানটাই সনাতন, এবং গতিটা মায়া। যে কোনো মূল্যজ্ঞানকে শাশ্বতে পরিণত করার মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ আছে। শবের দৌরাত্ম্য প্রগতিশীল লেখক মানতে পারেন না।

অস্বীকার করাটা মস্ত কাজ, কিন্তু সুশ্রী নতুন সৃষ্টি করাটাই উদ্দেশ্য। মন্দকে নাকচ করা ছাড়া ভালোকে খাড়া করারও কর্তব্য রয়েছে। অবশ্য প্রথমটা না হলে দ্বিতীয়টি অসম্ভব। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের অপর পারে আর একটি জগৎ রয়েছে সন্দেহ হয়। বিরোধের অবসান কি নেই? লেখকের চিত্ত বিক্ষুব্ধ থাকলে কলম নড়ে না, কে না জানে? অথচ লেখবার সময়ও শান্তি নেই; ভাষা, ভাব তখনও বিদ্রোহী জড়ের মতন ব্যবহার করে। তাদেরও বশে আনতে হয়। যতক্ষণ না নতুন ভাবের উপযোগী ভাষা করায়ত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ নতুন প্রচেষ্টা গতির চিহ্ন মাত্র রইল। কেবল নিদর্শন কিংবা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকাটাই কি চরম কথা? সুষ্ঠু সমাবেশের দায়িত্ব কখনও ঘোচে না।

শুনেছি বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আছেন। তাঁরা কেউ কেউ আঙ্গিকের উন্নতি করছেন। ভাবের দিকে বিশেষ কোনো

নতুনত্ব পাইনি। সকলে এখনও ব্যক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথবাবু ও শরৎচন্দ্রের যুগে হিন্দু-সমাজের বিপক্ষে লড়াই করার প্রয়োজন ছিল, তাই ব্যক্তিবাদ তখন ছিল প্রগতিশীলতার মূলমন্ত্র। এখন সমাজ বদলেছে। নতুন সাহিত্যিকের লেখায় পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতনতার সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু কেন হল, কিভাবে হল—এই জ্ঞানের পরিচয় পাই না। ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে খেতে পাচ্ছে না, তাই কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের কারণ যে সে নিজে ফুটতে পারছে না—মাত্র এইটুকু কথা সাহিত্যে ফুটছে। কবিতায় বিষাদের ছায়া দেখেছি, কিন্তু কিসের বিষাদ? সেই একই কারণে, অর্থাৎ কবি নিজে ভালোভাবে থাকতে পাচ্ছেন না। এরা যেন সকলে ভালো চাকরি খুঁজছেন। বাঙলা কবিতা ও কথা সাহিত্য বড় চাকরির দরখাস্ত লেখার সামিল হলে কি সাহিত্য হবে? যারা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা-হুতাশ করেন তাঁরা লোক ভালো, কিন্তু রোম্যান্টিক। আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুটো মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার উপর রূপ সৃষ্টি হোক, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে। ঐ বস্তুটির অস্তিত্ব মানি, তার প্রয়োজন স্বীকার করি, তার আগমন বাঞ্ছনীয় ভাবি, অন্য দেশে তার সৃষ্টি হচ্ছে জানি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে আঙ্গিকের অনুকরণ ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কিছু হয়েছে কি? সন্দেহ হয়, হয়নি। তাই স্বাদেশিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ প্যারাগ্রাফটি লিখলাম। সমাজ-জীবনের রূপ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে-নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায়, তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে ভুল করতে আমি রাজি নই।

॥ প্রগতি ॥ ॥ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ। ১৩৪৪ ॥

বর্তমান সাহিত্যের মূল কথা

বর্তমান সাহিত্যের ধারা আলোচনার প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে—বর্তমান কথাটির তাৎপর্য কি? প্রশ্নটি উঠত না যদি আধুনিক সাহিত্য, প্রগতি-শীল সাহিত্য প্রভৃতি কথাগুলির চলন না থাকত। সর্বপ্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিরই আবেগ কোনো-না-কোনো ঘটনাঘাতের স্মৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। ঘটনা-কেন্দ্র যদি যথাসর্বস্ব মনে হয়, যদি তার তীব্র উজ্জ্বলতায় চারিপাশের তমসা, পূর্বের কারণ, পরের ফলাফল ও প্রতিবেশের সম্বন্ধকে আবৃত করে, তবে সেই প্রকার ঘটনাশ্রিত সাহিত্যকে আধুনিক কিংবা সাময়িক সাহিত্য বলাই সঙ্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে অধুনা সময় কাল-প্রবাহের অংশ নয় এবং সময়ও কালপ্রবাহ নয়। বর্তমান সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকৃতি ভিন্ন। তারও স্মৃতিকেন্দ্র নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। ঘটনা-পরম্পরা, কার্যকারণ-সম্বন্ধ, নিকট ও দূরতর অর্থ তার বর্ণালী সম্পাতে উদ্‌ভাসিত। বর্তমান সাহিত্যের ঘটনা তাই সাময়িক না হলেও চলে। চিন্তা ও ভাবের ধারা—চিন্তা ও ভাব আমাদের মানসিক ঘটনা—বরঞ্চ অধুনা থেকে একটু দূরে সরে গেলেই যেন বেশী স্পষ্ট হয়। তাই এক অর্থে বলা চলে যে, আধুনিক সাহিত্যের মৃত্যুই বর্তমান সাহিত্যের জন্মলাভের সুবিধা। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান উপকরণ ভাব, বর্তমান সাহিত্যের মূলধন অনুভূতি, অভিজ্ঞতা; হৃদয় যদি থাকে, স্নায়ু যদি কার্যকরী হয় তবে ঘটনার

আঘাতে দু'টিই চঞ্চল হবে, এবং সাহিত্যিকের দু'টি বস্তুই অত্যন্ত সক্রিয়; কিন্তু তারপর যদি ভাবের শক্তি ফুরিয়ে যায় তখন অন্য উত্তেজনার প্রয়োজন ওঠে, সাহিত্যিক অন্য নতুন ভাবের সন্ধানে ঘোরেন এবং যদি মেলে তবে পূর্বভাবকে হারিয়ে ফেলেন কিংবা স্বেচ্ছায় মনন-কেন্দ্র থেকে তাকে সরিয়ে দেন। ফলে তাঁর সময় হয় ক্ষণিকের জঞ্জাল আর তাঁর আবেগ হয় ভাবের ভিড়ের ধাক্কা। কিন্তু বর্তমান সাহিত্যের অভিজ্ঞতা যেন অনুভূতির মালা। সাময়িক কি আধুনিক সাহিত্যের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, সাহিত্যিক যখন মানুষ তখন মন্বন্তরের মতন কোনো বিশেষ ও গভীর দুঃখ তাঁর হৃদয়কে আঘাত করবেই এবং তার ফলে তিনি নিশ্চয়ই ভাবপ্রকাশে ব্যস্ত হবেন। এই পর্যন্ত এসে তিনি যদি বিরত হন তবে তিনি আধুনিক কি সাময়িক সাহিত্যিকই থেকে গেলেন। আর যদি তিনি ঐ মন্বন্তরের কোনো একটি ঘটনার অবলম্বনে মানুষের চিরন্তন দুঃখ, পীড়ন, নিরাশার কথা আমাদের সকলকে স্মরণ করাতে পারেন তবে তিনি সমসাময়িক, আধুনিক হয়েও বর্তমান সাহিত্যের স্রষ্টা। এবং যে কালে অপেক্ষাকৃত বিশাল পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন, ঘটনার আদি ও অন্ত্য, অতীত ও ভবিষ্যৎ, কারণ ও কার্য বোঝা যায় না, এবং যখন সেটি না বুঝলে কর্ম ফলপ্রসূ হয় না, তখন একমাত্র বর্তমান সাহিত্যই প্রগতিশীল সাহিত্য হতে পারে। বর্তমান সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চাই প্রবল জীবন-শক্তি, প্রশস্ত জীবনবোধ ও সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি। এদেরই কল্যাণে আপাত প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করা, তার অবান্তরের স্তূপকে সরিয়ে দেওয়া, সংযত ও সজ্জিত করা সহজ হয়, ও সেই সঙ্গে অন্তরের অস্পষ্ট ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে আসে, বিশেষ ক্ষণের গণ্ডী ভেঙে মানুষের সাধারণ ব্যবহারে পরিণত হবার সুবিধা পায়।

ঠিক এই হিসাবেই বাংলার বর্তমান সাহিত্য একাধারে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যে বহু তৎকালীন ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে। তাদের মধ্যে একাধিক ঘটনা স্বদেশী আন্দোলন ও মহাযুদ্ধের মতন নাটকীয়, আবার বেশীর ভাগই

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবহারের অন্তর্গত, নতুনত্ব কেবল দেখবার ও প্রকাশের ভঙ্গীতে। যে সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা জ্বলে উঠেছিল তার মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটে, কিন্তু তাই বলে তাঁকে যুদ্ধের সাহিত্যিক নাম দেওয়া যায় না। যেজন্য মহাযুদ্ধের আরম্ভ সেই কারণই ছিল তাঁর কবিতার আগ্রহ। তিনি সেই কারণকে আপন ভূয়োদর্শনের মধ্যে এনে সমগ্র মানবেতিহাসের উত্থান-পতনকে রূপ দিলেন আপন কবিতায়। তেমনই অন্যধারে পাড়াগাঁয়ের পোস্টমাস্টার, বোষ্টুমি; শহরের গিরিবালা, সুচরিতা, মক্ষিরানী, সিসি-লিসি-কিটি সকলেরই জীবন সাধারণ। কিন্তু সেই সাধারণ জীবনধারায় দু' একটি ঘূর্ণি দেখা দিল, স্রোতে চাঞ্চল্য এল, রবীন্দ্রনাথ তাই লক্ষ্য করলেন, ও সেই সব ব্যাপারকে একটি অবিশেষ জীবন-বহতার অঙ্গ হিসাবে রূপ দিলেন। ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্য কোনো প্রকার শ্রেণী-সাহিত্য হল না বটে, কিন্তু সাহিত্য হল এবং বর্তমান সাহিত্য হল, এবং আজও রইল। আমার মনে হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুর্জোয়া সভ্যতা কি শ্রেণীর প্রতিভূ বলার মধ্যে বিচারের অভাব রয়েছে। বিষয় ও প্রতিজ্ঞা—subject ও theme, তথ্য ও মূল্য, অর্থাৎ fact ও value, অধুনা ও বর্তমান, এই প্রত্যয়গুলির পার্থক্য না বুঝলে সাহিত্যালোচনায় বড় বিপদে পড়তে হয়।

বর্তমান সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যকে অতিক্রম করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্যধারে জীবনের সমস্যা ক্ষণে ক্ষণে তিলে তিলে বাড়ছে এবং কোনোদিন সাধারণের অজ্ঞাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতেও পারে। কোনো সাহিত্যিক যে কালে অমর নন তখন নতুন রূপের, নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীর সম্ভাব্যতা ও অস্তিত্ব মানতেই হবে তাঁকে ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্যিককে। রবীন্দ্রনাথ আজ জীবিত নেই—এটুকু স্বীকার করাই ভালো, এবং জীবন সেজন্য চলা বন্ধ করেনি আমরা দেখছি। অতএব রবীন্দ্রোত্তর জীবনের সমস্যা যদি নতুন সমস্যা হয়, তবে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। আমি এখন পঞ্জিকা ধরে কোনো কথা বলছি না, নতুন সমস্যা, কিংবা পুরাতন সমস্যার নতুন

রূপের, নতুন ঢঙেরই উল্লেখ করছি। আমার বিশ্বাস যে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য-প্রয়াসে অন্ততঃপক্ষে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। তার সাহায্যে প্রয়াস সার্থক হয়েছে কি না আমি বিচার করছি না। নতুনত্ব তিনটি ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়।

প্রথম ব্যাপার হল মৌলিক বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যয়ের মধ্যে সত্য, শিব, অদ্বৈত, আনন্দ ও সুন্দরই প্রাথমিক। এগুলো ভারতবর্ষের সনাতন প্রত্যয়। সবগুলো মিলে যে ছক্‌টি তৈরী হয় সেটাই ভারতীয় ঐতিহ্য। সেখানে একটি প্রত্যয়ের সঙ্গে অন্যটির গরমিল সমন্বিত হয় ব্রহ্মের স্বরূপে, একমেবাদ্বিতীয়ম্‌—এই সংজ্ঞায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূলধন এই উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই উত্তরাধিকারকে গুদামজাত না করে, না জমিয়ে নতুন সুযোগে খাটান। সেজন্যে তাঁর নকশায় জীবন, মানুষ, গতি প্রভৃতি নতুন প্রত্যয়ের আমদানি দেখি। সংস্কৃত কিংবা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রত্যয়গুলো ছিল না বলছি না, কিন্তু অত জীবন্তভাবে নিশ্চয়ই নয়। চরৈবেতি সংজ্ঞার প্রভাব সংস্কৃত সাহিত্যে কোথায়? এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে মানুষের অপেক্ষা কেউ কি বড় নয়, তার উপরে কি কেউ নেই? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন? বৈষ্ণব সাহিত্যের গতি বাসকশয্যার দিকে, আর বৈষ্ণব দর্শনের গতি তো কেবল বৃন্দাবনের দিকে! সেখানে পৌঁছবার আনন্দ আছে, কিন্তু চলার জন্য চলার আনন্দ কৈ? সে আনন্দের সুর কীর্তনে ধ্বনিত, কিন্তু গতিরাগের গানের পদ্ধতি ভিন্ন, গায়ন ভিন্ন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ছকের মানুষও একটু কম অবিশেষ, যদিও সেটি বিদেশী সাহিত্যের রক্তমাংসে গড়া, অন্য জীব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, বিশেষ ব্যক্তি নয়।

এখন, কেবল নকশা থাকলেই সাহিত্য হয় না, যদিও তা ছাড়া কোনো রচনা সাহিত্য পদবাচ্য নয়। প্রত্যয়গুলো প্রতীতিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হল না। সত্য, আনন্দ, অদ্বৈত, জীবন, গতি, পুরুষ—যাকে তিনি পার্সন্যালিটি বলতেন, প্রভৃতিতে তাঁর নিজের বিশ্বাস ছিল অগাধ ও এতটাই সক্রিয় যে, অসত্য, নিরানন্দ, দ্বিধা, মৃত্যু,

স্থিতি ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতিকে এক এক সময় তিনি প্রায় দূরে ঠেলে রাখতেন। তার কারণও আছে: তিনি তাঁর প্রাথমিক বিশ্বাসগুলিকে অনির্বিশেষ, কালাতীত তাৎপর্য দিতেন আমাদেরই ঐতিহ্য অনুসারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আমরা তাই দেখি; সেখানে জরা, মৃত্যু, দুঃখ, দারিদ্র্য, যেসব ব্যাপার দেখে বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন, সেসবই আপেক্ষিক, অর্থাৎ চিরন্তনের উপকরণ কিংবা ব্যত্যয় হিসাবে সহনীয় হয়েছে। এখন পরম মূল্যে বিশ্বাস ও আপেক্ষিক মূল্যে বিশ্বাস এক ধরনের হতেই পারে না। প্রথম বিশ্বাসের ফলে সাহিত্যসৃষ্টি শান্ত, ব্যাপক, প্রসন্ন হয়; দ্বিতীয় বিশ্বাসের ফলে আসে চাঞ্চল্য, দ্বন্দ্ব, জটিলতা; যার চরম পরিণতি বস্তুতান্ত্রিক ট্রাজেডীতে, যেখানে একটি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ কিংবা প্রকৃতির ক্রমাগত সংঘাত হচ্ছে। প্রথম বিশ্বাসে গঠিত সাহিত্যের সুর মেলডি, মিড়প্রধান, তৈলধারাবৎ; তার বেধ (dimensions) সাধারণতঃ দু'টি, সাধারণ নিয়ম ও সাধারণ মানুষ, অন্য ভাষায়, জীবাত্মা আর পরমাত্মা। তাদেরই সম্বন্ধেই গতি, উন্নতি, যেটা প্রকৃতপক্ষে নিমজ্জন, কারণ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়, সাধারণ মানুষ সাধারণ নিয়ম মানতে বাধ্য ও মানাই তার ধর্ম। অতএব রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব অনেকেই অনুভব করেন। আপেক্ষিক মূল্যে বিশ্বাস বরাবরই অস্থির, বিচিত্র, হার্মনিসর্বস্ব বিলেতী সঙ্গীতের মতন মূল 'থীম্' থাকা সত্ত্বেও গতিশীল। আর যদি নতুন 'থীম্' এসে পড়ে—এবং বর্তমান সভ্যতার জটিলতা ফোটাবার জন্যে যেটা স্বাভাবিক —তবে স্থায়িভাব ব্যভিচারী ভাবের ভিড়ে হারিয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম প্রকার প্রত্যয়ের ফলে একঘেয়েমি, আর দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যয়ের ফলে অরাজকতার বিপদ রয়েছে। যিনি যতটা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন তিনি ততটাই সাবধানী আর্টিস্ট। তাই বলি, জোর-জবরদস্তি করে যেমন বিশ্বাস আনা যায় না, অর্থাৎ যেমন স্ব-ইচ্ছায় আধুনিক সাহিত্যিক হতে পারলেও বর্তমান সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তেমনই অধিক বিশ্বাসের ফলে সাহিত্য ধর্মের কোঠায় ওঠে ও বহু প্রতিজ্ঞার প্রতি আস্থার জন্য সাহিত্য সুবিধাবাদী প্রোপাগাণ্ডার স্তরে নেমে যায়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের দোষগুণ সবই চরম পরিমাণে প্রতীতির জন্য ; আর আধুনিক সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও অস্থিরতার জন্য দায়ী আপেক্ষিকতার উপর আস্থা।

অতএব সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকেও দু'টির মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচিত ; অর্থাৎ সেখানে গোটা-কয়েক বিষয় সাহিত্যের বহির্ভূত। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে অমন কোনো গণ্ডী নেই। রবীন্দ্রনাথ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি নিয়ে কবিতা লিখেছেন জানি, কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীর ধারেই তিনি স্বাভাবিক। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের ইঙ্গিত তবু মেলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে, বিশেষতঃ নভেল ও কখনও কখনও ছোট গল্পে. কিন্তু কবিতায় তাদের বালাই নেই। ভয় একটা মস্ত বড় ভাব, সেটাও বাতিল। কাম নাম মাত্র, তাও দেহগন্ধী নয়। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ খুঁত-খুঁতুনি নেই ; বস্তি, আঁস্তাকুড় থেকে শুরু করে প্রাসাদ পর্যন্ত, ঝি-চাকর কুষ্ঠরোগী থেকে ক্রোরপতি, বেনের লাভ থেকে পুঁজিপতির লোভ, প্রায় সবই আছে সেখানে। যদি খুঁত-খুঁতুনি থাকে তো কেবল আদর্শের প্রতি। এবং বর্ষাধারায় মন যদি ব্যাকুলও হয় তবে সে ব্যাকুলতাকে আদর্শ-বিলাস নাম দিয়ে বহিষ্কৃত করবার একটা ঝোঁক থাকে। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য এই প্রকার বিষয়ে সন্দিহান, একটু লজ্জিত।

এখন বিষয়ের যদি সীমা না থাকে তবে একটু ভিড় জমবেই। অথচ সাহিত্য বস্তুটার প্রকৃতিই হল নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীতে নানা বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে আঘাত করছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাই বলে যদি প্রত্যেককে প্রবেশাধিকার দিতে হয় তবে নিজের কোনো দাঁড়াবার স্থান থাকে না। যদিও ধরা যায় যে, সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন, তবু আরশি ধরতে তো হবে কাউকে, ক্যামেরার কাজ করবে কে! আরশির পিছনে পারার প্রলেপ থাকে, নয়তো প্রতিফলন হয় না ; আর ক্যামেরা বসাবার জন্য আলো ও স্থানের নির্বাচন চাই। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক এ সব কথা বোঝেন না বলছি না ; তিনিও বুদ্ধিমান। তাঁর বিচক্ষণতার নিদর্শন ইমেজ-ব্যবহারে। সাহিত্যের

সব রূপেই ইমেজ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কবিতাতেই বেশী। অনেক কবির মতে ইমেজই কবিতার স্বরূপ। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ইমেজ, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যেও ইমেজ—তবে নতুনত্ব কোথায় ?

নতুনত্ব অপ্রচলিত, অ-পূর্ব, এমন কি অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থাপনে। প্রচলিত ইমেজ যেন ঘষা পয়সা, বহু ব্যবহারের ফলে সেটি উত্তেজনার শক্তি খুইয়েছে, তাই মনকে জাগাবার জন্য অদ্ভুত ইমেজের প্রয়োজন। সূর্য, সমুদ্র, পর্বত, শ্বেত, অশ্বত্থ প্রভৃতি প্রতীক এখন শক্তিহীন। আজ চাই এটম্, প্রোটোন, কলের জল, চিমনি, ধূসরতা, মরসুমী ফুল, বনতুলসী, আশ শেওড়া, বুনো ফুল, শেওলা, মরুপ্রান্তরের ফণীমনসা ; আজ কোকিলের পরিবর্তে দাঁড়কাক, উটপাখি। হাঁ, তাতেও যদি না চলে, তবে বহু পুরাতন পৌরাণিক ইমেজের ব্যবহার অন্যায় হবে না, তবে নতুন ভঙ্গীতে তাকে দেখাতে হবে। অবশ্য তখন তারা হবে প্রতীক, সীম্বল, primordial images, archetypes, যেমন জেসন, ট্রয়লাস, মহাশ্বেতা, সবিতা ইত্যাদি। ইমেজ-সৃষ্টির পর তার ব্যবহার। রবীন্দ্র-সাহিত্যে কেবল পরিচিত ইমেজ আছে তাই নয়, তাদের বিন্যাসে একটা সহজ প্রাঞ্জল পরম্পরা থাকে। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এই প্রকার পারম্পর্য নেই। সেখানে একটি ইমেজ বিড়ালছানার মতন কখনও অন্যটির ঘাড়ে পড়ছে, কখনও এতই ঘেঁষাঘেঁষি রয়েছে যে, মধ্যে কোনোও ফাঁক নেই যেখানে কাব্যের বাক্য (poetic statement) ঢোকানো যায়। উদ্দেশ্য অবশ্য ঘনতা আনা ও ইমেজ-স্তূপের সাহায্যে কবিতার সাধারণ মেজাজটি তৈরি করা। কিন্তু ঠিক এইখানেই বিপদ ঘনায়। যদি কবিতার পিছনে কোনো স্থায়িভাব, কোনো basic passion না থাকে তবে কবিতা হয়ে যায় ইমেজের ভগ্নস্তূপ। কেবল তাই নয়, স্থায়িভাবেরও পিছনে একটা না একটা ভূয়োদর্শন থাকা চাই। ইমেজের দু'টি স্তর, প্রথমটির সম্বন্ধ মূল থীম্-এর সঙ্গে, কিন্তু যদি মূলটাই কোনো সাধারণ সত্যের প্রতীক কি প্রতিভূ না হয়, তবে সেই ইমেজগুচ্ছ-সমন্বিত কবিতার কোনো দম থাকে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের

কবিতাই একটি ইমেজ, তার অন্তর্গত ইমেজের সংখ্যা কম ও রঙও একটু ফিকে, প্রায় উপমা, রূপক, কখনও কখনও দৃষ্টান্তের সামিল। তবে সেখানে সাধারণ সত্যের সঙ্গে থীমের যোগ আছে, যদিও সে সাধারণ সত্যে বর্তমান মানুষের বুদ্ধি হয়তো সায় দেয় না। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে ইমেজের সংখ্যা বেশী, তবে পাকা হাতে তাদের বিন্যাস ঘন, রঙ গাঢ় হতে পারে, ও হয়। আর যখন হল না তখন কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেল। তাতেও দোষ ততটা হয় না যতটা হয় নিতান্ত ব্যক্তিগত ইমেজের ব্যবহারে। তখন আর সাহিত্যের কোনো সার্থকতা থাকে না, কবি তখন রোগী। এই প্রকার সাহিত্যে সাধারণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, সাধারণ বলে কোনো বস্তু কি প্রত্যয় এখানে নেই।

এই হল রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের মোটামুটি পার্থক্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্বাস, প্রত্যয়গ্রন্থি ভিন্ন; অথচ পাঠকদের মনে সেগুলো পূর্ব-পরিচিতির জন্য অনুজ্জ্বল হলেও বর্তমান। অন্যধারে জীবন নতুন ধারায় বইছে, সেখানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আসছে, নতুন সমস্যা, বিষয়, ব্যাপার উঠছে। তাদের জন্য নতুন প্রত্যয়, নতুন প্রতীক, নতুন ইমেজের প্রয়োজন। দু' ধরনের প্রতীকের মধ্যে বিরোধ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মুহূর্ত যখন কাল ছাড়া নয়, মানুষের ব্যবহারে যখন তার ইতিহাসটাই প্রাথমিক, অপরিত্যাজ্য সত্য, তখন বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই সমন্বয়ের কার্য চলবে। বাংলার বর্তমান সাহিত্যে সমন্বয় চলছে, যদিও আধুনিক সাহিত্যিকের রচনায় বিরোধের নিদর্শনই বেশী চোখে পড়ে।

মহারথীদের অবর্তমানে বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে হতাশ হবার কারণ দেখি না, যদিও কোনো কোনো সাহিত্যিকদের রচনা পড়লে অন্য ভাব মনে আসে। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কটাক্ষপাত করছি না, কিন্তু তাঁরা যত প্রয়োজনীয় কাজই করুন না কেন, তাঁদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাগুলো এখনও রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাগুলোকে উচ্ছেদ করে জনসাধারণের মনে অধিষ্ঠিত হতে পারছে না।

এবং কেন হচ্ছে না যদি তাঁরা আলোচনা করেন, তবে বোধ হয় সাহিত্যের অনেক উপকার হয়। প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা অন্য প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা-সমষ্টি স্থাপনা করতে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে প্রত্যয়ের চেয়ে প্রতীতি এবং প্রতিজ্ঞার চেয়ে প্রতিশ্রুতিটাই স্পষ্ট। আমার একান্ত বিশ্বাস রবীন্দ্রোত্তর বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের আদি প্রত্যয়, প্রতিজ্ঞা, বিষয়, ইমেজ-ব্যবহার ও অন্যান্য আঙ্গিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সময় এসেছে। বাংলা দেশের আছে তো ঐ সাহিত্য, তাও যদি দৈনিক সংবাদে পরিণত হয় তবে থাকবে কি বুঝি না।

॥ সাহিত্যপত্র ॥ ॥ শ্রাবণ ॥ ১৩৫৫ ॥

গদ্য-কবিতা

গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে 'কবি'র মন্তব্যের সাহায্যে অনুভূতি বাড়ে, রুচিও সৃষ্টি হয়, সীমানা নির্ধারিত হয় না নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ প্রকার শ্রেণীবিভাগ কি জাতিবিচার অসম্ভব। এখনও পর্যন্ত কোনো আলোচনা-তত্ত্বের পুস্তকে কবিতা ও গদ্যের সীমানা ঠিক হয়েছে জানেন কি? না কেউ তাই পড়ে গদ্যের ও পদ্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে? যে করে তার কোনো কিছু না পড়াই ভালো। সীমানা নিয়ে মাতামাতি academic mind-এর চিহ্ন, অর্থাৎ যারা কাঁচামালের ব্যবসায়ী তাঁদেরই। যাঁরা সাহিত্য-রসিক তাঁরা অবশ্য সীমানা নেই বলবেন না, কিন্তু রুচি ও অনুভূতির উপরই জোর দেবেন। কোনো গুহ্য ধর্মের ইঙ্গিত করছি না। সাহিত্যিকের কেন ভালো লাগল তাকে বলতেই হবে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সে ব্যাখ্যা উপভোগের পরে। পরে বলেই ব্যাখ্যায় ভুল হওয়া সম্ভব। ব্যাপারটা rationalisation-এর সমপর্যায়ে, সমস্তরে নয়, derivative বলতে পারেন। সেজন্য গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে আমার মতামতের ঐকান্তিক সততা সম্বন্ধে আমি নিজেই সন্দিহান। আপনারা নিজে চিন্তা করে দেখুন। আমার আপাতত যা মনে হচ্ছে তাই লিখছি। চিঠি প্রবন্ধ নয় তাও মনে রাখবেন।

প্রথমেই ওঠে দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী দুই প্রকারের। এক হল বাইরের সত্তাকে

স্বীকার করা, আর এক নিজেকেই প্রামাণ্য ভাবা। স্বীকারের intensity অনুসারে প্রকাশ ভিন্ন হয়। পুরোপুরি অঙ্গীকারের চূড়ান্ত অবস্থা (তথাকথিত) বৈজ্ঞানিকের তাকে বাদ দেওয়াই ভালো, কারণ গদ্যকবি আর যাই হোক তিনি বৈজ্ঞানিক নন, কারণ গদ্যকবি এক ধরনেরই কবি। অন্যদিকে মাত্র আত্মোপলব্ধিকে বরণ করেন হয় যোগী, না হয় পাগল। চিত্রে ও ভাস্কর্যে তার দৃষ্টান্ত dadaism, সাহিত্যে জয়েসের ইদানীংকার রচনা এবং শ্রীমতী স্টাইনের কবিতা। ভাষা যদি একাধিকের সম্পত্তি হয়, তবে যোগী পাগল কিংবা এই সাহিত্যিক সম্প্রদায় ভাষার অপমান করে থাকেন। অতএব আমরা মধ্য পথেরই পথিক হব। নচেৎ গদ্য কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বুঝব না। এখানে অনুপাতের কথা ওঠে।

কবি মাত্রেই যে ঘরমুখো ও অন্তর্মুখী মানতেই হবে, সে বাহিরকে নিজের বাড়ির অঙ্গন ভাবে। নিজেকেই সে সমগ্র বিশ্বের axis বিবেচনা করে,—রোম্যান্টিক কবিরাই অবশ্য বেশি। বাঙ্গালীরা কেবল কেন, আজকালকার ইংরেজরাও এই রোম্যান্টিক কবিতাকেই একমাত্র কবিতা ভেবেছে বলেই তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করছে। ইংরেজী সাহিত্যে সে প্রতিক্রিয়ার ফল এলিয়ট প্রভৃতির কঠিন কটমট কবিতায়। বাঙলা সাহিত্যে সে বিদ্রোহের রূপ গদ্য-কবিতায়। পার্থক্য এই—এলিয়ট বিদ্রোহের ঝোঁকে পদ্যের মিল পদ্য থেকে নির্বাসন তো করেননি, বরঞ্চ নাটকে পদ্যরূপ দিতে চেয়েছেন—হয়তো সার্থকও হয়েছে। আমরা মিল পর্যন্ত ত্যাগ করেছি পদ্য থেকে এবং কবি নিজেই এই বিদ্রোহের নেতা। কিন্তু কোনো বিদ্রোহ নঙর্থক নয়। তার সদর্থ হল আপন-পরের, ঘর-বাহিরের, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতার সম্বন্ধের, আরও খানিকটা পর, বাহির ও বস্তুসত্তা ঢুকিয়ে দেওয়া। অথচ যেন সম্পূর্ণ ব্যক্তি-সম্পর্ক রহিত না হয়, কারণ তা হলে কবি বৈজ্ঞানিকের কোঠায় পড়বে। একবার ঐ সম্বন্ধে বস্তুসত্তার জোর বাড়লে আত্মকেন্দ্রিক সব মনোভাবগুলো দমে যাবে—অর্থাৎ নদীকে তখন আর নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের পটভূমি বলে মনে হবে না,

চাঁদ আর তখন প্রেমিকের উদ্দেশ্য সাধনের পর অস্ত যাবে না, সেই সঙ্গে অকিঞ্চনেরও খাতির বাড়বে। এই আলোচনা থেকে একটি তথ্য বেরুল—anti-romantic মনোভাব। বস্তুর প্রতি কোনো রোম্যান্টিক কবির attitude অপেক্ষা গদ্যকবির attitude হবে বেশী সশ্রদ্ধ। আপেক্ষিক নিস্কামতা গদ্যকবির রচনায় থাকা চাই।

তবু, ক্ল্যাসিকাল কবিতায় মিল আছে কেন, প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়েই গেল। গদ্যকবি কি বাথটবের নোংরা জলের সঙ্গে খোকাকেও নর্দমায় ফেলে দিয়েছে? অনেক সময়ে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সব সময়ে নয়। যেখানে গদ্য-কবিতা স্বকীয় মহিমায় সম্পুর্ণ, সেখানে ক্ল্যাসিকাল কবিতার সঙ্গে সেটি বস্তুসত্তার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধায় সমগোত্রের নিশ্চয়ই! অবশ্য এই ধরনের মিলযুক্ত কবিতা আমাদের সাহিত্যে নিতান্ত কম (এক আছে ছড়া)। একে পরাধীন জাতির আত্মসর্বস্বতা ও কর্মহীনতা, তার উপর উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব। তবু আমরা ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতি পড়েছি, তাই ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল মনোভাব কি ছিল কল্পনা করতে পারি। আধুনিক বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিত, পরিচয়ের মাত্রা জোর মেঘদূতের সঙ্গে, যে মেঘদূত সংস্কৃত সাহিত্যের মণি হলেও তার দেহ নয়, প্রাণও নয়। ক্ল্যাসিকাল মনোভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত মহাভারত। যদি আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদও পড়ে থাকি তবু আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। এইটুকু বলবার উদ্দেশ্য যে, প্রতিক্রিয়ার বশে মিল না ছাড়লেও আমাদের চলতো, যদি আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের একাংশের প্রবাহে ভাসতে পারতাম। সংস্কৃত ভাষায় এত বিস্তর শব্দ আছে, যার প্রয়োগে কবির নতুন মনোভাব বেশ ফুটে উঠত এবং সেই সঙ্গে মিল ত্যাগ করবার প্রয়োজনও হত না। সুধীন্দ্র দত্তকে সংস্কৃতজ্ঞ কেউ বলবে না, তার জ্ঞান ও প্রবৃত্তি নিতান্ত আধুনিক, তবু সে মিল ছাড়ল না, বিশেষ্য-বিশেষণের ঘষা পয়সা সে-ও চালায় না, কিন্তু ভীষণ শক্ত অর্থাৎ অপরিচিত কথার প্রয়োগে সে দু'কূল রক্ষা

করে, কথা অবশ্য সংস্কৃত ভাষার। তার বস্তুসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভঙ্গীটি বিচারযোগ্য নিশ্চয়ই।

আধুনিক গদ্যকবিদের মিল ত্যাগ করার একটি কারণ ধরা পড়ল সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রুব পদ্ধতির সঙ্গে অপরিচয়, শক্ত অপ্রচলিত কথার প্রয়োগে ভয়। সেই ভয় নানাপ্রকার ··· লোকে বুঝবে না, রসোপভোগে বাধা পড়বে, গণ্ডিবদ্ধ সাহিত্য হবে ইত্যাদি। অতএব, হুইটম্যান, লরেন্স? তারও প্রয়োজন নেই প্রমাণ হয় প্রমথ চৌধুরীর সনেটে। সেগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে লেখা হতে পারত। প্রমথবাবুর মনে কোনো ··· রোমান্স নেই—তিনি হয়তো গদ্যকবি হতে পারতেন।

কারণটি খুব গুরুগম্ভীর ধরনের মনে হবে না জানি। তাই এমন একটি অন্য কারণ বলছি যাতে আপনাদের প্রতীতি জন্মাবে সহজে। কবিতায় যখন বাক্যসম্বন্ধ করা হয় তখন একটা-আধটা বিশেষণ থাকেই থাকে। বিশেষণের এক প্রকার মনের (ও বয়সের) উপর এমন প্রাদুর্ভাব যে, তার জোরেই অর্থ সৃষ্টি হয়—যদি অর্থবাহী মিল সম্ভব হয় তবে বহুত আচ্ছা, নচেৎ বিপদ বাধে। বিশেষণ আমরা বেশী সেধেছি—উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক বিশেষণ আমাদের করতলগত, আঙুলের ডগায় কলমের মুখ দিয়ে সহজেই বেরোয়। মিল খুঁজতে, রবীন্দ্রনাথের পর, বেশী কষ্ট হয় না। তাই এত যুবক এত সহজে অমন চলনসই কবিতা লেখে। কিন্তু বস্তুসত্তার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা জানাতে গেলে বিশেষ্যের উপর এবং নতুন সম্বন্ধের প্রতি অধিক শ্রদ্ধার জন্য ক্রিয়া ও অব্যয়ের উপর বেশী ঝোঁক দিতে হবে। আমাদের অভ্যাসে বিশেষ্য কম, ভাষায় ক্রিয়া কম—সবই অসমাপিকা, মোহন-বাগানের বিপক্ষের গোলের সামনে খেলার মতন অব্যয়গুলোও নড়বড়ে। অন্যধারে লোকে বুঝবে না তাই সহজ কথার ব্যবহার, জানি না তাই পুরাতন ঘষা পয়সার চালান করতে বাধ্যবাধকতা আসে। মনে কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে, ঘষা পয়সা আর চালানো উচিত নয়। দু'টোয় বিরোধ বাধে—তার নিষ্পত্তি করা হয় মিল করে। বিশেষণও সেই

সঙ্গে ত্যাগ করতে হয়। যদি কোনো গভকবি বিশেষণের মোহে আচ্ছন্ন থাকেন দেখি, তবে তাঁর মামুলি কবি হওয়াই ভালো ছিল মনে হয়। এটা হল পরীক্ষার দ্বিতীয় compulsory প্রশ্নের উত্তর। বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া নিয়েই বাক্য, অন্ততঃ অধিকাংশ কবির বেলায় তাই। অল্পসংখ্যক লেখকের রচনায় অর্থের তাগিদে বাক্য রচিত হয়। বিশেষণের চাপে অর্থভ্রষ্ট হয় না তাঁদের। সাধারণতঃ অর্থেও নতুনত্ব থাকে না। কিন্তু যাঁদের অর্থ নতুন, অথচ বিশেষণ পাচ্ছেন না, তখনই তাঁদের গভ্য-কবিতা লেখার প্রবৃত্তি সার্থক।

সেইজন্যই লিখেছিলাম, গভ্য-কবিতাকে কেবল নতুন আঙ্গিক হিসাবে ধরলে চলবে না। তার অন্তরের মনোভাব ও অর্থের নতুনত্ব— অর্থাৎ তার content-এর তাগিদে গভ্য-কবিতাই inevitable কি না দেখতে হবে। ক্ল্যাসিকাল কবিতা মামুলী হলে বাজে গভ্য হয়, আর আত্মসর্বস্ব কবিতায় গা গুলিয়ে ওঠে—ডু'এর মাঝখানে গভ্যকবি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। অন্যধারে কিন্তু বিশেষণের খাভ্যাভাবে, মামুলী মনোভাবের আবহাওয়ার অনভ্যাসে মধ্যস্থিত বিষয় শুকিয়ে যায়— তাই তাকে দেখায় কঠিন, রুক্ষ, ascetic ইত্যাদি।

॥ বনফুল ॥ ॥ মহালয়া ১৩৫৬ ॥

আষাঢ়ে

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে কবি কালিদাসের নামোচ্চারণ করে আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কবি কালিদাস সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু পড়িনি, নোটবুকে যা লেখা আছে তা ছাড়া, আর সে সব কথা এখন মনেও নেই। তাঁর সম্বন্ধে একটা কানাঘুষো শুনেছি যে, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, কারণ না কি মেঘদূতে বর্ষার যে বর্ণনা আছে, সেটি বাংলা দেশের বর্ষার বেলায়ই খাটে। খবরটি কতদূর সত্য তাও জানি না, তবে আষাঢ়ে ক্লাবের কোনো সভায় যদি আষাঢ়ে গল্পের কোনো স্থান থাকে, তা হলে কালিদাসের কবিতা আলোচনা না করে বর্তমান জগতে বাঙ্গালী ও বাঙলা কবিতার স্থান নিয়ে গল্পগুজব করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়। হাঁ, আর একটি কথা মেঘদূতের নাম শুনলেই মনে পড়ে। রুক্ষ বৈশাখের পর অঝোরঝরে বারিপাত হচ্ছে, শুষ্কা ধরণী মৃতসঞ্জীবনীসুধা পান করে নবজীবন লাভ করল, হৃদয় রসাল হল, আর জেগে উঠল বিরহ, যে বিরহে তীব্রতা আছে, নৈরাশ্য নেই। কোথায় রইলেন কবি কালিদাস, কোথা রইল মেঘদূত, মনে পড়ল বাঙ্গালীর নিরাশ জীবন, সরস হৃদয়, পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা। অধ্যাপকীয় মনোভাবের রীতিই সৃষ্টিছাড়া।

আজ বাঙ্গালীর মনে নিরাশা আশ্রয় করেছে, সার্থকতার সম্পর্কে সে মন বিরহাতুর। আমাদের কর্মজীবন, ভয়-ভাবনা, সাহিত্য

প্রভৃতি দেখলে অন্ততঃ তাই মনে হয়। অথচ, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও বাংলা দেশ ভারতবর্ষকে চালাতো। What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow. তখন বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও অগ্রস্থতিই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এই অল্পদিনে বাঙ্গালীর কি হল? প্রায়ই শুনতে পাই যে বাঙ্গালী সব দিকেই হটে যাচ্ছে, কি পরীক্ষায়, কি নেতৃত্বে, কি স্বাস্থ্যে, লোকে বলছে বিদ্যা-বুদ্ধিতেও আমাদের স্থান প্রথম বেঞ্চে নয়, মাদ্রাজী মারহাট্টির পিছনে। যাঁদের কাছে এই খবর শুনেছি তাঁরা কেবল ভিন্ন প্রদেশের অবাঙ্গালী নন। বাঙ্গালীদের মধ্যে কেবল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেই দোষ দিলে চলে না। প্রায় প্রত্যেক বয়োবৃদ্ধেরই এই মত। অবশ্য এই রটনার মধ্যে যেমন একধারে হিংসা রয়েছে তেমনি অন্যধারে লুকানো রয়েছে আকুল দেশপ্রেম, অধীর আদর্শবাদ, বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তীব্র ব্যাকুলতা। কিন্তু আজ আষাঢ়ের প্রথম দিবস, তাই মেঘদূতের পরিবর্তে ভগ্নদূতের আবাহন করতে মন চাইছে না—এমন কি ভগ্নদূতের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত স্বীকার করতে কুণ্ঠা হচ্ছে। নির্যাতিত ভবঘুরে ইহুদীদের কাছেও ব্যাপটিস্ট জনের স্থান জেরেমিয়ার বহু উচ্চে ছিল। কবিতা-হিসাবে উত্তরমেঘের স্থান হয়তো পূর্বমেঘের নীচে হতে পারে—কিন্তু আজ আমাদের পক্ষে নয়। আজ আশার বাণীর প্রয়োজন রয়েছে। আজ বয়োবৃদ্ধের কাছে শুনে শুনে যুবকদের মনে ধারণা হয়েছে যে আমরা অপদার্থ, কেন না আমরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করতে পারছি না। কিন্তু হয়তো বাংলা দেশের এমনি কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুন সিভিল সারভেণ্টরা সাহিত্যযশঃপ্রার্থী হয়ে ওঠেন, যার দরুণ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীরাও সাহিত্যিক পত্রিকা-প্রকাশে সাহায্য করেন। নিরাশা যুবকদের বেশীক্ষণ ধাতে বসে না, তবে যদি কর্তারা তাঁদের কর্তব্যসাধনে আরো বেশী গম্ভীরভাবে তৎপর হন, তা হলে যুবক-সম্প্রদায়ের মনে নিরাশার কুয়াশা জমে উঠবে। উন্নত ও স্বাধীন জাতির যুবক-মনে এ কুয়াশা স্থান পায় না, পেলেও ক্ষতি হয় না, দার্জিলিঙের কুয়াসায় 'ওজোন' আছে। এমন কি নতুন জাতির

অনাবিষ্কৃত মনে এই কুয়াশার সার্থকতা থাকতে পারে—সামুদ্রিক কুয়াশা ভেদ করার মধ্যে অনাগতের আহ্বান আছে। কিন্তু আমরা স্বাধীন নই, উন্নতির সর্বোচ্চশিখরে আমরা উঠিনি, আমাদের অনধিগত ভবিষ্যার্ণবও সুদূর বিস্তৃত নয়। অতএব, আমাদের মনে নিরাশার কুয়াশা ম্যালেরিয়ার নিয়াজ্‌মার মতনই ক্ষতিকর।

নিরাশার একটিমাত্র ক্ষতি উল্লেখ করছি। অনেকে বোধ হয় কুয়াশার রঙ-বাহারকেই কবিতার প্রাণবস্তু বিবেচনা করেন। তাঁরা ভাবেন আশা-নিরাশার দোলাতে না তুললে কবিতার ছন্দজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁদের বোধ হয় ধারণা এই যে, জীবনকে পাঠশালায় পরিণত না করলে জীবের দ্বারা কোনো মহৎ কার্যই সাধিত হয় না। পাঠশালাতে পণ্ডিতমশাই ভয় দেখিয়ে পড়া নিতেন। আজকালকার পণ্ডিতেরা ভয় দেখিয়ে জাতকে বড় করতে চান। ভয় দেখিয়ে ভালো কাজ করানো যায় না, যে কাজ হয় সেটি খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। আজকালকার তরুণ-তরুণী প্রায় সকলেই কবিতা লেখেন—এত বেশী লেখেন যেন মনে হয় আচার্যদেবের, অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও বাঙ্গালী বয়োবৃদ্ধের তীব্র প্রতিবাদেই তাঁরা লিখে যাচ্ছেন, যেন প্রমাণ করতেই ব্যস্ত যে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সিভিল সার্ভিস, অ্যাকাউন্টস্‌ পরীক্ষায় হটে গেলেও ভাবরাজ্যে, বিশেষতঃ কবিতায় আমরা এখনও নিখিল ভারতের অগ্রণী! এই কবিত্বশক্তির প্রকোপবৃদ্ধির মধ্যে একটা কোথাও যেন ঝাঁজ আছে। বাইরের প্রতিকূল অবস্থার বিপক্ষে দাঁড়াবার সাহস ও বীর্যের সঙ্গে এ ঝাঁজের কোনো মিল নেই। এ যেন মনের সঙ্গে মতের লড়াই—এ যেন আত্মবিশ্বাসের অভাবের দৈন্য, যে দৈন্যের জন্য মেজাজ-মাফিক কেউ বা দুঃখবাদী হয়, কেউ বা চীৎকার করে আদর্শবাদ ও তারুণ্যের গুণগান প্রচার করে। আজকালকার কবিতা অখাদ্য বলছি না, বরঞ্চ শব্দসম্পদ ও ছন্দের বৈচিত্র্যে এখনকার কবিতা পূর্বের কবিতার চেয়ে বেশী মনোহারী। তবু অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, মাত্র কয়েকজন কবিরই নিজস্ব বস্তু আছে। তাঁদের কথার ঢঙও একই ধরনের, দুঃখবাদের। তাও আবার সে দুঃখবাদ গভীর নয়—

এই আমার দুঃখ। হবে কি করে? যুবকের মনে দুঃখবাদ কি নৈরাশ্য জাঁতার মত বসতে পারে, না—শেওলার মত ভাসতে থাকে। যে নিরাশায় যুবক-মন তলিয়ে যায় সে নিরাশা ক্ষণিকের। নিরাশা অবাস্তব নয়, খাঁটি সত্য—কিন্তু প্রিয়ার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মুহূর্তেই বিরহী যক্ষ যে ভাবোদ্‌গার করেননি, তার প্রমাণ আছে মেঘদূতের প্রত্যেক ছত্রে। বাস্তবকে খুন করবার পর তার কালো রক্ত দিয়ে ভালো কবিতা লেখা হয়—ক্ষণিকের কবিতা প্রলাপ মাত্র, যেমন শ্মশান-বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী। এই প্রকার মিথ্যা নিরাশাকে আশ্রয় করে যে কবিতা রূপ নেয়, সে কবিতা শান্ত ও গভীর হয় না। শান্তরসের উদ্ভাবনা না করতে পারলে উচ্চশ্রেণীর কবিতা লেখা অসম্ভব। মানসিক ঝড়ের আবর্তে পড়ে অনেকে কবিতা লিখেছেন শোনা যায়, কিন্তু ঝড়ের মধ্যে একটি শান্ত কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হলে কবিতা সম্ভব—এই হল খাঁটি খবর। শান্তরসের উদ্বোধনে রসবস্তু যে সত্তা, যে অস্তিত্বটুকু অর্জন ও অধিকার করে তার আবেদন সর্বদেশের, সর্বকালের সার্বজনীন। নিরাশার কবিতা সমশ্রেণীর নয়। একটি পুরাতন ধ্রুপদ শুনলে রস-পিপাসার যে তৃপ্তিসাধন হয় আমি তারই ইঙ্গিত করছি। আপনাদের বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়মে একটি পার্বতী মূর্তি আছে—তার মধ্যে যে অচঞ্চলতা, যে আত্মসমাহিত ভাব লক্ষিত হয় আমি তারই ইঙ্গিত করছি। এর বেশী আমি বোঝাতে পারব না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই—আজকালকার কবি—ভাষা ও ভাবের দিক থেকে অনেক সুবিধা সত্ত্বেও ধীর ও শান্তভাবে কবিতা লিখতে পারছেন না—প্রায় সব কবিতাতেই অধৈর্য, অশান্তি ও অসংযমের লক্ষণ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কবির অন্তরে কোথায় গলদ আছে, দ্বন্দ্ব আছে। সবচেয়ে বড় গলদ হল আত্মবিশ্বাসের অভাব, সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব হল যুবক-সুলভ আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব। আমাদের নেতৃবর্গ আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছেন না, আমরা উচ্ছন্ন যাচ্ছি এই বলে নিরাশই করছেন। আজ বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের প্রয়োজন বড়ই অনুভব করি।

আমি কবিতার দৃষ্টান্ত ইচ্ছা করেই দিয়েছি। অবাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করুন বাংলার বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর পাবেন—বাংলার সাহিত্য, প্রধানতঃ কবিতা, তাঁদের কাছে কবিতার অর্থ ভাববিলাস। মহাত্মাজী সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী ব্যক্তি, কিন্তু সত্য কথা তিনি বলেন অতি প্রিয়ভাবে। তিনি বলেছেন, "আমি বাংলার ভাব-প্রাচুর্য ও কবিতার ভক্ত।" মহাত্মাজীর মতপ্রকাশে যাঁদের আত্মপ্রসাদ আসে তাঁদের আসুক, কিন্তু আমার আসে না। তিনি বাঙ্গালী বলতে হয়তো তাঁর বন্ধু রবীন্দ্রনাথকেই বোঝেন। অন্য বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি যাঁদের জানেন তাঁরা সকলেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেই যোগদানের মধ্যে তর্কবুদ্ধি অপেক্ষা ভাব-ভক্তির অংশই বেশী ছিল বললে বোধ হয় তাঁদের প্রতি অন্যায় বিচার করা হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তাঁর কবি-জীবনে ও জীবনের অন্য দিকে ভাব ভিন্ন অন্য গুণেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সেই সব গুণের আধার বলেই, সেই সব গুণের সমন্বয় করতে পেরেছেন বলেই তিনি প্রকৃতপক্ষে অত বড়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে যাঁরা ভাবের প্রাধান্য দেখেছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ভালো বোঝেননি। যে বৈরাগ্যসাধনে তিনি মুক্তি চাননি সে বৈরাগ্য কেবল নঙর্থক; তিনি জীবনের সমগ্র উত্তম জিনিসকে সাধনার দ্বারা লাভ করেছেন ও আমাদেরও লাভ করতে বলেছেন; তবে সে সাধনার ফলে আয়াসের গলদ্‌ঘর্ম ভাবটি থাকবে না, থাকবে মাত্র অধিকারের অভিজাত সহজ স্ফূর্তি, এই হল তাঁর প্রাণের কথা। রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দেওয়া যাক। পুরাতন কালের বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের বাঙ্গালীদের কথাও ছেড়ে দিলাম। মহাত্মাজীর অবিদিত নেই যে, বাংলা দেশে গত একশ' বৎসরের মধ্যে রাজা রামমোহন. বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, অশ্বিনীকুমার, আশুতোষ জন্মেছেন, যাঁদের প্রকৃতিতে ভাবের অত্যাচার সুস্পষ্ট নয়। তাঁদের প্রত্যেকের প্রকৃতিতে আমি ভাবের সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে কর্মপ্রবৃত্তির যোগাযোগ দেখি এবং সেই যোগাযোগের ফলে তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যক্তি, পুরুষ, ইংরেজীতে যাকে বলে persons, individuals নয়। অথচ

তাঁরা পুরোপুরি বাঙ্গালী। আমি শেষের দু'জনকে দেখেছি, দু' চারবার তাঁদের সঙ্গে কথাও কয়েছি, বিবেকানন্দের ভাববিলাস ও মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া সম্বন্ধে কি মত ছিল অশ্বিনীকুমারের মুখে শুনেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজের দৃষ্টান্ত প্রবাদ বাক্য হয়ে উঠেছে। আর রামমোহন? তাঁর মতন প্রাণবান পুরুষ ক'টা মেলে। তন্ত্রের শক্তি, বেদান্তের সাহস ও শুদ্ধ বুদ্ধি, ইস্‌লামের তেজ, খৃষ্টানের করুণা ও ভক্তি—সব ধারা এই মহাসাগরে মিশেছিল। তাঁদের কথাও বাদ দেওয়া যাক। মহাত্মাজী নিশ্চয়ই জানেন যে, অসহযোগ-নীতি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ না করেও, গভর্নমেণ্টের চাকরি করেও বাংলা দেশে শহরে শহরে অনেক দেশপ্রেমিক নীরবে কাজ করে এসেছেন, এখনও করছেন। এ সংবাদ অবাঙ্গালীর পক্ষে জানা তত সহজ নয়। মহাত্মাজী মহামানব, তাঁর কাছে কিছুই অবিদিত নয়। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, তবে সংবাদ হিসাবে। যে জানার ফলে সমগ্র জাতির, বিশেষতঃ আমাদের মত বর্ণসঙ্কর জাতির, বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার সম্ভব হয়, সে জানা বাস্তবিক পক্ষে তাঁর কাজ নয়। মহাত্মাজীর মধ্যে প্রাদেশিক দ্বেষ-হিংসা তিলমাত্র নেই শুনেছি, অন্যান্য অবাঙ্গালীদের মধ্যে অল্পবিস্তর আছে। নানা কারণে সেই দ্বেষ-হিংসা উৎপন্ন হয়েছে, বোধ হয় প্রধান কারণ হল আমাদের পরিশীলনের সম্পূর্ণ রূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। অন্য প্রদেশের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আমার যা ধারণা হয়েছে তাই বলছি। আমাদের বিপক্ষে তাঁদের প্রধান আপত্তি ওঠে আমাদের ভাষাপ্রীতি নিয়ে। তাঁরা বলেন, "আপনারা আমাদের ভাষা গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ দলের মধ্যে বাঙ্গালী না থাকেন ততক্ষণ ভাঙা হিন্দী কি উর্দুতে কাজ চালান, কিন্তু যেই একজন বাঙ্গালী এলেন, অমনি আমাদের অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়ে বাঙলাতে তাঁর সঙ্গে ভাববিনিময় শুরু হল।" আপত্তির জবাব দিয়েছি—"অভ্যাসটির উৎপত্তি আমাদের ভাষাপ্রীতিতে, আমাদের সাহিত্য অনেক অগ্রসর হয়েছে, আমাদের বক্তব্য মাতৃভাষায় যতটা প্রকাশিত হয়, অন্য প্রাদেশিক ভাষায় ততটা হয় না।" তর্ক চলে অনেকক্ষণ, তাঁদের

মধ্যে যাঁরা মাথাঠাণ্ডা লোক তাঁরা অন্য আপত্তি তোলেন, ভাষাপ্রীতি থেকে আমাদের ভাষার ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস থেকে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য, তাই থেকে আমাদের চরিত্রালোচনা শুরু হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই এক সিদ্ধান্ত—বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ। নিয়তির মতনই সিদ্ধান্তটি স্থির ও অবিচল—আমরা বড় ভাবপ্রবণ—প্রমাণ আমাদের সাহিত্য—বিশেষতঃ কবিতা। আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের দৌড় অতটাই।

বিদেশী রাজ-কর্মচারীদের মধ্যেও এই ধারণা। বাঙ্গালীর প্রকৃতি অত্যন্ত অশান্ত, বাঙ্গালীকে চালানো, বাংলা শাসন করা ভারি শক্ত, কারণ বাঙ্গালী নিতান্ত ভাবপ্রবণ। তাঁরা অবশ্য সাহিত্য ছাড়া অন্য প্রমাণও দিয়ে থাকেন। একাধিক ইংরেজ রাজ-কর্মচারী ও অধ্যাপকের কাছে এই ধরনের মন্তব্য শুনেছি। এমন কি রোনাল্ডসে সাহেবের মত ছিল তাই।

সব চেয়ে মজার কথা হল এই যে, আমাদের নিজেদের মনেও ঐ ধারণা গড়ে উঠছে। শ্রীঅরবিন্দের পর স্বদেশী-বিদেশী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বিপিনচন্দ্র পালকে বাংলার জাতীয়তাবোধের প্রধান দার্শনিক ব্যাখ্যাকার ভেবে এসেছেন। তাঁরই কল্যাণে আমরা বুঝেছি যে, বাংলার বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলী। তাঁর ব্যাখ্যার প্রচার-কার্যে সহায়ক হয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন, তাঁর সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে মতিলালবাবু নিতান্ত পরিচিত কারণে এই মতেরই প্রচার করেন। তাই আজ আমাদের বিশ্বাস, বাংলার কৃষ্টি আর বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য এক বস্তু।

এই মতটি সম্পূর্ণ ভুল। যদিও স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ সাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুবই ব্যাপক। সমাজের অন্তরে কোন প্রভাবের কতটুকু ব্যাপ্তি মাপা না গেলেও বলা চলে যে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পৌরাণিক হিন্দুয়ানি এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারই বেশী, যদিও খুব কম বৈষ্ণবই দেখেছি যাঁরা পৌরাণিক হিন্দুয়ানির শাক্ত-অংশটুকুর সঙ্গে অন্য অংশগুলি বাদ

দেন। আদমশুমারিতে খাঁটি বৈষ্ণবদের সংখ্যা দু' লক্ষের কিছু বেশী। চলতি হিন্দুয়ানির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের ছাপও যথেষ্ট। তা ছাড়া ইস্‌লাম ও খৃষ্টান সভ্যতার বিপক্ষে আত্মরক্ষা ও তাদের সঙ্গে আদান-প্রদানে হিন্দু-সমাজে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে—যার ফলে হিন্দু-সমাজ বর্তমান আকার ধারণ করেছে। আমার বক্তব্য হল এই—আদান-প্রদানেই বাংলার বৈশিষ্ট্য, ভাবের উচ্ছ্বাসে নয়। ভাবের আতিশয্যে আদান-প্রদান সম্ভব হয় না, ভাবের জোরে হয় পুরোপুরি গ্রহণ, না হয় পুরোপুরি ত্যাগ। সামঞ্জস্য-বিধান, সমযোগ-সাধন, কি কালানু-বর্তিতার জন্য ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রয়োজন। হয়তো বুদ্ধির অর্থই তাই।

বাঙ্গালী কেবল হিন্দু নয়। বাংলার একটি মুসলমান-সমাজও আছে। জন কয়েক মুসলমানের রচিত উৎকৃষ্ট মরমী কবিতার দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হয় যে, বাঙ্গালী মুসলমানও ভাবপ্রবণ। মরমী (mystic) ভাবের সঙ্গে ভাবালুতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয় সে কথা না হয় নাই তুললাম। কিন্তু মরমী কবিতা দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজের বৈশিষ্ট্য বিচার করা উচিত নয়। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে ধর্মের যে নতুন প্রবাহ বইছে তার মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলনই উল্লেখযোগ্য। সে-আন্দোলনে ভাবালুতা নেই। ইস্‌লাম ধর্মের অশুদ্ধতা বর্জন করে আদিম অকৃত্রিম শুদ্ধতার প্রতি মনঃসংযোগ করাকে কর্মপ্রবৃত্তি বলাই ভালো। এর তুলনা দেওয়া চলে ইগনেশিয়াস্ লয়লার প্রবর্তিত আন্দোলনের সঙ্গে, আদিশূর, রঘুনন্দন, দেবীবরের সমাজ-বন্ধনের সঙ্গে। সমাজশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধির কৃচ্ছ্রসাধনই বর্তমান থাকে। কর্মপ্রবৃত্তিকে ক্রোচের ভাষায় moral sense বলা চলে। ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে মুসলমান-সমাজে চারুকলার প্রসারলাভ হয়নি, কিন্তু কর্মপ্রবৃত্তি উন্মুখ হয়েছে নিশ্চয়ই। অবশ্য আমি বাইরে থেকে এই সন্দেহ পোষণ করি।

সন্দেহ সমর্থিত হয় অন্য উপায়ে। বাংলা দেশে মুসলমান জাগরণের ইতিহাস পড়লে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, কেবল চাকরি ও ভোট পাবার আশাতেই তাঁরা হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন।

কোনো সমাজকে অতটা অদূরদর্শী ভাবতে পারি না—জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাকুরে জাতি হবার দুরাশাকে অদূরদর্শিতা ছাড়া আর কি বলব? মাত্র ভোট পাবার জন্য এই প্রকার ব্যগ্রতাও বুঝি না—যে সমাজে এই প্রকার ব্যগ্রতা সম্ভব সে সমাজে পলিটিক্যাল সেন্স খুবই জাগ্রত বলতে হবে। মুসলমান-সমাজে এই ধর্ম্মবিরহিত পলিটিক্যাল সেন্স জাগ্রত হয়নি, হওয়া উচিত মুসলমান নেতারা বিশ্বাস করেন না। অথচ তাঁদের জাগরণকে মানতেই হবে। গোটাকয়েক মরমী কবিতা, যাত্রাসঙ্গীত, আউল-বাউল, ফকিরি গানের আওয়াজে তাঁরা জেগে ওঠেননি। তাঁদের জাগরণের মূলে আছে ওয়াহাবী আন্দোলন—অন্য অর্থনৈতিক মূলের উল্লেখ করলাম না।

অতএব মোট কথা এই দাঁড়াল যে, সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকে ধরলে বিপিনবাবুর ব্যাখ্যা একদেশদর্শী মনে হয়। এত কথা বলবার প্রয়োজন হল দু'টি কারণে—(১) আমাদের নৈরাশ্য দূর করবার জন্য আমাদের নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে; (২) আমার বিশ্বাস নৈরাশ্য দূর করা খুব শক্ত হবে না যদি আমরা জানি যে, আমাদের স্বভাবে ভাবালুতা থাকলেও আমাদের কৃষ্টির বৈশিষ্ট হল ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ও মানসিক ধারার সমন্বয়-সাধন। নিজেকে জানাই সাধনার প্রথম কথা। নিজেকে জানবার জন্য আমাদের সম্বন্ধে অন্যের ভুল ধারণাও দূর করতে হবে। আমরা কেবল ভাবপ্রবণ কবিতাই লিখি এ ধারণা যিনিই পোষণ করুন না কেন, তিনিই ভুল করেন, তা তিনি যত বড় নেতা, যত বড় চিন্তাশীল লেখক হোন না কেন? আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য পূর্বাভিমত ত্যাগ করতে হয়, আত্মসন্ধানী হতে হয়, অর্থাৎ সমাজের ইতিহাস জানতে হয়। পুঁথি ঘাঁটা ইতিহাস চর্চা নয়; যে ইতিহাস অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম, যে ইতিহাস-চর্চায় ইতিহাস তৈরী হয়।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। লেখা একজনের কর্ম নয়। নিজের সাধ্যও নেই। কাজটা আমারও নয়, আমি সমাজতত্ত্বের ছাত্র, আমার কাজ ইতিহাস লেখা নয়, সমাজের

ছক ও গঠন দেখানো। আমি কেবল সামাজিক ইতিহাসের একটি blue print কিংবা ছক আঁকতে পারি। পণ্ডিতদের কর্তব্য সেই ছকের ওপর নকশা আঁকা, যুবকদের কর্তব্য হল নকশা বুঝে ইমারত খাড়া করা।

(১) বাংলার ভৌগোলিক সংস্থান। বাংলা দেশের জমির প্রথম কথা তার সবর্ণতা—homogeneity। বাংলার মধ্যে তিন চারটি স্বাভাবিক ভৌগোলিক বিভাগ থাকলেও বাংলা দেশ নদীমাতৃক, এমন কি তার সমস্তটাই ব-দ্বীপ বলা চলে। নদীপুলিনের মাটি, প্রচুর বারিপাত এবং ভিজে হাওয়ার জন্য বাংলা দেশ একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলার জল বায়ুতে, ফল-ফসলে, ইকনমিক জীবনে প্রথমতঃ পরিষ্কারভাবে, পরে অপরিস্ফুট হয়ে ইতিহাসে ও আরো অস্পষ্ট হয়ে বাঙ্গালীর মানসিক গঠনে প্রতিফলিত হবেই হবে। ভৌগোলিক প্রতিবেশ যে আমাদের একমাত্র ভাগ্য-বিধাতা তা বলছি না।

তবু ভূগোলকে বাদ দিলে চলবে না নিশ্চয়ই। বাংলা দেশের ম্যালেরিয়ার জন্য নদীর স্বাভাবিক বহতা বন্দ করাই দায়ী সকলেই স্বীকার করেন এবং ম্যালেরিয়ার জন্য দেশের লোক মারা যাচ্ছে, দেশের গ্রাম জনশূন্য হচ্ছে, নাগরিক সভ্যতার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমরা সকলেই জানি। হিন্দু-আমলে মহাস্থান; মুসলমান-আমলে গৌড়, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ; ইংরেজ-আমলে কোলকাতা, রাজধানীর এই স্থানপরিবর্তনের জন্য নদীর বহতাই অনেকটা দায়ী। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার স্থান স্বতন্ত্র।

(২) জাতির গঠন (racial composition)। যে যাই বলুন না কেন বাঙ্গালী জাতি শুদ্ধ জাতি নয়, বর্ণসঙ্কর জাতি। আর্যরক্ত আমাদের ধমনীতে অতিশয় ধিকি-ধিকি বয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে প্রথমে নেগ্রিটো, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে অস্ট্রলয়েড় এবং দ্রাবিড়ী, পরে পূর্বদেশ থেকে মুণ্ডা, তারও পরে আলপাইন বংশ মিলেমিশে এই বর্ণসঙ্কর জাতি তৈরি করেছে। রক্তের পবিত্রতা আমাদের মধ্যে নেই।

অবশ্য, প্রশান্ত মহালনবীশ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি, অর্থাৎ যতই আমরা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাই, ততই অনার্য দেহবৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। এখন যাঁরা জাতির গঠনের উপর জাতির কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনেকটা নির্ভর করে বিশ্বাস করেন, তাঁদের এই তথ্য দু'টি মনে রাখলে ভালো হয়। জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যতকুটু পড়েছি তাতে কোনো সামান্য সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে পারিনি। কোন জাতির কি বৈশিষ্ট্য আছে বৈজ্ঞানিক ভাবে বলা যায় না, আমার মতে। যাঁরা বিশ্বাস করেন বলা যায় তাঁরা বাঙ্গালী জাতির গঠনবিন্যাস নিয়ে যদি আলোচনা করেন, তবেই বাঙ্গালীর কৃষ্টির ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে।

জাতির গঠনের পর জাতির সংখ্যার কথা মনে রাখা উচিত। বর্গমাইল পিছু বাংলার লোকসংখ্যা ভারতে সবচেয়ে বেশি—বাংলা ৬১৬, উঃ-পঃ ৪৪২, বম্বে ১৭৩, মাদ্রাজে ৩২৮, ইংলণ্ডের মত কৃষিবিহীন দেশে ৬৮৫। ফলে গড়পড়তা চাষভূমি বাংলার সবচেয়ে কম—২·৮ একর, বম্বে ১২·৪, মাদ্রাজে ১৩·২ উঃ-পঃ ৩·৪।

(৩) দেশ ও পাত্র আলোচনার পর বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচয় পেতে হবে। প্যাট্রিক গেডিস্ যাকে work বলেছেন সেটা মুখ্যতঃ ভৌগোলিক প্রতিবেশকে বশে এনে শক্তি-সঞ্চয়, শক্তির প্রকাশ ও তার ব্যবহার। ভাষা পরিবর্তন করে একে forces of production বলাও চলে। বাংলা দেশের সম্পর্কে বিশেষতঃ দু'টি জিনিসের অভিব্যক্তির ইতিহাস জানা চাই। একটি চরের ও নিম্নভূমির কৃষিকার্যের ও দ্বিতীয়টি জমিসত্ত্বের। কৃষিকার্যের মধ্যে প্রথমতঃ ধান ও তারপর পাট প্রভৃতি। ধানের ইকনমিকস যে যব, গম ও পাটের ইকনমিকস থেকে ভিন্ন এ কথা সর্ববাদি-সম্মত। জমিসত্ত্ব সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু এখানে বলা চলে যে, জমিদার ও চাষীর মধ্যে মধ্যসত্ত্বোপ-ভোগীর দল ও শ্রেণী বাংলা দেশে যত বেশী অত বেশী ভারতে কুত্রাপি নেই। তা ছাড়া Permanent Settlement তো রয়েইছে।

(৪) পূর্বোক্ত ছকটি লেপ্লে ও প্যাট্রিক গেডিসের। এই ত্রি-মূর্তি ছাড়া অন্য একটি মূর্তির পূজার প্রয়োজনও আছে। সে মূর্তিটি

চোখে পড়ে না, সেটি বিগ্রহ মূর্তি নয়, তবু সেটি আছে। তার নাম ঐতিহ্য। একে time co-ordinate of culture বলা চলে। মাত্র কালক্ষেপে যে ভার জমে ওঠে, সেই ভারই ঐতিহ্যের। আমাদের সর্বাঙ্গে সেই ভার পড়ে বলে আমরা সেই ভার সম্বন্ধে সচেতন নই, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সর্ব দেশেরই ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা চারটি ধারা লক্ষ্য করি—(ক) ভাবের—বাংলা দেশের বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাহিত্যে এই ভাবধারার পরিচয় মেলে ; (খ) সাধনার—তন্ত্রেই এর পরিচয় পাই ; (গ) বুদ্ধিবৃত্তির—ন্যায়ের, বিশেষতঃ নব্য ন্যায়ের মধ্যে এই ধারা প্রবাহিত ; (ঘ) চারু কলার—কবিতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীতেই এই ধারার প্রকৃষ্ট প্রকাশ। ঐতিহ্যের প্রত্যেক ধারাটি বিশ্লেষণ করতে গেলেই বাংলার রাজকীয় ইতিহাসের তাৎপর্য ফুটে উঠবে। রাজকীয় ইতিহাসের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরেজের যুগ আছে। যুগ কথাটি ব্যবহার করছি সুবিধার জন্য। মোদ্দা কথা হল এই যে, রাজার প্ররোচনায় এবং হিন্দু-আমলে স্মার্ত পুরোহিত, বৌদ্ধ-আমলে পুরোহিত ও শ্রেষ্ঠীর দল, মুসলমান-আমলে জায়গীরদার ও ইংরেজ-আমলে মুৎসদ্দী, আড়তদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর আদান-প্রদান ঘটেছিল। ফলে আমাদের বাঙ্গালীর বর্তমান অবস্থা।

এই অবস্থার প্রধান গুণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা। গুণটি অল্পস্বল্প পরিমাণে সব সমাজেই আছে। কারণ জীবনের অর্থই হল খাপ খাইয়ে নেওয়া। তবে আমাদের সমাজে বেশী বললে অত্যুক্তি হবে না। এই গুণার্জনে আমাদের বাহাদুরির চেয়ে হয়তো তাগিদই বেশী ছিল। তাগিদ ইতিহাসের, এক কথায় আত্মরক্ষার, প্রধানতঃ বিদেশী ও বিধর্মী রাজার বিপক্ষে। সেজন্য বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি অন্য প্রদেশের সামাজিক গোঁড়ামি অপেক্ষা অনেক কম। পরিশীলনের দিক থেকে এই খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ভাষায় নেই কি ? পর্তুগীজ, আরবী, ফরাসী, ফারসী, ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত সবই

আছে। আর আছে বিদেশী ভাব ও সমস্যার বেমালুম আত্মসাৎ। বাঙ্গালী আত্মসাৎ করতে বরাবরই তৎপর; মিথিলার নব্য ন্যায় থেকে আরম্ভ করে তরুণ সাহিত্যিকের সমস্যা পর্যন্ত সবই এই শক্তির সাক্ষ্য দেয়। একে অনুকরণ বলে হেয় মনে করা অন্যায়। অনুকরণে সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে। আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি।

বাংলা দেশে অনেক দিন থেকেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারা চলছে আমরা জানি। বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তন এও সকলে জানি। কিন্তু এককালে পুরাতন পদাবলী হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীতেই গাওয়া হতো বলে মনে হয়, অন্ততঃ পদাবলীর উপর যেসব রাগরাগিণীর নাম লেখা থাকে সেগুলো লোক-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী নয় নিশ্চয়ই। অনেকে মনে করতে পারেন যে, লোক-সঙ্গীত থেকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ঐ সব রাগিণী গ্রহণ করেছিল। সর্বক্ষেত্রে তা যে নয় তার প্রমাণ আছে। অথচ এটা সুনিশ্চিত যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব বিস্তারের পূর্বেও কীর্তন গাওয়া হতো। সে কীর্তন কি দোঁহার কি রূপ ছিল তা আমরা জানি না। ডাঃ প্রবোধ বাগচির কাছে শুনেছি যে, নেপালের কোনো পাণ্ডুলিপিতে অনেক রাগের নামোল্লেখ আছে—সে রাগ অন্ততঃ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নেই, কীর্তনিয়ারাও সে সব রাগে গান না। হয়তো একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দোঁহা ও লোক-সঙ্গীত ঐ সব রাগিণীতে গাওয়া হতো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে—বৈষ্ণব পদাবলী মুসলমান যুগের প্রায় সমসাময়িক, অতএব মুসলমানদের প্রবর্তিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রভাব পদাবলী কীর্তনে থাকা অস্বাভাবিক নয়। এখন অবশ্য কোনো কীর্তনিয়াই হিন্দুস্থানী রাগরাগিণী বজায় রেখে গান না। হিন্দুস্থানী রাগ ছাড়া কীর্তনে অন্য কোনো রাগিণী ছিল না কিংবা অসম্ভব তাও বলছি না। কীর্তনে কথার তান আছে, অতএব তান ও তালের বৈশিষ্ট্যও থাকবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কথাপ্রধান, ভাবপ্রধান কীর্তনও মুসলমানদের প্রবর্তিত হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণী আত্মসাৎ করেছিল—যার ফলে অন্ততঃ এককালে, কীর্তনের সাহায্যে সঙ্গীতরস উদ্বুদ্ধ হতো।

ইচ্ছা করেই সঙ্গীতরস লিখলাম, কারণ কথার সঙ্গে সুর, সুরের সঙ্গে কথা মেলানোই হল এই adaptability-র একটি চরম বিকাশ। ক্রমে যদি পদ-কীর্তন নাম-কীর্তনে নেমে থাকে সেজন্য অন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু যাত্রাসঙ্গীত, রামপ্রসাদ, নিধুবাবুর টপ্‌পা থেকে রবিবাবু, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রভৃতির রচনায় পূর্বোক্ত সঙ্গীত-রসেরই সাক্ষাৎ পাই, যে রসসৃষ্টি আমাদের pliability-রই নিদর্শন। সাধে কি যুগলমূর্তি আমাদের অত প্রিয়!

পূর্বে বলেছি যে বাংলার ইতিহাস লেখা একার কর্ম নয়। আপনারা এই নকশাটির আলোচনা করুন। অন্য নকশা যদি তৈরী হয় আমি তার আলোচনা করব, ভালো হলে গ্রহণ করব। ব্যাপার হল এই—বাংলার কৃষ্টি একরোখা নয়, mosaic-এর সঙ্গে তার তুলনা চলে। বাংলার ঐতিহ্য এখনও শেষ হয়নি, এখনও চলছে। কোনো কালচারকেই ফল হিসাবে দেখলে চলে না—কোনো কালচারই নেতার হাতের আমলকী নয়; তার অভিব্যক্তি আছে, পর্যায় আছে, ক্রম আছে, প্রসার আছে, অতএব তার বিধি আছে, নিয়ম আছে। কৃষ্টির বিধি-নিয়ম জানতে হবে—জানলে বোধ হয় আমাদের পরিশীলন সম্বন্ধে লজ্জা কি সঙ্কোচের কোনো কারণ থাকবে না। আমরা ভাব-বিলাসী নই, মোটেই নই, আমরা চলিষ্ণু চরের চাষী, বর্ণসঙ্কর জাতি। আমরা বৌদ্ধ ও ইস্‌লাম ধর্মকে নিজের করে নিয়েছি, মিথিলা থেকে নব্য ন্যায় এনে নবদ্বীপে বসিয়েছি। আমাদের গাদাধরী, জাগদীশী দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত, পরের কাছ থেকে ভাষা নিয়েছি, আবার পরকে আমাদের ভাষার খাতির করতে বাধ্য করিয়েছি, অথচ নিজের ভালো বড় বেশী ত্যাগ করিনি; কোটালিপাড়া, গুপ্তিপাড়া, ভাট-পাড়াতে এখনও শ্রুতিস্মৃতির আলোচনা হয়; ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ইংরেজ বণিকের সঙ্গে আমরা সর্বপ্রথমে কারবার করি, তাদের মারফত পশ্চিমী সভ্যতার মূল্য বুঝতে শিখি, অন্য প্রদেশকে তার মূল্য বোঝাই। তা ছাড়া আমাদের ভাব-সম্পদ আছে। আমরা কবিতাই লিখি না, আমরা কবিতাও লিখি। আমাদের অতীত নেহাৎ

হেয় নয়। অতএব নিরাশার প্রয়োজন নেই। এ রকম দুর্দিন আমাদের বহুবার এসেছে, আমরা কাটিয়েও উঠেছি। গত শতাব্দীতে এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আমাদের দেশে এমন জনকয়েক লোক উঠেছেন, যাঁদের জন্মভূমি বলে যে কোনো দেশ গরব করতে পারে। তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। বিপদ কাটিয়ে ওঠবার শক্তি আমরা ইতিহাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। যদি বাঁচবার প্রবল ইচ্ছে কোনো রোগীর থাকে তা হলে রোগী বেঁচে ওঠে এবং প্রত্যেক সঙ্কট-রোগ হয়ে ওঠে, উন্নতির এক একটি মোড় ফেরা, ধাপ। নেতার মুখে দেশ উচ্ছন্ন গেল বলাও যা আর ডাক্তারের মুখে রোগী মারা গেল বলাও তাই। বিধবা বৃদ্ধার বেলা ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় মারা গেলেও দেশ আমাদের বিধবা হয়নি—বয়স আমাদের তিন কুড়ির ওপারে নয়।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম। কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই। কেন আপনাদের শহরে অক্ষয়কুমার মৈত্রের বাসভূমি? কেন বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি এই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাঙ্গালী জাতিকে পালবংশের অতীত গৌরব-বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তার ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত সঙ্কেত জ্ঞাপন করছে? কেন এই শহরের বাঙ্গালী কবি রজনী সেনের দেশপ্রেম আমাদের কানে সদা ঝঙ্কৃত হয়? কেন কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন গুজব উঠল, কেন মেঘদূত পড়লে বাংলা দেশের কথা স্মরণ হয়, কেন মনে জাগে এক তীব্র উজ্জ্বল মধুর বিরহ, কেন উত্তরমেঘের মিলনাকাঙ্ক্ষা মনে ওঠে?

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ত্বমপি সুতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি ক্রমেণ॥

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।

পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥

আর সবশেষে প্রশ্ন ওঠে, কেন আপনাদের সমিতির নাম 'আষাঢ়ে' রাখলেন ?

। উত্তরা ॥ ॥ আষাঢ় ॥ ১৩৪১ ॥

সঙ্গীত-সমালোচনা

সঙ্গীত যে এতদিন আমাদের দেশে ওস্তাদের গলায় ও হাতে রয়েছে তার ফলে সঙ্গীতের কি উন্নতি হয়েছে? গোটাকয়েক প্রচলিত এবং দু' একটা অপ্রচলিত সুরের রূপ তাঁদের কৃপায় বেঁচে আছে ছাড়া আর অন্য কোনো সুফল হয়েছে বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়। অনেক ভালো ভালো সুর যে তাঁদের জন্য লোপ পেতে বসেছে বলাই বাহুল্য। ওস্তাদরা নতুন সুরের নামই বলতে চান না, এমন কি তাঁদের প্রিয় শিষ্যের কাছেও। প্রচলিত সুরের শুদ্ধ রূপ সম্বন্ধেও নানা মত রয়েছে। একজন ওস্তাদ অন্য ওস্তাদের সুরকে শুদ্ধ বলতে রাজী নন। ফলে তিন-চার রকমের 'শুদ্ধ' টোড়ী, চার-পাঁচ রকমের 'শুদ্ধ' মল্লার, 'শুদ্ধ' কল্যাণ শুনতে পাওয়া যায়। কারুর মতে 'শুদ্ধ' একটি নতুন সুর, কিন্তু সে সুর কিভাবে গাইতে হবে কেউ দেখিয়ে দেন না। দু' রকমের দেশকার, দু' রকমের বিভাস শুনেছি, এক ভূপালি ঠাটে, অন্যটি ভৈরোঁ ঠাটে। প্রত্যেকেই শপথ করতে রাজী যে তাঁর সুরই শাস্ত্রসঙ্গত। সকলেই নিজের মত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। বড় ওস্তাদদের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক—ছোটখাট ওস্তাদরা বেশীর ভাগ সময় প্রচলিত রূপ থেকে সুরকে ভ্রষ্ট করে ফেলেন। দেড় শ' দুই শ' ধ্রুপদ শিখেও একের অধিক সঙ্গীত-শিক্ষককে ইমনকল্যাণে কোমল নিখাদ লাগাতে শুনেছি, আবার সেই কোমল নিখাদ নিয়ে তর্কও হয়েছে।

ভ্রষ্ট সুর মাত্রেই শ্রুতিকটু বলছি না। বরঞ্চ এ কথা বলা যায় যে, স্বরের অভিনব মিশ্রণ ও যোগাযোগেই সুরের যা কিছু নতুন রূপ তৈরী হয়েছে। তবে নতুন সুর তৈরি করা আর ওস্তাদী গান গাইতে বসে ভুল গাওয়া এক জিনিস নয়। নিজের খেয়ালের বশে সুর ভাঙা ও স্বরের নতুন সমাবেশ করা এমন ব্যক্তিই পারেন যিনি আসরে ওস্তাদী গান গাইতে বসে ভুল গান না—অথচ মুখস্থ বিদ্যার চাপে যাঁর সৃজনী-শক্তি এবং প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়নি। এই রাসায়নিক মিশ্রণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। মৈহারের আলাউদ্দিন খাঁ অন্ততঃ দশ বারোটি নতুন সুর তৈরি করেছেন। সেগুলোকে পুরাতন নামের মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না, এক দিগ্‌গজ পণ্ডিতের কাছে শুনেছি। অবশ্য সবগুলিই যে মধুর রূপ পেয়েছে তাও বলা যায় না। 'আলাউদ্দীন' বাংলা দেশের সবে ধন নীলমণি।

বাংলা দেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় নতুন কিছু হচ্ছে না। গত কয়েক যুগ ধরে যা কিছু নতুন হচ্ছে তার সঙ্গে ওস্তাদদের কোনো সম্পর্ক নেই। মাদ্রাজে যেমন ত্যাগরাজা, তেমনি বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে নতুন যুগ এনেছেন। উত্তর ভারতের নানান ধরনের গান শুনে মনে হয় যে, সঙ্গীত-ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ওস্তাদী সঙ্গীতে অভ্যস্ত হলেও নিজে ওস্তাদ নন, যদিও তাঁর কাছে আমি একাদিক্রমে দশখানি ভালো খেয়াল শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের পরেই অতুলপ্রসাদের স্থান; তিনি বাঙলা ভাষায় ঠুংরী এনেছেন। মেটেবুরুজে ওয়াজিদ আলি শাহের বন্দীজীবনের সময় থেকেই ঠুংরীর ভাবপূর্ণ মধুর তানে বাঙ্গালী অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। সেই থেকেই অতুলপ্রসাদ বাংলার দূত হয়ে লক্ষ্ণৌএ প্রবাসী হয়েছেন। একেই ইতিহাসের প্রতিশোধ বলে। অতুল-প্রসাদের লক্ষ্ণৌবাস বাংলা দেশের সঙ্গীত ইতিহাসের একটি আধুনিক অধ্যায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে যোগসূত্র তিনি বজায় রেখেছেন—সেই যোগসূত্রের সাহায্যে বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের মালা গাঁথাই তাঁর মৌলিকত্ব। রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব আরো উচ্চস্তরের। প্রথমতঃ,

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ভাষা ও ভাবের দিক থেকে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে তাকে উপযুক্ত নতুন সুরে মূর্ত করা আরো শক্ত। দ্বিতীয়তঃ, গত দশ-পনেরো বছর ধরে, রবীন্দ্রনাথ সুরে এমন একটি সম্পুর্ণ নতুন ধারা এনেছেন যার সঙ্গীত হিসাবে মূল্য তানসেন-কৃত দরবারী কানাড়া, কিংবা মিয়াকী মল্লার অপেক্ষা কম নয়। রবীন্দ্রনাথের ধারাটি কিন্তু কোনো মোগলাই তারিখের তোয়াক্কা রাখে না। এক সময় অবশ্য ছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বসাতেন। যখন থেকে দেশী সঙ্গীত, অর্থাৎ বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের স্রোত তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করলে তখনই তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন। এতদিন হচ্ছিল অনুকরণ, হাতে খড়ি, এখন শুরু হল সৃষ্টি। এই বোধ হয় জীবনের রীতি। দেশের সন্ধান, দরবার ও নগরের বাইরের মাটির ও গ্রামের সন্ধান, শূদ্র ও যবনের সন্ধান যখন পাওয়া যায়, তখনই মানুষ, জাতি, সভ্যতা নবজীবন লাভ করে। মাটির সন্ধান পেয়েছেন বলেই রবিবাবু সঙ্গীতকে নবজীবন দিতে পেরেছেন। সে যাইহোক গত দু' তিন বৎসর রবিবাবু যেসব গান লিখেছেন তাতে না আছে মাটির গন্ধ, না আছে পেঁয়াজের। সেসব একেবারেই নতুন, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, যার তুলনা আমাদের দেশে অন্ততঃ নেই। অবশ্য যে কান ওস্তাদী সুরে তৈরী, সে কানে অতুলপ্রসাদের গান রবীন্দ্রনাথের গান অপেক্ষা বেশী ভালো লাগবে। তবুও অতুলপ্রসাদ ওস্তাদ নন।

ইদানীং বাংলা দেশে দিলীপকুমার গানে এক নতুন চাল এনেছেন। এই চালের বিশেষত্ব আছে স্বীকার করতেই হবে। তিনি বলেছেন যে, তাঁর কাজ বাংলা গান হিন্দুস্থানী চালে গাওয়া খুবই সম্ভব তাই দেখানো। আমার মনে হয় যে, শুধু এই দেখানোই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এ কাজ তাঁর পূর্বে অনেকে করেছেন। যেমন ৺শরৎবাবু, ৺মন্মথ রায়, ৺বিজয় লাহিড়ী প্রভৃতি। এখনও সুরেন মজুমদার মহাশয় অনেক বাংলা গান, রবিবাবুর গান পর্যন্তও হিন্দুস্থানী ঢঙে গান। আমার বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় 'নাতনী লো তোর জন্য ভেবে

ভেবে মরি', 'রসান দে লো স্যাকরাণী' প্রভৃতি অভদ্র গান পাকা সুরে শুনেছি। শ্যাম ও শ্যামা বিষয়ক চমৎকার ভাবোদ্দীপক গানও ওস্তাদরা গাইতেন। দিলীপকুমারের কৃতিত্ব এই নয় যে, তিনি গ্রাম্য ভাষার স্থলে তাঁর পিতার, কাজীর, নিরুপমা দেবীর কিংবা স্বরচিত কবিতা গান। ভাষার দিক থেকে তাঁর সঙ্গীতের বেশী দূর তারিফ করা চলে না। আমার মনে হয় যে, তিনি গানে সত্যই এক নতুন চাল প্রবর্তিত করেছেন, যার মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এ চাল মোটেই শুদ্ধ নয়, সম্পূর্ণ মিশ্র, যাকে জাংলা বলে। খেয়াল আরম্ভ করে টপ্পা, ঠুংরী, ভজনের তান মেশানো; এমন কি কীর্তনে, ভজনে ঠুংরীর খোঁচ দেওয়া—এই সব প্রথাবিগর্হিত কাজ তিনি সদাসর্বদাই করেন। তাঁর ঠুংরীও নতুন ধরনের। খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীর বেড়া ভেঙে দিয়ে তিনি সঙ্গীতকে অনেকটা মুক্ত করেছেন। তাঁর গলার মাধুর্য, তানের ক্ষমতা, ভাবপ্রকাশের শক্তি এবং রীতিমত শিক্ষার অভাব, এক কথায় তাঁর প্রতিভাই তাঁকে এই মুক্তির সাধনায় সাহায্য করেছে। মুক্তির পর সঙ্গীত একটা নতুন রূপ নিয়েছে। অজস্র তানের মধ্যে, ভাববিলাসের অন্তরালে, সাহিত্যের তাড়নায় সে রূপ আত্মগোপন করলেও যে কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি সে রূপের আভাস পেতে পারে। এই রূপসৃষ্টিই তাঁর নৈপুণ্য, তাঁর বিশেষত্ব। কিন্তু দিলীপকুমার ওস্তাদ নন, তিনি ওস্তাদের কাছে অনেক গান শিখলেও, রীতিমত ওস্তাদী পদ্ধতিতে কারুর কাছে বহু বৎসর ধরে কৃচ্ছ্রসাধন করেননি—কিংবা যা করেছেন তার চেয়ে বেশী অনেকেই করেছেন। তিনি মনে মনে যাঁকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করেছেন, সেই সুরেনবাবুও পাকা ওস্তাদ নন।

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমারকে একাসনে বসাতে চাই না। রুচি সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার করবার ক্ষমতা নেই। লেখবার সময় লাইন সোজা রাখতে হয়, এই কদভ্যাসের জন্যই তাঁদের নাম একসঙ্গে করছি। কিন্তু ওস্তাদী ধরনে শিক্ষার অভাব হিসাবে তাঁরা এক পঙ্ক্তিতে হয়তো বসতে পারেন। আর এক হিসাবেও তাঁরা সমান না

হলেও এক শ্রেণীর অন্তর্গত। ওস্তাদ নন বলে ওস্তাদের কুশলতা কোথায় সম্পূর্ণভাবে না বুঝতে পারলেও তাঁরা ওস্তাদী সুরের যথার্থ প্রেমিক। পাকা গানবাজনা শুনে তাঁরা অতি সহজে সঙ্গীতের মর্মস্থলে পৌঁছতে পারেন—অন্য রাস্তায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেন না। সুরের প্রকৃত রূপ তাঁরা এত সহজে এবং এত দৃঢ়ভাবে ধরতে পারেন যে, আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। বিশ-পঁচিশ বছর গান শুনে লোকে হয়তো সুরের নাম-ধাম, কোথায় কি পর্দা লাগছে বলতে পারেন, কোথায় তাল কাটল বুঝতে পারেন—কিন্তু সুরের মর্ম গ্রহণ করতে হয়তো তাঁদের মধ্যে সকলেই পারেন না। সুরের মর্ম গ্রহণ করবার জন্য অন্য একটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, তার নাম artistic sense, যেটি পূর্বোক্ত তিন জনের মধ্যে কমবেশী সকলেরই আছে। একটি উদাহরণ না দিয়ে থাকতে পারছি না। অতুলপ্রসাদের একটি গান আছে—'তুমি কবে আসিবে বোলে', অন্তরা হচ্ছে 'কত বেলী কত চামেলী যায় বৃথা যায়'। অন্তরাটি মীড়ের জন্য অতি মধুর শোনায়। সুরটি জৌনপুরী টোড়ী—তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'আশাবরী বোধ হয়'। বাংলা দেশের সাধারণ ওস্তাদ আশাবরী ও জৌনপুরী একই ধরনে গেয়ে থাকেন। তাই শুনে তিনি সুরটিকে আশাবরী বলেছিলেন। কিন্তু নাম-ধামের কথা ছেড়ে দিলে জোর করে বলা যায় যে, জৌনপুরী টোড়ীর এমন রূপটি খুব কম ওস্তাদই দেখাতে পারেন। কোন ওস্তাদ রবিবাবুর মতন ভৈরবী ও মল্লারের প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন? অবশ্য এই ধরনের দিব্যজ্ঞান প্রতিভাসাপেক্ষ স্বীকার করি—কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে সাধারণের মধ্যে এই দিব্যজ্ঞানের আংশিক উন্মেষ সম্ভব মনে হয়। প্রেমেই যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা ওস্তাদ না হয়েও সুরের প্রেমিক; এই সম্প্রদায়ই সঙ্গীতের ভরসাস্থল। এই সম্প্রদায়ই যথার্থ সমালোচনা করতে পারেন। এঁদের সংখ্যা বাড়ানোই সঙ্গীত-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ওস্তাদের হাতে এবং সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে শুধু ওস্তাদ তৈরী হচ্ছে—রুচি তৈরীও হচ্ছে না, মার্জিতও হচ্ছে না।

অতএব আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, গত যুগে বাংলা দেশে সঙ্গীতের যা কিছু উন্নতি হয়েছে সবই প্রায় এমেচারের দ্বারা। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, নতুন ধারাগুলিকে অক্ষুণ্ণ ও সজীব রাখতে হলে শিক্ষিত সমালোচনার প্রয়োজন। সঙ্গীত রাজ্যেও শিক্ষিত সমালোচকের স্থান আছে। সাহিত্যে স্রষ্টা ও সমালোচকের ব্যবধান লোপ পাচ্ছে। তার একটি কারণ এই যে, সাহিত্য-সমালোচনা সাহিত্য-সৃষ্টির মতন ছাপাতে হয়। কিন্তু সঙ্গীত-সমালোচককে গেয়ে কিংবা বাজিয়ে দোষগুণ দেখাতে হয় না। আমাদের যদি স্বরলিপি থাকত তা হলে সঙ্গীত-সমালোচনা ক্ষণিক উত্তেজনা অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হতে পারত সন্দেহ নেই। সেইজন্যই বোধ হয় বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার ইতিহাস থাকলেও, সুর-সমালোচনার ইতিহাস নেই। দেশে অনেক সমঝদার ছিলেন, এখনও আছেন—তাঁরা গানবাজনা শুনে ভালোমন্দ লেখবার প্রয়োজন আছে মনে করেননি—এখনও করেন না। বিলেতী কাগজে রেকর্ড-সমালোচনা পড়েছি—এ দেশে তা সম্ভব নয়, যে কাগজে গ্রামোফোন কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেয় সে কাগজে রেকর্ড সমালোচনা প্রকাশিত হতেই পারে না। লোকসান হবার ভয় সকলেরই আছে। সঙ্গীত-সমালোচনার অভাবের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সঙ্গীত ভাব-রাজ্যের ব্যাপার এবং আমাদের সঙ্গীত নিতান্তই আধ্যাত্মিক বলে লোকের ধারণা। অতএব 'বাহবা' কিংবা 'ধুত্তোর' বলা ছাড়া শ্রোতার অন্য কর্তব্য যে আছে শ্রোতা নিজেই জানেন না। সাহিত্য-সমালোচনাতে ভালোমন্দের কারণ দেখাতে হয়—অন্ততঃ দেখানো দরকার সমালোচক তা জানেন, সাধারণ পাঠকও কারণ দেখবার দাবিদাওয়া করেন। কিন্তু একটা মীড়, কিংবা খোঁচ, একটা বি-সম কিংবা অনাঘাতে বাহবা দেওয়া হল কেন, কারণ জিজ্ঞাসা করবার সময় ও প্রবৃত্তি হট্টগোলে একেবারেই থাকে না। হট্টমনের প্রাদুর্ভাবে 'বাহবা' কিংবা 'ধুত্তোর' আপনা হতেই নিঃসারিত হয়। লোকে বাহবা দিচ্ছে অথচ শ্রোতা একলা দিচ্ছেন না—একথা মনে হলেই শ্রোতা লজ্জিত হয়ে পড়েন। অনেক আসরে আমি অনেক ওস্তাদ সমঝদার,

কদর-দানকে কেন বাহবা দিচ্ছেন প্রশ্ন করেছি—কি রকম উত্তর পেয়েছি বেশ মনে আছে। ওস্তাদ বলেছেন—'চুপ রহো বেটা, ইয়ে তুম্‌হারা কাম নেহি'—'শুনিয়ে বাবু সাব, ক্যা গান্ধার লাগায়া, ক্যা শাঁস!' 'ইয়ে ঘরোয়ানা চীজ, ইয়ে বাঙ্গালীয়োঁকো কাম নেহিজী'—'ইয়ে আপকো ইলাকা মে নেহি' ইত্যাদি। দু' একজন ওস্তাদ অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দিতেন বটে, কিন্তু, আলাবন্দের গমক্, ফৈয়াজের তান, রাজা ভাইয়ার মূর্ছনা, আলাদিয়ার বিকৃত তান, কালে খাঁর হলক্‌তান শুনে কেন পাগল হওয়া উচিত কেউ আমাকে বুঝিয়ে দেননি। অন্যে যে বোঝাননি, বোঝাতে পারেননি এবং আমিও যে বুঝিনি তার অন্যতম কারণ এই যে, সঙ্গীত এখনও সাহিত্যের মতন সাধারণের ভোগ্য হয়নি—এখনও দরবারী চীজ হয়েই রয়েছে, এখনও পেশাদারের মধ্যে, একটি trade union-এর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, যেখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষেধ। সঙ্গীত এখনও একটি গোপনীয় আচার বলে গণ্য হয়। মন্ত্রগুপ্তি হাজার ভালো হলেও, সাধারণ লোক কিছুই গোপন রাখতে দেবে না। বুড়ো মুন্নে খাঁর মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকার মাত্র একটি বার এক উদ্ভট সুর, ইমনবেলাওল শুনে তৎক্ষণাৎ খাঁ সাহেবকে গেয়ে শোনান। তাতে খাঁ সাহেব বলেছিলেন—"বাবুজী, আমার ওস্তাদ সাদেক আলি খাঁ আমাকে বিশ বছর সগির্দী করবার পর এই সুর শেখান, আমার শিখতে তিন মাস লেগেছিল—আর আপনি তিন মিনিটে মেরে দিলেন! আপনি যাদু জানেন, আপনি জিন!" কদর পিয়ার পুত্র চৌলাক্কির নবাবসাহেবও ঐ ধরনের কথা বলেন, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার সব ঠুংরীগুলিই শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েছেন। মুন্নে খাঁ ওস্তাদ—নবাব সাহেব নবাব। প্রকৃত শিক্ষার্থীর কাছে গোপন রাখা অন্যায় মনে হয়—আর যদি প্রকাশ করবার ক্ষমতা না থাকে তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। সমালোচনার সুবিধার জন্য গোপেশ্বরবাবুকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি স্বরলিপি ছাপিয়ে শিক্ষিত সমালোচনার পথ কতখানি যে পরিষ্কার করেছেন, বলে শেষ করা যায় না। তিনি অন্ততঃ শিক্ষাদানে কৃপণ নন।

গড়পড়তা ধরলে, পেশাদার ওস্তাদের দ্বারা সঙ্গীত-সমালোচনা অসম্ভব মনে হয়। এ কার্যটি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে হাতে তুলে নিতে হবে। সঙ্গীতে শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে আমি এই গুণগুলির আধারকে বুঝি, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা, artistic sense অর্থাৎ রূপজ্ঞান ও রসবোধ, যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যতদূর হোক আর না হোক, মনের প্রসারতা এবং উদারতা—এক কথায় বৈদগ্ধ্য। কোন গুণটি কতখানি থাকলে সঙ্গীত সমালোচনার সুবিধা হয় ওজন করে বলতে পারি না—তবে সব গুণগুলিই চাই।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সকলকেই শিখতে হবে এবং ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে। হিন্দী ও উর্দু ভাষায় এত ভালো ভালো গান আছে যে, বেছে নেওয়া ভারী শক্ত কাজ। শুধু কাব্য কিংবা শুধু সুর ও তাল হিসেবে ভালো গানের কথা বলছি না—কথা ও সুর মিশিয়ে যে রচনা তার কথাই বলছি, যেমন পূরিয়ার 'জরদ অঙ্গিয়া'। ওস্তাদরা শেখাবার সময় সাধারণতঃ সুরের দিকেই নজর দেন, শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ নজর দেন কথার দিকে। খুব কম ওস্তাদের কাছে ভালো চালের গান পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মুসলমানী ওস্তাদের খেয়াল, ঠুংরী, গোয়ালিয়র, রামপুর এবং গৌসাইজীর ঘরের ধ্রুপদ, রমজানী টপ্পা, আলাবন্দে, জাকরুদ্দীনের আলাপ ও মারহাট্টা গায়কের ধামার ও তেলানার চালই মধুর মনে হয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে ও থাকতে বাধ্য। আমার মনে হয় খেয়াল, ঠুংরীতে মুসলমানী ঢঙ-এর মতন ঢঙ আর নেই, হদ্দু খাঁ ও তানরাজ খাঁর ঘরোয়ানা ভারী কঠিন; হিন্দু গায়কদের মধ্যে বেনারস, গোয়ালিয়র (শঙ্কর পণ্ডিতের ঘর), গয়া ও বেথিয়ার চালই ভালো মনে হয়। বাঙ্গালী ওস্তাদরা অনেক সময় সুর বজায় রেখে গানের চাল বিকৃত করেন। তাঁদের কাছে ভালো রচনা খুব কম পাওয়া যায়, যা পাওয়া যায় তার বাণী অশুদ্ধ। মোট কথা এই, ভালো ওস্তাদ খুঁজে তাঁর কাছে পাখী পড়ার মতন গান মুখস্থ করতে হবে। অন্ততঃপক্ষে পঁচিশখানি সুরের খান পঞ্চাশেক

গান নির্ভুল করে গাইতে না পারলে সঙ্গীতের শিক্ষিত সমালোচক হওয়া যায় না। তারপর ওস্তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। বেশী দিন ওস্তাদের কবলে থাকলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, প্রাণ নিয়ে পালানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এমন গুরু খুব কমই আছেন যিনি শিষ্যকে চিরকালের জন্য নাবালক ভাবেন না। ওস্তাদের দল এই কথা শুনে যেন দুঃখিত না হন। পূর্বোক্ত মন্তব্য অধ্যাপকের দল সম্বন্ধেও খাটে। অধ্যয়নের সুবিধা এই যে, তার কাল নির্ধারিত, অধ্যাপকের সুবিধা এই যে, তাঁর বেতন নিয়মিত। নিয়মিত সময়ের অতিরিক্তকাল শিক্ষা দেওয়ায় অধ্যাপকের কোনো স্বার্থ নেই। সে যাই হোক, ওস্তাদের হাতে আমাদেরকে কয়েক বৎসরের জন্য থাকতেই হবে, না হলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মহিমা বোধগম্য হবে না এবং মৌলিকত্বের মূল্য দিতেও পারব না। বাংলা দেশের গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব অনেকখানি—সে প্রভাব দূর করা যাবে না, দূর করা উচিৎ নয়। বাউল কিংবা কীর্তন হাজার মধুর হলেও তার এমন ক্ষমতা নেই যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে তাড়িয়ে দেয়। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্বপক্ষে। রবিবাবু কিংবা অতুলপ্রসাদ কিংবা দিলীপকুমার কখনও বলেন না যে, তাঁদেরই গান সব সময় গাইতে হবে, অথবা তাঁদের গান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে গুণ্ডার মতন বাংলার বাইরে নির্বাসিত করবে— তাঁরা নিজেরাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভক্ত—নিজেরাই অনেক সময় হিন্দুস্থানী কিংবা উর্দু গান গেয়ে থাকেন। কেবল রবিবাবু কিংবা অতুলপ্রসাদের গান শিখে শিক্ষিত সমালোচক হওয়া যায় না। শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানী পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হবে।

শিক্ষিত ব্যক্তির artistic sense থাকা চাই। শিক্ষিত ব্যক্তি কোনটা ভালো, কোনটা ভালো নয় অতি সহজে বুঝতে পারেন—যিনি বুঝতে পারেন না তিনি শিক্ষিত নন। শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক সময় নির্বাচন করতে পারলেও শিক্ষার ভার যখন বেড়ে যায়, তখন চার ধারে চোখ রেখে, সব মূল্যকে ওজন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তিনি সচরাচর পারেন না দেখেছি। তখন শিক্ষিত ব্যক্তি পণ্ডিত

হয়ে ওঠেন। সিদ্ধান্তে আসতে সময় লাগে, অথচ সিদ্ধান্ত চাই—না হলে মানুষ স্থাণু, জড়ভরত হয়ে পড়ে। কীট্‌সের একখানা চিঠিতে আছে যে, সেক্‌স্‌পীয়রের মস্ত গুণ ছিল এই যে তিনি রায় মুলতবী রাখতে পারেন—He had a capacity for suspending judgement. এখানে judgement বলতে যদি নৈতিক ভালোমন্দর কথা নির্দিষ্ট হয়, তা হলে অবশ্য নাট্যকারের বহির্মুখীনতার জন্য মতামত গোপন রাখা, সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোই লেখকের বাহাদুরি মানতে হবে। কিন্তু যে বিচার-শক্তির ফলে যথাযথ ঘটনা ও ভাষার সমাবেশ এবং প্রকাশ সম্ভব হয়, সে শক্তি রোধ করলে আর্ট সংক্রান্ত কোনো কাজই করা যায় না—না করা যায় রচনা, না করা যায় সমালোচনা। অবশ্য রায় লেখা ও জাহির করার মধ্যে সংযম চাই। অনেকে বলেন, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আর্টিস্টের তফাত এই যে, শেষ কথা বলবার অধিকার বৈজ্ঞানিকের নেই। কিন্তু যিনি কোনো বৈজ্ঞানিকের মনের সঙ্গে পরিচিত তিনিই বলবেন যে, মূল্য নির্বাচন ও নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মপ্রকাশ করা নিয়ে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আর্টিস্ট ও আর্ট-সমালোচকের কোনো আন্তরিক পার্থক্য নেই। যোগের দ্বারা যেমন ইন্দ্রিয়গুলি এত সুমার্জিত হয় যে, তাদের সেই পুরাতন ইন্দ্রিয় বলে চিনতেই পারা যায় না, তেমনি শিক্ষার পর মনে হয় যেন একটি নতুন ইন্দ্রিয় ফুটে উঠেছে—চোখ খুলেছে, বুদ্ধি খুলেছে। এই নতুন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দিব্যজ্ঞানের নাম sense of values, মূল্যজ্ঞান। আলাদা করে দেখলে এই দিব্যজ্ঞানের তিনটি দিক আছে, এর মধ্যে বুদ্ধির কাজ বিচার, ভাবের কাজ ভালো লাগা না-লাগা এবং ইচ্ছাশক্তির কাজ সিদ্ধান্তে আসা। কিন্তু নব্য মনোবিজ্ঞানে মানসিক ঘটনাকে ভাগ করা উঠে গেছে, যদিও সম্পূর্ণভাবে ওঠেনি—যতদিন মনোবিজ্ঞান অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ততদিন উঠবে না—আপাততঃ সম্পূর্ণভাবে উঠে যাবার দরকারও নেই। আপাততঃ একটি নতুন সংজ্ঞার দরকার হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রে ও পদার্থ বিজ্ঞানে যেমন space time-কে একটি concept করা হয়েছে, তেমনি মনোবিজ্ঞানে বিচার-বুদ্ধি, ভাব এবং

ইচ্ছাশক্তিকে একটি concept-এ গ্রথিত করবার সময় এসেছে। এই তিনটি মিলিয়ে একটি psychosis করে বুঝলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মূল্যজ্ঞান একটি অখণ্ড মনোভাব (psychosis)—এর মধ্যে cognitive, affective এবং conative elements সব বজায় আছে। অবশ্য সাধারণতঃ সব চিন্তাতেই এই ইচ্ছাময়ী কিংবা কার্যকরী শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

আর্টের ক্ষেত্রে দর যাচাই করার সঙ্গে বাজারে আলু-পটলের দর যাচাই করার পার্থক্য এই যে, আর্টে ব্যবহারিক শক্তির ক্রিয়া এবং প্রভাব কম। একেবারে নেই বলতে পারি না—না হলে প্রকাশ ও সৃষ্টি অসম্ভব হয়, না হলে মূক ও মুখর কবির, সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ ও করিতকর্মা ওস্তাদের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকে না। আর্টে মূল্যজ্ঞান সম্বন্ধে যা ভেবেছি তাই লিখছি। নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি শুধু যে সুর-সৃষ্টি কিংবা সুর-সমালোচনা সম্বন্ধেই খাটে তা নয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, প্রায় সব মহারথীরাই আজকাল সৌন্দর্যানুভূতিকে অন্য অনুভূতি থেকে একটু পৃথকভাবে দেখছেন। সকলেরই প্রায় ধারণা যে, রূপ বেছে নেবার কিংবা সৃষ্টি করবার সময়ে, ইচ্ছাশক্তির কাজ ক্ষণিকের জন্য বন্ধ থাকে, "conation is relatively at least in suspense, and therefore also judgement and belief," অবশ্য এই ক্ষণিক রোধের অবস্থা নাইট্রোগ্লিসারিনের মতন নিতান্ত অস্থায়ী। কিন্তু তাই যদি হয়, কোন শক্তিতে মানুষ তুলি নিয়ে বসে, কলম নিয়ে বসতে যায়, সেতার হাতে তোলে? এটা বেশ বুঝি যে রূপসৃষ্টির বিশেষত্ব আছে—কিন্তু তাই বলে ক্রোচের মতন conation-কেই expression বলতে এবং সেই সঙ্গে intuition-কে তাদের সঙ্গে equate করতে মন নারাজ হয়।

(১) যদি সময় ও পর্যায়ের দিক থেকে মূল্যজ্ঞানের উদয় শিক্ষার পর, তবুও কার্যতঃ এই জ্ঞানকে পূর্বতন সংস্কার বলেই মনে হয়। গান কানে শোনা ও ভালো গান বলে চেনার সম্বন্ধটি কেবলাত্মক, স্বপ্রকাশিত, অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধিত বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধের যেন

কোনো ইতিহাস নেই, এ সম্বন্ধ যেন সময়ের অতিরিক্ত। এ সম্বন্ধ নিয়ে কোনো প্রশ্নই তখন ওঠে না—এর যেন কোনো প্রমাণের কারণ দেখাবার প্রয়োজন নেই। Abercombie একেই face-value, self-evident worthwhileness বলেছেন। মূল্য-নির্ধারণের বিশ্লেষণ করতে মন চায় না বলে এই জ্ঞানকে synthetic এবং a priori বলা যেতে পারে। তার মানে নয় যে বিশ্লেষণ করা যায় না, কিংবা বিশ্লেষণ করা মহাপাপ।

(২) এই জ্ঞানে এমন একটি আনন্দ ও তৃপ্তি আছে যার জন্য মানুষের সমগ্র মনোবাঞ্ছার পূরণ হয়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং ভাবের বৈলক্ষণ্যে যে অশান্তি ওঠে তার সহজ নিরাকরণ হয়। আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না—'ঘরে বাইরে'র মাস্টার মশাই, 'গোরা'র পরেশবাবু, Karamzov Brothers-এর Alyosha, এমন কি Abbe Coignard-এর চরিত্রে যে শান্তি সব পাঠকই লক্ষ্য করেছেন তার উৎস এই আনন্দ। অরবিন্দের মুখে কবি এই শান্তির ছাপ দেখেছেন। বিদেশী সভ্যতার আঘাতে এই মূল্যজ্ঞান ও আনন্দ লোপ পাচ্ছে। ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মূল্যজ্ঞানের অভাবে কোনো তৃপ্তি ও শান্তির চিহ্ন পাই না, সেখানে অনেক সময় গান কি সাহিত্য সম্বন্ধে যে রুচির পরিচয় পাই, তাকে ভদ্রজনোচিত বললে ভদ্রতার অর্থ ভিন্ন করে লিখতে হয়।

(৩) এই জ্ঞানের ন্যায্যতা, উপযোগিতা কোনো বাহ্য উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে না। যখন গান সত্যই ভালো লাগে তখন কোনো বাইরের মতলবে যে ভালো লাগে তা নয়। সাধারণতঃ যে যে কারণে গান ভালো লাগে, সে কারণগুলি সত্যকারের ভালো লাগার পক্ষে অবান্তর। সুন্দরী স্ত্রীলোকের হাতের অখাদ্য রান্না খেয়ে তারিফ করা যা, আর সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখে অশ্রাব্য গান, আর হাতের অশ্রাব্য এসরাজ শুনে তারিফ করাও তাই। দু' কাজেই যথার্থ মূল্য-জ্ঞানের অভাব প্রমাণিত হচ্ছে। কেশরঞ্জন তেলে আলু ভাজলে, মুড়িতে শাম্পেন মেশালে আলু ও মুড়ি অখাদ্য হয়ে পড়ে। বাইরের

আদর্শকে সত্য, শিব, সুন্দর প্রভৃতি হিন্দু-ভোলানো যত বড় বড় সংস্কৃত নাম দেওয়া হোক না কেন, মূল্যজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো নাড়ীর সম্পর্ক নেই। আর্টের ধর্ম নিষ্কাম। রূপসমাবেশ এবং রস-রচনা ছাড়া আর্টিস্টের অন্য কোনো কামনা থাকতে পারে না। এই ধরনের 'কামনা' বড় যোগীরও থাকে—পরমহংসদেব নিজে স্বীকার করেছেন। আর কামের কথা! ফ্রয়েড সব বোঝেন হয়তো, কিন্তু আর্ট তিনি বোঝেন না—বাজারে-আর্টকে আর্ট মনে করলে সেই আর্টের মধ্যে কাম কেন বাকি পাঁচটি রিপুর সব কয়টিকেই পাওয়া অতি সহজ।

(৪) সময় এবং ইতিহাস যখন মানবমনেরই সৃষ্টি, তখন মানুষের প্রাপ্তি হিসেবে, মূল্যজ্ঞানের ইতিহাস, অর্থাৎ গতিরও দিক আছে। ঐতিহাসিকভাবে কোনো জ্ঞান কিংবা অনুভূতিকে বুঝতে ভয় হয়, কারণ ঐতিহাসিক আদিত্বকেই বর্তমানের মূল্য বলে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু যখন সবই বদলায় তখন ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যায় না। সেইজন্য ইতিহাসকে আদিবৃত্ত না ধরে ইতিবৃত্ত হিসেবে বুঝলে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। গোমুখীর সৌন্দর্য ভোগ করতে গোমুখী যাবার দরকার নেই, যদিও মুঙ্গেরের গঙ্গা গোমুখী থেকেই উঠছে। পথে কিন্তু কত নদনদীই না মিশে গঙ্গাকে ভরিয়ে দিয়েছে। কষ্টহারিণী ঘাটের সৌন্দর্য নির্ভর করছে গঙ্গার বিশালতার ওপর, সে বিশালতা ঐতিহাসিক, গোমুখী বিশাল নয়, তার ইতিহাস নেই। ইতিহাসকে accumulative-ভাবে বুঝতে হবে। এইভাবে, মূল্যজ্ঞান আদিতে প্রবৃত্তিমূলক, অন্ত্যে বোধ হয় মূল্যজ্ঞানের সঙ্গে আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, কিন্তু মধ্যে মূল্যজ্ঞান বুদ্ধি, ভাব ও ইচ্ছাশক্তিকে জড়িয়ে কাজ করে। অতএব মূল্যজ্ঞানকে ঠিক 'জ্ঞান' বলা যায় না—অনুভূতি বললে ক্রোচের খপ্পরে পড়তে হয়। দিব্যজ্ঞান বললেও থিয়সফির গর্তে পড়তে হয়। ভাষা নেই বলে একে জ্ঞান বলছি—এ একটা psychosis।

(৫) মূল্যজ্ঞান emergent বলে মনে হয়। এ জ্ঞান অনেকগুলি খণ্ডজ্ঞানের সমষ্টি নয়। এটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি বিশেষ। একটি

দৃষ্টান্ত দিলে কি বলছি বোঝা যাবে। এক একজন ওস্তাদ রাগিণীর প্রকৃত রূপের পরিচয় না দিয়েই তান ছাড়তে আরম্ভ করেন। তান শুনে শ্রোতৃবৃন্দ হকচকিয়ে গেলেন—শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ হল। কিন্তু মূল্যজ্ঞান (sense of values) থাকলে কোনো ওস্তাদ বনেদ না গেঁথে ইমারত তোলেন না। শিক্ষিত সমালোচকও কখনও ভাবেন না অনেকগুলি তানের ছক পর পর বুনে গেলেই সুরের জামিয়ার তৈরী হল। অনেক ওস্তাদের গানে এই দোষ আছে। এ যেন রেখা টানবার আগেই রং চড়ানো। মোট কথা এই যে, রূপ কিংবা রস ছকগুলির যোগ-বিয়োগ নয়। মূল্যজ্ঞান পাটিগণিতের নিয়ম অতিক্রম করে, দুই আর দুই-এ পাঁচ গোছের। তা বলে গান গাইবার সময় টেকনিকের নিয়ম মানতেই হবে বলা বাহুল্য।

এই গেল মূল্যজ্ঞানের কথা। সঙ্গীত-সম্বন্ধে শিক্ষিত সমালোচনার জন্য অন্যান্য জ্ঞানের প্রসার হওয়াও দরকার। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গে রূপ ও রস-স্রষ্টার আন্তরিক বিরোধ নেই পূর্বে লিখেছি। সঙ্গীত-সমালোচকের জন্যও স্বর ও সুরের বৈজ্ঞানিক আলোচনার দরকার। আমি বৈজ্ঞানিক সমালোচনার কথা বলছি না। যত সাহিত্যিক বোকামি দেখেছি তার মধ্যে মুল্টনের Scientific criticism-ই চূড়ান্ত বোকামি মনে হয়। আমি বলছি experimental psychology-র কথা। শিক্ষিত সমালোচনার জন্য বিদেশের ল্যাবরেটরীতে স্বর ও তাল নিয়ে যেসব পরীক্ষা হচ্ছে এবং হয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। সেসব পড়ে শুনে সায়েন্স কলেজের ডাঃ রমণ ও নরেন সেনগুপ্তের কাছে যেতে হবে, বলতে হবে, 'আপনারা ঐ ধরনের পরীক্ষা করুন, ভালো ওস্তাদ ডাকুন, রাস্তা থেকে লোক ধরে তাঁদের ওস্তাদী গান শোনান; দেখুন—সুর, স্বর ও তালের প্রকৃতি কি। পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারাই সমালোচনা সম্ভব। নচেৎ নিজের গুরুর চালই শ্রেষ্ঠ বলা অর্থাৎ গুরুভক্তি দেখানোই সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠবে। আমি আর্টকে ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করতে বলছি না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে, অন্ততঃ

সমালোচনার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে শীঘ্রই পরিগণিত হবে। অনেকে ভয় করেন যে বিজ্ঞানের পরশে সব আনন্দ মরে যাবে।

ভয় হওয়াই স্বাভাবিক, তবে আগে থেকে খুব সাবধানী হওয়া যায় না যে তা নয়। ধরাই যাক যে, বিজ্ঞান রস-বিচারে অকৃতকার্য হবে। অ-বৈজ্ঞানিক উপায়েও যে রসভোগ বেশী হচ্ছে তাও নয়। সাবধানে পরীক্ষার পর যখন রস উপভোগ করতে পারব না, তখনই না হয় সঙ্গীতের ভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা সমালোচক করবেন। নারদ ঠাকুর, হনুমন্ত, ভরতের ঘাড়ে সঙ্গীত সমালোচনার ভার সম্পূর্ণ না চাপিয়ে, বর্তমান ওস্তাদ, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ লোকের উপর সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের ভার দিলে লাভ বৈ ক্ষতি নেই। পরীক্ষার জন্য অবশ্য খুব সাবধানী হতে হবে, সেজন্য কিছু খাটতেও হবে। বাঙ্গালীর পক্ষে দার্শনিক সঙ্গীত-সমালোচনার মতন সোজা কাজ অল্প বয়সে সংসার পাতার পর আর কিছুই নেই।

সোজা কথা সমালোচক যেন empirical হন। কোনো সমালোচক শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। শিক্ষিত সমালোচনার ভিত্তি একমাত্র বর্তমানে যে ভাবে গাওয়া হয় তা-ই হতে বাধ্য—শাস্ত্রানুসারে কি গাওয়া উচিত তা দেখলে চলবে না। সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হবার জন্য যিনি যত ইচ্ছা শাস্ত্র পড়ুন না কেন—সঙ্গীত-রসে রসিক হবার জন্য সমগ্র সঙ্গীত-শাস্ত্র আয়ত্ত করবার প্রয়োজন নেই। সঙ্গীত-আলোচনা আর যাই হোক সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা নয়। এর মানে নয় যে, সঙ্গীত-শাস্ত্রের কোনো মূল্য নেই। তার অন্য হিসাবে যথেষ্ট মূল্য আছে, পরে লিখছি। আপাততঃ রসানুভূতি ও রুচির কথাই সূচিত হচ্ছে। খুব কমই সঙ্গীত-শাস্ত্র আলোচনা করেছি, যা করেছি তাইতে মনে হয় যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের শক্তি বাড়াবার জন্য এবং ওস্তাদকে জব্দ করার জন্য পুথি পড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, জোর করে বলতে পারি না, যে কাব্যালোচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের

অলঙ্কার-শাস্ত্র যতদূর এগিয়েছে, সুরের সৌন্দর্য-তত্ত্বালোচনা ততদূর এগোয়নি। সুরের অলঙ্কার সম্বন্ধে অনেক চুলচেরা তর্ক আছে বটে, একা মূর্ছনা মানে কি সেই সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত জাহির করেছেন, অনাহত ধ্বনির আজগুবী ব্যাখ্যাও আছে ঢের, কিন্তু কোথায় মূর্চ্ছনা, কোথায় মীড়, কোথায় গমক দিতে হবে—কোনো শাস্ত্রে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে না। সঙ্গীত-শাস্ত্রে রুচিজ্ঞানের কথা পড়িনি। কাব্যালোচনায় যেমন অতিশয়োক্তির নিষেধ আছে, সঙ্গীত-শাস্ত্রে সে রকম অজস্র তান-বর্ষণের কোনো নিষেধ আছে কি? সঙ্গীতে রুচিজ্ঞান ওস্তাদের ওপর ন্যস্ত, শাস্ত্রে তার কোনো নিয়মকানুন নেই। অতএব সঙ্গীতে রস ও রুচি সম্বন্ধে আলোচনা করতে সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? শুধু তাই নয়, ওস্তাদের মুখে রাগ-রাগিণী শাস্ত্রে বর্ণিত রাগ-রাগিণী থেকে অনেক তফাত হয়ে পড়েছে। আবার শাস্ত্রও বহুবিধ; এক শাস্ত্র-মতের সঙ্গে অন্য শাস্ত্র-মতের মিল কম। ব্রজেন্দ্রবাবু একা ভৈরোঁ রাগের যত পরিচয় দিয়েছেন তাই থেকে বোঝা যায় মিল কত কম। কোন মতকে প্রাধান্য দেবো? বাংলা দেশে এক মত প্রচলিত বলেই সেই মতকে গ্রহণ করব কেন? অবশ্য ভিন্ন ওস্তাদের মুখে একই রাগিণীর ভিন্ন রূপ শুনেছি, দুর্গা রাগিণীর মত অপ্রচলিত সুরের দুই ঠাট শুনেছি—এক খাম্বাজ ঠাটে, অন্যটি গান্ধার ও নিখাদ বিবাদী করে। কল্যাণ অন্ততঃ তিন প্রকার, বেহাগ তিনপ্রকার, বাগেশ্রীও দুই প্রকার শুনেছি। এ ক্ষেত্রে সমালোচকের কি কর্তব্য? একধারে শাস্ত্রের গরমিল, অন্যধারে ওস্তাদের গরমিল। যেকালে রস গ্রহণের সময় ব্রজেন্দ্রবাবু ও ভাতখণ্ডেজীর মতন পণ্ডিত ব্যক্তিরাও নিজেদের বিদ্যাকে দাবিয়ে রাখেন, যেকালে ওস্তাদের গরমিল শাস্ত্রের গরমিল অপেক্ষা অনেক কম, যেকালে করিতকর্মা ব্যক্তির সব খুন মাপ, তখন ওস্তাদের মুখের সুরকেই শাস্ত্রলিখিত সুরের বদলে গ্রহণ করতে হবে। যেখানে দুই-এর মিল হল সেখানে কোনো কথাই নেই। সুরের রূপ হিসাবে ওস্তাদের মতই গ্রাহ্য—শাস্ত্র বড় জোর কাঠাম দেখাতে পারে।

অন্য ধারে কিন্তু শাস্ত্রের একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষিত সমালোচককে প্রথমে সঙ্গীতের ইতিহাস জানতে হবে। তারই সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতির বৈদগ্ধের ইতিহাস আয়ত্ত করতে হবে। এ ইতিহাস শ্রুতিসাপেক্ষ হলে চলবে না। ঠিক যেমনটি করে দেশের পণ্ডিতবর্গ পুথি, ইট-পাথর ঘেঁটে ভারতের পুরাতন ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে তুলছেন, সেইভাবেই সঙ্গীতের ইতিহাস গড়ে তুলতে হবে। ঐতিহাসিক আলোচনার বিপদ এই যে, উৎপত্তিই বর্তমানের মূল্য হয়ে উঠে, নিজের দেশের জিনিসটাই সবচেয়ে ভালো মনে হয়, অন্য দেশের জিনিসকে হেয় মনে হয়। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বর্তমানকে শ্রদ্ধা করতে হবে—অতীতকে উপায় ছাড়া অন্য কিছু মনে করলে চলবে না। শ্রদ্ধা করার এক উপায় প্রচলিত সুরকে আলোচনার ভিত্তি করা, অন্য উপায় তুলনামূলক বিচার। তুলনামূলক বিচার experimental pyschology দ্বারা সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের বিচারে মনের উদারতা আসে, অন্য দেশের গান বাজনা কুকুর-বেড়ালের ডাক মনে হয় না। তুলনামূলক বিচারের সঙ্গে অবশ্য মূল্যজ্ঞান থাকা চাই। দুই মিলিয়ে যখন মানুষ কাজ করে, তখনই মানুষ ভদ্র হয়, তখন আর নিজের মত পরের ওপর চালাবার রুচি থাকে না, তখন দাম্ভিকতা সরে যায়, দৃঢ়তা আসে। যখন মানুষের মতামত ভদ্র হয়, তখন ভারতবর্ষের সঙ্গীত ভালো না বিলেতী সঙ্গীত ভালো, ঠুংরী ভালো না খেয়াল ভালো—না ধ্রুপদ সবচেয়ে ভালো, এ ধরনের প্রশ্নই ওঠে না। মূল্যজ্ঞান যখন তুলনামূলক বিচারে ওতপ্রোত থাকে তখন ভারতীয় সঙ্গীত ছাড়া অন্য সঙ্গীতে যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতা, যথেষ্ট সূক্ষ্ম কারুকার্য, যথেষ্ট সুর ও তালের কেরামতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতের এমন সময় এসেছে যে, পৃথিবীর কোনো ভালো জিনিসকে বাদ দিলে চলবে না। সঙ্গীত যখন বৈদগ্ধের উত্তমাঙ্গ, তখন বিদেশী সঙ্গীতকে উত্তমরূপে বুঝতে হবে। Experimental psychology এবং comparative study দ্বারা তখন হয়তো বোঝা যাবে যে, সঙ্গীত-পিয়াসী মানুষের স্বভাব ভিন্ন নয়—স্বভাবে যা কিছু ভেদ

আছে সবই অভ্যাসের বশে ঘটেছে, এবং সে অভ্যাসের বাধা দূর করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়।

সঙ্গীত-সমালোচকের ঘাড়ে বোধ হয় সমগ্র রস-সমালোচনার ভার চাপিয়েছি। সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আর্টের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে শিল্পীর মানসিক রীতিনীতি বোধ হয় কবির মানসিক রীতিনীতি থেকে পৃথক। তবুও কিন্তু আনন্দলিপ্সা কিংবা রসসৃষ্টির দিক থেকেই হোক আর যে জন্যই হোক—ঠিক জানি না—সব রস-পিপাসু এবং রসস্রষ্টার মনের মধ্যে একটা যেন কোথায় মিল আছে। বৈষ্ণব-দর্শনের সাহায্যে মিলের কারণ অতি সহজে পাওয়া যায়। তর্কের মধ্যে আর কেষ্ট ঠাকুরকে এনে কাজ নেই—কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। এক কথায় বলতে গেলে সমালোচক বিদগ্ধ পুরুষ। ক্লাইভ বেল তাঁর নতুন বইতে লিখছেন যে, সৃষ্টির চেয়ে সমালোচনাই বৈদগ্ধের সেরা নিদর্শন। এ মতে সায় দেওয়া না গেলেও, সমালোচক যে ভদ্র ও উদার হবেন, একথা সকলেই জানেন। ঔদার্য মানে যদি নতুন রূপ-উপভোগের ক্ষমতা হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ যদি সঙ্গীতে নতুন রূপ সৃষ্টি করে থাকেন, তা হলে যিনি রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের প্রবর্তিত সুরকে সমালোচনার বিষয়বস্তু পর্যন্ত বিবেচনা না করেন; তিনি উদার নন, 'ভদ্র' নন, সমালোচক পদবাচ্য নন। কাব্য-রুচি ও সাহিত্য-রুচি সম্বন্ধে যেমন রবীন্দ্রনাথ ভদ্রতা, অভদ্রতার কষ্টিপাথর হয়েছেন, সঙ্গীত সম্বন্ধেও তিনি তেমনি—একথা বলবার সময় এসেছে। তবে রবিবাবুর গান যার-তার মুখে শুনলে এ কথা বলা যায় না—তাঁর নিজের গান তাঁর চেয়ে অন্যে আজকাল ভালো গাইছেন। অতুল-প্রসাদের গান তিনিই সবচেয়ে ভালো গান। অবশ্য যদি কেউ বলেন যে, এই দুইজন ছাড়া আর কেউ সঙ্গীতে নতুন রূপ দিতে পারে না কি পারবে না, তা হলে তাঁকেও ভদ্র সমালোচক বলতে কুণ্ঠিত হব। আমার আদর্শ সঙ্গীত-সমালোচক—রসিক পুরুষ, ভদ্র ও শান্ত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, শাস্ত্রবিদ্, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং উদার। স্রষ্টা কিংবা

ওস্তাদ হবার তাঁর কোনো বিশেষ প্রয়োজন নেই। তিনি specialist হবেন না। বিদ্যাকে যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র ভেবে, সৃষ্টির শেষ কথা অর্থাৎ রস ও রূপ উপভোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ থাকবে। আমার আদর্শ সঙ্গীত-সমালোচক গম্ভীর হবেন, কিন্তু তাঁর হাসবার ক্ষমতা থাকবে, নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে ঠাট্টা করবার শক্তিও থাকবে। সঙ্গীত-সমালোচনায় বীরবলী মনোভাবের পরশ নিতান্তই বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে।

॥ সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা ॥ ॥ কার্তিক ॥ ১৩৩৫ ॥

অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা

সমবেত সাহিত্য-সেবীদের আমি অভিবাদন করি। ফরিদপুর সাহিত্য-পরিষদের সক্রিয় দীর্ঘজীবন কামনা করি। অভ্যর্থনা-সমিতি এবং অন্যান্য কর্মিবৃন্দের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয় যে আপনারা ইচ্ছা করেই কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে সভাপতিত্বে বরণ করেননি। আপনাদের ইচ্ছাকে বিচার করা আমার কর্তব্য নয়। তবে যে উদ্দেশ্যে ও মনোভাবে আপনারা আমাকে মনোনীত করেছেন সেটা বোধ হয় আমার অপরিচিত নয়। সাহিত্য-সৃষ্টি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রাণ দিয়ে সাহিত্য আলোচনা ও উপভোগ সাধারণের করায়ত্ত। অন্ততঃ, হওয়া উচিত, নচেৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিরর্থক ও অ-সামাজিক অপব্যয়। শিক্ষিত সমাজের কাছে জনসাধারণ বুদ্ধি ও তার প্রয়োগ প্রত্যাশা করে। প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং বিকৃত মস্তিষ্কের কথা বাদ দিলে সাধারণের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য কেবল শিক্ষার সুবিধার তারতম্যেই ঘটে। প্রাণশক্তির মাত্রাও সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না দেখতে পাই, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই প্রাণশক্তি প্রবাহিত। অতএব যে সব অন্ততঃ সামাজিক বাধার দরুন শিক্ষার সুবিধায় অসমতা, এবং প্রাণশক্তির বিভাগ ও প্রকাশে বৈষম্য ঘটে সেই সব বাধা অতিক্রমে সকলকে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। এই আমার বিশ্বাস, আপনাদের মনোভাবও

বোধ হয় খানিকটা ঐ ধরনের। বুদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের বুদ্ধি ও প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ, মার্জিত, বর্ধিত এবং সংস্কৃত করা যায়। কতটা করা সম্ভব পরে দেখা যাবে, কেননা শুনেছি অ-সম বণ্টনই না কি প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য ও লীলা। তাই যদি হয়, তা হলে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও তাই দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে, বর্তমানের সমাজ-ঘটিত বৈষম্যের সঙ্গে সেই গূঢ় ও প্রাকৃতিক বৈষম্যের কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পাচ্ছি না। আপাততঃ আমাদের কাজের কাজ হল এই—আমাদের মানসিক দুর্ভিক্ষের সামাজিক কারণগুলি জানা এবং জেনে সরিয়ে দেওয়া। এ কাজ একার নয়, সকলের। আমি এই সমবেত চেষ্টায় যোগ দেব। আমাদের সকলের স্থির বিশ্বাস যে, শিক্ষালব্ধ মার্জিত বুদ্ধির সাহায্যে উপভোগের বর্তমান মাত্রার অর্থাৎ সমালোচনার বর্তমান অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

অধিকতর লোকের বুদ্ধির চাষ ও প্রাণের বহতা বাড়লে সাহিত্যের মঙ্গল। তাগিদ ও চাহিদা বেশী হলে যোগান আপনা হতে বাড়ে। আমাদের সমাজে প্রকৃত সাহিত্যের চাহিদা কম, অন্য দেশের তুলনায় নেই বললেই হয়। কিন্তু কারণগুলি মোটামুটি একই ধরনের, কম-বেশী কেবল ভাগ্যবিপর্যয়। কারণগুলি আমি যতদূর বুঝেছি আপনা-দের বলছি। সব সমাজেই শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে, প্রধানতঃ অর্থের জন্য একদল প্রতিপত্তি লাভ করেছেন এবং আনন্দ পাবার সুবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের প্রতিপত্তি ও সুবিধা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিযুক্ত হচ্ছে অন্য শ্রেণীকে—যাঁদের আনন্দ ও শিক্ষা পাবার সুবিধা নেই—তাঁদেরকে, এই বন্দোবস্তেই সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষাদানে, অর্থাৎ কুশিক্ষা ও অশিক্ষায়। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিপক্ষে কূটতম আপত্তি ওঠে সবচেয়ে বেশী এই প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর কাছ থেকেই। সোজাসুজি বাধাবিপত্তি তোলার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁদের মনোবাঞ্ছা আমরা মুখরিত করি পণ্ডিতী ভাষায়, প্রকৃতিদেবীর গূঢ় অভিসন্ধি—মানুষের মধ্যে শক্তির অ-সম বিভাগ, এই তথ্যটি উদ্‌ঘাটিত করে। আমাদের যুক্তির অভাব নেই। দৃষ্টান্তেরও অভাব

নেই। এখন মজা হল এই যে, এক হিসাবে সুবিধা হতে বঞ্চিতের সংখ্যা মধ্যস্বত্বোপভোগী প্রতিপত্তিশালীর সংখ্যার অপেক্ষা বাংলা দেশে পাঁচ গুণ বেশী। আমার বক্তব্য হল এই যে, সংখ্যার তারতম্যে সাহিত্যের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। সংখ্যা বস্তুটি কেবল গণনকার্যের যন্ত্র নয়, সংখ্যার অনুপাত পরিবর্তন-গুণবাচক। পরিমাণ যে গুণে পরিণত হয় তার প্রমাণ রসায়ন-বিদ্যার প্রতি পাতায় আছে। তাই বলি, সর্ব-সাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ও প্রাণশক্তির প্রসার সৎসাহিত্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই সোজা কথাটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের চেয়ে সাধারণ পাঠকই বেশী বোঝে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সৃষ্ট সাহিত্যিক হয়তো মনে ভাবেন যে, সাধারণ লোকে কখনই ভালো জিনিস উপভোগ করতে পারবে না। তাঁরা যে 'সাধারণ রুচি' কল্পনা করে থাকেন সে রুচি তাঁদের সমশ্রেণী ও সমধর্মী খবরের কাগজওয়ালা ও তাঁদেরই আশ্রিত পণ্ডিতবর্গের রচিত সাধারণের রুচি। এই সাধারণের অস্তিত্ব নেই। আমি যে সাধারণ জনসমাজের উল্লেখ করছি তারও অস্তিত্ব নেই, তাকে সাহায্য করতে হবে রচিত হতে। প্রথমটি হল অলীক, এবং অলীক বলেই একটি শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপায়, দ্বিতীয়টি মাত্র অপ্রসূত সম্ভাবনা, এবং সম্ভাবনা বলেই আপনাদের ও আমার অতি যত্নের সামগ্রী, আদরের বস্তু। মিথ্যাকে সত্যে অন্ততঃ সম্ভাব্য সত্যে পরিণত করতে হবে। যে শক্তির সাহায্যে এই পরিবর্তন সম্ভব সেই শক্তি একার নয়, সমাজের, যদিও সমাজের মধ্যে সেটি এখনও গুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তিকে আমরা জানতে চাই। তারই পরিণতির প্রতীক্ষায় আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। সাহিত্য-বিচার ও উপভোগ অ-সামাজিক প্রক্রিয়া নয়, সামাজিক ব্যবহারের প্রতিবেশেই সাহিত্য বুঝতে হয়, এই আমার ধারণা।

পূর্বোক্ত সামাজিক শক্তির পরিণতি কখন ও কিভাবে হবে তার সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না। তবে আমাদের বড়ই সজাগ থাকতে হবে নিশ্চয়। আর একটি কথা জোর করেই বলা চলে: যে শক্তির প্রকাশে অন্য দেশের সমাজের পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙে যাচ্ছে,

এবং ভেঙে যাবার জন্যই সেই সব দেশের সাহিত্যের রূপ-পরিবর্তন ঘটছে, সে শক্তির আধার তরুণ সম্প্রদায়। চিরকালেই সমাজে তরুণ ছিল— কিন্তু তরুণের আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনের অর্থ কোনো মধ্যস্থিত ব্যাস থেকে সরে যাওয়া। মধ্যস্থিত ব্যাস হল সামাজিক শৃঙ্খলা—উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থের শৃঙ্খলা আর সামাজিক সত্তার মধ্যে যে প্রভেদ থাকতে পারে তরুণরা পূর্বে বোঝেননি, তাই তাঁদের আন্দোলন আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বলেই পরিগণিত হয়ে এসেছে। আজ তাঁরা বুঝেছেন যে, শ্রেণীর স্বার্থ সমাজের প্রকৃত শৃঙ্খলাও নয়, মেরুদণ্ডও নয়। শৃঙ্খলাটি কি, ব্যাসটি কোথায়, তাঁরা বোঝেন না, আন্দাজী তার একটা নাম দিয়েছেন সমাজ-সত্তা। হয়তো নামকরণও সব দেশে এখনও হয়নি। আজ যে সমগ্র বিশ্বে তরুণ আন্দোলন চলছে তার মূল কথা এই সমাজ-সত্তাকে অনুসন্ধান করা, আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা। তাঁদের কর্মে ও বক্তব্যে হয়তো মূল তথ্যটি ঠিক পরিস্ফুট হয়নি, একে তাঁরা তরুণ, তায় দেশের অবস্থা ভিন্ন। কিন্তু একথা ঠিক যে, যুদ্ধের পর যুবক-যুবতীরা নানা বিষয়ে নানা মতামত প্রকাশ করছেন। শ্রদ্ধাভক্তি তাঁদের কমছে। তাঁরা বলছেন যে, তাঁদের দেশের বৃদ্ধেরা এতদিন ধরে বড় বড় গালভরা কথা দিয়ে দেশকে, অর্থাৎ দেশের অন্য শ্রেণীকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের সম্পত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এসেছেন; আজ তাই যুবকদের কাছে আদর্শবাদ বড়ই কটু ঠেকছে। আজ তাঁরা নিজেরাই নতুন আদর্শ গড়ে তুলতে ব্যগ্র, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁদের সমগ্র ও প্রকৃত সামাজিক সত্তার ওপর। সে আদর্শ শ্রেণীগত স্বার্থের শৃঙ্খলার দ্বারা গ্রথিত নয়। যন্ত্রপ্রধান সভ্যতায় সামাজিক সত্তার বর্তমান রূপ হল শ্রেণী-বিভাগ। দুঃখ এই যে, সমাজ-সত্তার প্রকৃত রূপের পরিচয় পেতে হলে এই শ্রেণী-বিভাগের বিপক্ষে বিরোধ বেধে যায়। একেই শ্রেণী-বিভাগের সম্বন্ধ বিরোধের, তার ওপর সেই বিভাগের আবরণ ভেদ করতেও বিরোধ, তাই আজ বিরোধই সর্বত্র প্রকট হয়েছে। তরুণরা এই বিরোধের শক্তিকে স্বীকার করে তাকেই কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়েছে। একটি প্রধান সামাজিক কাজ সাহিত্য-সৃষ্টি, সাহিত্যে

সেইজন্য এত ঝাঁজ, এত উগ্রতা। তরুণের অনুচ্চারিত বক্তব্য হল এই —সমাজ-সত্তাকে স্বীকার কর, নচেৎ কোনো কাজই করা যাবে না। আমি তরুণ না হলেও একই কথা বলি, আমাদের দেশের অবস্থায় ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে কিছু পার্থক্য থাকলেও অন্তরের বিরোধে আমরা বোধ হয় এক। আমাদের তরুণ সাহিত্য যদি বাস্তবিকই নবযুগের সাহিত্য হতে চায়, সত্যিকারের রিয়ালিস্টিক হতে চায়, তা হলে তরুণ সাহিত্যিককে আমাদের প্রকৃত সমাজ-সত্তা কি, বুঝতে হবে; তার রূপ পরিবর্তনের শক্তিকে স্বীকার, গ্রহণ ও নিয়োগ করতে শিখতে হবে। নচেৎ তরুণ সাহিত্য তরুণ তো হবেই না, সাহিত্যও হবে না, কর্তাদের ভাববিলাসের উপকরণ ও অযোগ্য অনুকরণ হবে।

আমাদের সমাজের সত্তা কি বোঝাতে পারব না। জোর করে বলতেও পারি না আমাদের সমাজে অন্য দেশের মতো শ্রেণী তৈরী হচ্ছে কিনা। এইবারকার আদমসুমারিতে লেখা আছে, নতুন গণনা-পদ্ধতির জন্য তুলনায় ভুলচুক বাদ দিয়েও চাষী-অধিকারী এবং প্রজা-চাষীর সংখ্যা ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে শতকরা ৩৫ কমেছে; আর কেবল চাষী-মজুরের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৫০ জন, ৩,৯০,৫৬২ থেকে ৬,৩৩,৪৩৪ পর্যন্ত। বাংলা দেশে সবসুদ্ধ শতকরা একশ' জন জমিদার ও অনুচরবর্গের তুলনায় ১২৯৭ চাষী-মজুর আছে, যদিও গড়পড়তা গোমস্তার দল কিছু হ্রাস পেয়েছে। ফরিদপুরে চাষী মজুরদের সংখ্যা কিছু কম, শতকরা ৯৬৬ জন। ব্যবসাবৃত্তিধারীর সংখ্যা কিছু কমলেও মধ্যবিত্ত চাকুরে ও উকিল ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সবচেয়ে বেড়েছে জমি-স্বত্বোপভোগী ভিন্ন নিজের ব্যক্তিগত আয়ভোগীর এবং চাকরবাকরের দল, প্রথমটি ১৩,৬৪৬ থেকে ২৫,২৬১ এবং দ্বিতীয়টি ৪,৫৫,২৪৬ থেকে ৮,০৯,৭১৫। আদমসুমারির সংজ্ঞা ও হিসেবেই যাঁরা জমি থেকে ধন উৎপাদন কার্যে ব্যাপৃত নন তাঁদের তুলনায় নিতান্ত ভূমি-নির্ভরশীলের সংখ্যা গড়পড়তায় ষোলগুণ বেশী। সমগ্র বৃত্তি ধরলে লোকসংখ্যার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ সামাজিক ধন বৃদ্ধি করছেন। এই অনুপাত ১৯০১

সাল থেকে ক্রমেই বেড়ে আসছে। আমি কল-কারখানার শ্রমজীবীর কথা তুলছি না, এখানে এবং এই দেশে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ বাংলা সমাজের, সে সমাজের মেরুদণ্ড জমিস্বত্ব। জমির অধিকার পরিবর্তনেই সমাজের সত্যকার শ্রেণী তৈরী হতে পারে। চাকুরে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও যে শ্রেণী তৈরী হতে পারে না তা বলছি না। কিন্তু চাষবৃত্তিধারীর সংখ্যা এদের চেয়ে পঁচিশগুণ বেশী। অতএব সন্দেহ হয় যে, গোপনে শ্রেণী তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছে। তবে বিরোধও এখনও প্রকট হয়নি নিশ্চয়। হওয়া ভালো কি মন্দ জানি না, তবে মনে হয় বিরোধও বাদ যাবে না। তবে তার ভীষণতা চেষ্টা করলে কমানো যায়, বিশেষতঃ কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে অধিকার চাওয়ার অপেক্ষা দাবিপূরণই সামাজিক অবস্থান নিরূপিত ক'রে মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অন্য দেশের ইতিহাসের সব ধাপই পরপর অতিক্রম করতে হবে তাও নয়। এমন কি ভীষণ বিরোধ বাদ দিয়েও শ্রেণীর অবসান ও সমাজ-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও আয়ের বিভাগে অন্য উন্নত দেশের তুলনায় আপেক্ষিক কম। বৈষম্য, অশিক্ষিতের সংখ্যা, আমাদের রোম্যান্টিক গণ-আন্দোলন, মহাপুরুষে ভক্তি এবং আমাদের কংগ্রেস-নীতি বিচার করলে সন্দেহ হয় যে, জনমত জাগ্রত হয়ে ফ্যাসিজ্‌মের কোনো-না-কোনো রূপ বরণ করবে। যে সামাজিক বিপ্লব অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা সাধিত হয় তাও এ দেশে সম্ভব কি না জানি না—যদি হয়, তখনও বিরোধ উহ্য থাকবে। এ সব বিষয়ে কেউ ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে না। কেবল বলা চলে, বিরোধকে স্বীকার করেই হোক আর অন্য কোনো শক্তিকে গ্রহণ করেই হোক সাহিত্যে সমাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি বিরোধের ফলে সত্তার প্রতি আমাদের স্থিরদৃষ্টি ভ্রষ্ট হয় তা হলে আমাদের সাবধান হতে হবে। যদি অন্য উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই উপায় গ্রহণ করতে হবে। তবে যাঁদের জন্য সমাজের অতএব সাহিত্যের এই দুর্দশা তাঁরা কি ছেড়ে কথা কইবেন? কইবেন না;

তখন ন্যায়তঃ ধর্মতঃ বিরোধ আনার গুরুদায়িত্ব তাঁদের ওপরই পড়া উচিত। কর্তার দল এ ভার গ্রহণ করতে রাজী হবেন না, তাঁরা বলবেন, নিম্নশ্রেণীরাই বিরোধ বাধিয়েছে। আমার বিশ্বাস শ্রেণী-বিরোধ তাঁদেরই সৃষ্টি, এমন কি কথাটির দুষ্ট ব্যবহারটি পর্যন্ত। নচেৎ 'বিরোধ' সংজ্ঞাটির মধ্যে দোষ-গুণ কিছুই নেই। যে আগে ব্যবহার করতে পারে তারই জিত। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই যে, সমাজের নতুন গঠন না বুঝে লেখার জন্যই সাহিত্য সর্বত্রই অবাস্তব হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে রিয়ালিস্টিক সাহিত্য।

পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি যে পুরাতন আদর্শবাদের মোহ আজ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আদর্শবাদকে ত্যাগ করা চলে না, তরুণে ত্যাগ করতে পারে না। আমরা অনেকেই বুঝেছি যে, অন্যায় দূর করা উচিত এবং সমাজকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। পুরাতন সমাজের মূলে ছিল সম্পত্তি-বিভাগে বৈষম্য। সে বৈষম্য রক্ষা করার দরুনই বড় বড় মিষ্টি গালভরা কথার প্রয়োজন ছিল ; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, আর্টের জন্য আর্ট, অভিজাত সম্প্রদায় ও বিদগ্ধ পুরুষের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে মূলে আজ ঘা পড়েছে, তাই বড় কথা ভুয়ো ঠেকছে। আজ মনে হচ্ছে ভগবান, ধর্ম, ব্যক্তিত্ব, আর্ট, স্বরাজ, স্বদেশপ্রেম—এসব বাইরের এনামেল, ভেতরের লোহা হল সমাজ, দুর্ভাগ্যবশতঃ সমাজের পতিত ও বঞ্চিত শ্রেণী, তাদের দেহ ও মনের ক্ষুধা মেটাবার অসুবিধা, অবকাশহীনতা। সর্বপ্রকার ক্ষুন্নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় তরুণরা আজ অনুপ্রাণিত। এ দেশে সে আকাঙ্ক্ষার তেজ কম নানা কারণে, তবে যতটুকু আছে তাকে চেষ্টা করলে বাড়ানো যায়। আমার ক্ষুধা আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, আপনাদেরই মতন। তবে আমি জানি, আপনারাও বোধ হয় জানেন যে, যতদিন আকাঙ্ক্ষা না জোরাল হয়, না মেটে, ততদিন আমার বাঁচা হবে কৃমির মতন বাঁচা। কৃমির জীবন আমার আদর্শ নয়, আমি আরও ভালো করে বাঁচতে চাই, সেজন্য ভালো সাহিত্য আমাকে পেতেই হবে, কেননা সাহিত্যিক হলেন সমাজকর্তা, তাঁর কাছে আমি অনেক

প্রত্যাশা করি। আমরা সকলেই বাঁচতে চাই, ভালো করে, আরও ভালো করে, নতুন নতুন উপায়ে। সাহিত্য ভালো করে বাঁচবার সহায়তা করে। (রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন উন্নত হয়েছে)। সাহিত্য আমাদের আদর্শ নিরূপিত করে কিনা জানি না, তবে যে শক্তির দ্বারা আদর্শ সৃষ্টি হয়, সেই শক্তির দ্বারাই সাহিত্যের আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিভাত হয় নিশ্চয়। সে শক্তি সমাজের, সামাজিক পরিবর্তনের গতিতে তার উৎপত্তি। কেননা এই আদর্শ স্থির নয়, চিরন্তন নয়, একটি বিশেষ শ্রেণীর নয়; এ আদর্শ গতিশীল, চলিষ্ণু, পরিবর্তনশীল, সর্বসাধারণের। সমাজও তাই; যে সমাজে অত্যাচার নেই, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ভালো করে বাঁচতে পারে, সেই সমাজের দিকে অগ্রস্থতিই আমার ও আপনাদের আদর্শ ঠিক করে দিচ্ছে। সেই সমাজেই যে সাহিত্য হবে তাতে কাঁটা থাকবে না। সকলেই নিজের নিজের প্রকৃত ক্ষমতা অনুসারে সে সাহিত্য উপভোগ করতে পারবে। এখন সকলে আনন্দ পায় না; কেননা এ আর্থিক বৈষম্যের জন্য তারা আনন্দ উপভোগ করতে শেখেনি। আজ সৎসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা কম, অর্ধশিক্ষিত, এবং সমাজ-সত্তা সম্বন্ধে অচেতন বলে সৎসাহিত্যের চাহিদা কম, নতুন সমাজে চাহিদা বাড়বে, চাহিদা বাড়লে যোগান অন্ততঃ খানিকটা বাড়বে আমি বিশ্বাস করি। এটুকু আপনারাও নিশ্চয় স্বীকার করেন।

'স্বীকার' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা সমাজকেই সবচেয়ে কঠিন সত্য মনে করি, মুখে অন্ততঃ আমরা সকলেই সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তার বেশী কিছু জানি না। তাকে বদলাতে হবে আমরা বুঝি কিন্তু কি করে করব আমরা জানি না। আমরা কেউই ভবিষ্যদ্‌বক্তা নই, নেতা নই, এবং সন্দেহ করি সমাজে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যবহারকে। মনে হয়, যেসব ঘটনার দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎ-রূপ প্রবর্তিত হয়, তাদের অঙ্কাধীন করা তো দূরের কথা করায়ত্ত করাও শক্ত। তবে আমরা সকলেই এই সব বিষয়ে জানতে চাই, সচেতন হতে চাই, ভবিষ্যৎকে মুঠোর মধ্যে আনতে চাই।

আমাদের জানবার প্রবৃত্তি আছে এবং কাজ করবার প্রবৃত্তিও আছে। এক কথায় আমরা ইতিহাসের মর্মকথা বুঝতে চাই। বোঝাটা কাজ করা থেকে পৃথক ব্যবহার নয়। বুঝে কাজ করলে, কিংবা কাজ করে বুঝলে ব্যাপারটা সহজ হবে নিশ্চয়। ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা তখনই শক্ত যখন ইতিহাস মানে নিয়তি। এতদিন ইতিহাসকে অতি-প্রাকৃতের অত্যাচার বলে গণ্য করে এসেছি, তাকে অন্ধ শক্তি কিংবা নিয়তির নাম দিয়েছি, ইতিহাস বলতে পুরাতন পাঁজি-পুথি ঘাঁটা এবং প্রমাণ-তর্কের ব্যবহার-ক্ষেত্রই ভেবে এসেছি, তাই আমাদের ইতিহাসকে কেবল মানতেই হয়েছে, মুখস্থই করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক দার্শনিকের মতনই সমাজকে ব্যাখ্যাই করে এসেছেন, সমাজকে গড়ে তোলেননি। যা হচ্ছে তাই ভালো, কেননা তাই বুদ্ধির নিয়মানুযায়ী, অতএব পুরাতনের চিন্তা করা ছাড়া অন্য কর্তব্য আমাদের নেই, আমরা এতদিন এই ভেবে এসেছি। কিন্তু ইতিহাস সমাজেরই ইতিহাস এবং সমাজ মানুষেরই সমাজ, একথা মনে পড়েনি। আমরা বিশ্বাস করিনি যে, মানসিক প্রক্রিয়ার অনেক মিল থাকে, সেই মিলের উপরই সমাজের ভিত্তি এবং সেই ভিত্তির উপরই ইতিহাসের ইমারত খাড়া করা হয়েছে। অতএব সেই ইতিহাসের কোথাও না কোথাও মূলগত ঐক্য থাকবেই থাকবে অর্থাৎ নিয়ম থাকবে। আজ আমাদের অজানিতে আমরা সকলেই ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়েছি, আমাদের কর্মপ্রবৃত্তি ভাবনায় শান্তি দিচ্ছে না। সেজন্য নতুনতর সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত না হলেও তার ঐকান্তিক প্রয়োজন স্বীকার করি, এবং ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করে অন্ততঃ আংশিকভাবে অতিপ্রাকৃত, প্রাকৃতিক ও তথাকথিত সামাজিক নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হতে চাই। আমরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসি না, নিষ্কর্মা হয়ে পুরাতন মহিমায় ডুবে থাকতেও চাই না। এই প্রকার অক্ষমতা, এবং কাজ ও চিন্তার সাহায্যে ক্ষমতা-অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই আমাদের যোগসূত্র। এই

প্রকার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার ইচ্ছার অর্থ হল স্বীকার, সমাজ-সত্তাকে স্বীকার।

পূর্বোক্ত মনোভাব নিয়ে আমি সাহিত্যসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার মতামত—যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কোনোও সম্বন্ধ স্বীকার করতে চান না, কিংবা সাহিত্যিকের জন্যই সাহিত্য বিবেচনা করেন, কিংবা যাঁরা পুরাতন সমাজকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে চান—তাঁদের মনঃপূত হবে না। সাহিত্য-সম্বন্ধে এতদিন যা ভাবছি, অল্প কথায় আপনাদের তাই বলব—বিস্তারিতভাবে বলবার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। বর্তমান যুগের সর্বদেশের সাহিত্যই ভারি লঘু ঠেকে; ঠুনকো মনে হয়, বুনন তার ঠাস নয়, বিশেষ করে আমাদের সাহিত্য। **রবীন্দ্রনাথ** ও **শরৎচন্দ্র** আমার মন্তব্যের বাইরে। আমার ধারণা এই যে, বর্তমান সাহিত্যিক সাহিত্য-বস্তুর সত্তা স্বীকার করতে পারেননি, স্বীকার করতে ভয় পান। সাহিত্য-বস্তু হল মানুষ এবং মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ। মানুষ সামাজিক জীব এবং মানুষের সম্বন্ধই হল সমাজ; সমাজ বদলাচ্ছে মূলতঃ আর্থিক কারণে, ও কলকব্জা, যন্ত্র আবিষ্কার অর্থাৎ বিজ্ঞানের দৌলতে। বিজ্ঞান অর্থে কেবল নৈসর্গিক প্রকৃতিকে বশে আনা নয়, বাইরের সমাজ ও অন্তঃপ্রকৃতিকেও বশে আনা। জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় নৈসর্গিক প্রকৃতিকে জয় করা মানুষের সম্বন্ধ ও স্বভাবকে জয় করা অপেক্ষা সহজ। কিন্তু তাই বলে সমাজ ও অন্তর আমাদের শক্তির বহির্ভূত নয়। সামাজিক ব্যবহার ও অন্তর্গত দৈহিক ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমেই আমাদের বিশদ হচ্ছে। সেই জ্ঞানবৃদ্ধির পদ্ধতি এক ভিন্ন দুই নয়। এই দুই প্রকার জ্ঞান এবং একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা বুঝেছি যে, উৎপাদন-শক্তির রূপপরিবর্তন হলে সমাজের রূপপরিবর্তন হয়। অতএব সাহিত্যবস্তুর পরিবর্তন অস্বীকার করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী হই। বিজ্ঞানের ফলাফল না গ্রহণ করে যে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় তার মূল্য অকালের ফুল-ফলের

মতনই। নতুন উৎপাদন-শক্তির তাগিদে সামাজিক পরিবর্তন, সমাজিক সত্তার গঠন-পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের ফলে মানুষের আচার-ব্যবহারের প্রভেদ ও সংঘাতই হল সাহিত্যের প্রকৃত সত্তা। আমার বিশ্বাস পুনরায় বলছি—বর্তমান সাহিত্যের লঘুত্ব, এই প্রভেদ ও সংঘাতকে না মানার জন্য। এ দেশে আমরা সকলে সমাজ-সত্তাকে পাশ কাটিয়ে আসছি, তাই আমাদের সাহিত্য আমাদের সমশ্রেণীর প্রাণেই কেবল সাড়া দেয়, জনসাধারণের কাছে তার কোনোও আবেদন ও মূল্য নেই। অথচ সাহিত্য এক তরফা ডিক্রি নয়ই নয়, কোনোও আর্টই নয়। সাড়া না পেলে সাড়া দেওয়া যায় না। সাড়া না দিতে জানলে সাড়া পাওয়া যায় না। এতদিন সর্বত্র, অন্ততঃ গত কয়েক শতাব্দী ধরে, সাহিত্য ছিল ধনী ব্যক্তির সখের সামগ্রী, সৃষ্টির নামে ধনী শ্রেণীর আত্মপ্রসাদ, এবং উপভোগের নামে নির্ধনের ও অশিক্ষিতের আত্মপ্রবঞ্চনা। এখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে কল ও যন্ত্র এসেছে। টান পড়েছে তার গ্রামে গ্রামে, কেবল আমাদের মগজেরই টনক নড়ছে না। সমাজ গেল ভেঙে, মানুষের ব্যবহার গেল বদলে, অথচ সাহিত্যিক খরগোশের মতন ভাবছেন, চোখ বুজলেই বিপদ কেটে যাবে। **তা হয় না, তা হয় না, তা হয় না।** এখন চোখ খুলে দাঁড়াতে হবে, সমাজ ভাঙার ও গড়ার শক্তিকে, তাকে বিজ্ঞানই বলুন বা শ্রেণী-বিরোধ বলুন—কি দুইই বলুন, আমার তাতে আপত্তি নেই, ব্যবহার করতে হবে। তবেই হবে সৎসাহিত্য, নাটকের মতো নাটক, নভেলের মতো নভেল, গল্পের মতো গল্প—তবেই হবে সতেজ সাহিত্য যা আমাদের নেই। কেবল নেই নেই বলে আফসোস করলে চলবে না। সামাজিক বিবর্তনের শক্তির দ্বারা আমরা নব্য সাহিত্য সৃষ্টি করব। জীবনকে অগ্রাহ্য করছি অথচ সকলকে আনন্দ দেব, এ কি হয়? সামাজিক সত্তা, সমস্যা ও তার স্বীকার, নিরাকরণ বাদ দিলে সাহিত্য হয় একদেশদর্শী, প্রাণহীন, ছোট, হালকা, ঠুনকো, বেলোয়ারী। সাহিত্যিক নিশ্চয়ই সমাজকে স্বীকার করবে, কেননা সমাজ হল মানুষের সম্বন্ধ, তবে যে শ্রেণীর হাতে সমাজ পড়েছে সে সমাজকে নয়।

সাহিত্যিক সেই সামাজিক সমস্যার সমাধান করবে, কেননা সে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও নেতৃত্ব করবার শক্তি ও বাসনা তার আছে, তবে সে সমস্যা ঐ ওপরকার শ্রেণীর চিন্তাবিলাস—সে সমস্যা নয়, ভাঙাগড়ার সমস্যা। এ যুগে বেড়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মজা দেখা কাপুরুষতা। এ সময়, অপক্ষপাতিতা, ঔদাসীন্য, মধ্যস্থতা করা, সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও শঠতা। বিজ্ঞানে শুনেছি রায় না দিলেও চলে, যদিও আমি তা বিশ্বাস করি না, কিন্তু সাহিত্যে নিজেকে বাদী-প্রতিবাদী হতেই হবে, এ যে মানুষের জীবন নিয়ে কারবার, কেবল মায়ার খেলা নয়। চাকরিস্থলে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' প্রণালীটা উপকারী, কিন্তু সাহিত্যে অচল। সাহিত্যিককে দলে নামতেই হবে, দলের হয়ে তাকে লড়তেই হবে, দল অর্থে ছোট্ট গণ্ডী নির্দেশ করছি না, হাট-বাজারের কোলাহল তাকে শুনতেই হবে, জীবন নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতেই হবে। চিরন্তন মূল্যের দোহাই দিয়ে নিজেকে কূপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে, চিরকাল ধরে ভোগস্বত্ব উপভোগ করবার বাসনা পোষণের জন্য তাকে দায়ী হতে হবে, জবাবদিহি পর্যন্ত করতে হবে। আমার সিদ্ধান্তগুলি যে সহানুভূতির নামান্তর নয় প্রমাণ করবার জন্য, তাদের গোড়াকার বিচার-বাক্যগুলিকে একত্রে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। একটি অন্যের সঙ্গে যুক্তির গাঁটছড়ায় বাঁধা।

(১) সাহিত্য মনের ক্রিয়া ; মন মানুষের। মানুষের মন জীবন-যাত্রার একটি উপায়, জীবনের কাজ অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, প্রকৃতির সঙ্গেও। প্রথমটির নাম সমাজ গঠন, দ্বিতীয়টির নাম বিজ্ঞান। এর একটি অন্যটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। দু'টোই ক্রিয়াবাচক। অতএব সমাজে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা থেকে মানুষের মনের কোনো ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, বিচ্ছিন্ন করলে মানসিক ক্রিয়াকলাপ অন্যের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে, যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করলে চিন্তা হয়ে ওঠে কাজের চেয়ে ঢের বেশী দরকারী জিনিস, অতএব সত্তার বিচার হয় সেই চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত সঙ্গতি দিয়ে, যেমন দর্শনের মতো আর্টেও হওয়া উচিত বলা হচ্ছে।

কিন্তু সত্য কথা অন্য ধরনের। জ্ঞান ও কর্ম পৃথক নয়, কর্মের জন্য জ্ঞানের উদয়। সেই জ্ঞানের সাহায্যে কর্মের সুবিধা ও সুব্যবস্থা, আবার তারই ফলে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান। কাজের সেরা কাজ জীবনযাত্রা, আরো ভালো করে, নতুনভাবে, তীব্রতর উপায়ে, ব্যাপক-ভাবে, সমগ্র শক্তিকে পুরোদমে খাটিয়ে, নতুন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্যই জীবনের শেষ নয়, যেমন জীবনের শেষ নয় দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা অন্য যে কোনো আর্ট; ভালো করে জীরন চালানোই সাহিত্যের শেষ, যা-তা করে, যেমনভাবে জীবন চলে আসছে তেমন-ভাবে নয়। অবশ্য জীবনের অর্থ বদলে গেলে আমার বক্তব্যও বদলে যাবে। আপাততঃ জ্ঞান উপায় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অতএব বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের জীবন যে কেবল প্রতিফলিত হবে তাই নয়, তখনকার সমাজ-গঠন ও জীবনযাত্রার রীতিনীতির ইঙ্গিতও সেখানে থাকা চাই। এই হল সাহিত্যের যথার্থ ঋণ-পরিশোধ, এইখানেই তার নেতৃত্ব ও যথার্থ প্রতিপত্তি।

(২) সমগ্র ইতিহাসই সম-সাময়িক ইতিহাস, অর্থাৎ ইতিহাসের মর্ম-উদ্‌ঘাটনের সময় এখনই, প্রত্যেক মুহূর্তেই। যাঁরা মর্ম-উদ্‌ঘাটন করে ভবিষ্যৎ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দিতে পারেন, সাহিত্যিক সেই দলেরই একজন। তিনিও অন্যের মতন ইতিহাসের নিয়ম-আবিষ্কারক, তবে তিনি ইতিহাসের নিয়মাবলীকে বিচার-বাক্যে পরিণত করেন না, মানবচরিত্রের সংঘাতে, ব্যবহারের পরিবর্তনে পরিস্ফুট করেন। দার্শনিকের আবিষ্কৃত নিয়ম নিরালম্ব, আবেগশূন্য, সাহিত্যিকের নিয়ম ব্যক্তির সম্পর্কিত, আবেগময়, চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশিত। তাই সাহিত্যিকের আবিষ্কৃত নিয়ম আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করি। আবার সেইজন্যই এই 'স-গুণ' নিয়মের আবিষ্কারকদের অন্যের চেয়ে বেশী খাতির করি। মানুষের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ধারা কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সাহিত্যিক জানেন বলেই সাহিত্যিক কালের অধীন নন। নিয়তির নিয়ম জানেন বলেই

সাহিত্যিক স্বাধীন, অতএব কালাতীত। সাহিত্যে চিরন্তন মূল্যের অর্থই হল এই। যে সাহিত্যিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের ইতিহাসের সামাজিক পরিবর্তনের গূঢ় কথা বোঝাতে পেরেছেন তিনিই বিশ্ব-সাহিত্যিক, তিনিই দেশের প্রকৃত নেতা। আজকালকার সাহিত্যিক পরিবর্তনের কিংবা ইতিহাসের তোয়াক্কা রাখেন না, তাই নেতৃবৃন্দের প্রকোপ। সাহিত্যিকের কাছে সমাজ অনেক বেশী প্রত্যাশা করে, সাহিত্যিকের দায়িত্ব অন্যের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁরা কেবল 'আর্টিস্ট' হয়ে সমশ্রেণীর আনন্দবিধান করলে সমাজের আশা মেটে না, সমাজের সাথে সম্বন্ধকে (কর্তব্যের কথা নাই তুললাম) অস্বীকার করার জন্য তাঁদের ক্ষতি হয়, অতএব আমাদের প্রত্যেকের ক্ষতি হয়।

অতএব আর্টের জন্য আর্ট বিশ্বাস করি না, কারণ তা হলে টাকার জন্যই টাকা রোজগার, মন্দর জন্যই মন্দ, ভালোর জন্যই ভালো কাজ করায় বিশ্বাস করতে হয়, আর মানতে হয় কেবল বসবাসের জন্যই বসতবাড়ি, আরামের জন্য নয়, ভালো করে থাকবার জন্য নয়। ঐ বাক্যের তাৎপর্য এইটুকু—আর্টিস্ট যেন নিজের কাজে ফাঁকি না দেন, সস্তায় নাম কেনার জন্য কিংবা বড়লোক হবার জন্য তিনি যেন সততার পথ থেকে বিচ্যুত না হন। আর্টের জন্য আর্ট মানার অর্থ হল, কর্ম থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা, আর্টের বিষয়বস্তু, সমাজ-সত্তাকে পরিত্যাগ করা, ইতিহাস না বোঝা, এবং জীবনকে দূরে সরিয়ে রাখা, উপায়কে উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন বিবেচনা করা। 'আর্টের জন্য আর্টের' যুক্তিগত সঙ্গতি হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু সে যুক্তি জীবন ও পরিবর্তনের যুক্তি থেকে বিযুক্ত। কোন যুক্তি মানবো? কেতাবে-পড়া সত্তার সঙ্গে অসম্পর্কিত যুক্তি, না জীবনের, পরিবর্তনের, ইতিহাসের দুর্বোধ্য অথচ দুর্নিবার যুক্তি? কর্ম থেকে চিন্তাকে বৃন্তচ্যুত করবার জন্যই, (যাঁরা করেছেন তাঁদের কৃপাতেই) একটি অন্যটির বিপরীত-ধর্মী হয়ে উঠেছে। যাঁরা যুক্তির অন্তর্নিহিত সঙ্গতির ওপরই যুক্তির সার্থকতা নির্ভর করছে প্রমাণ করতে ব্যগ্র তাঁরাই সামাজিক জীবনের, ইতিহাসের, পরিবর্তনের প্রতিকূলে পাল তুলে অ-জানার উদ্দেশ্যে

ভেসে চলেন। আমরা কিন্তু নিজহাতে গড়তে চাই, আমরা ভাসতে চাই না, কূল-কিনারা আমরা জানতে চাই, দিশেহারার অবস্থা আমাদের ভালো লাগে না। ভেসে বেড়াবার বিলাস আমাদের বরদাস্ত হয় না। আর্টের জন্য আর্ট হল অনেক ক্ষেত্রেই একটি শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভদ্র ভাষা, অর্থাৎ পরিভাষা, নিজেদের প্রতিপত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির নামান্তর, নিঃশেষিত হবার পূর্বনিঃশ্বাস, এবং জনসাধারণের রসোপভোগের অন্তরায় সৃজন, অতএব রসসৃষ্টির একটি প্রধান বিপত্তি।

(৩) সাহিত্য হল মানুষের মনের ক্রিয়া, সমাজের বাইরে মানুষ নেই, কেননা, মানুষের সম্বন্ধই হল সমাজের প্রাণ। সমাজের বাইরে আছেন যোগী-ঋষি, কিংবা বাঘিনী-প্রতিপালিত মানবশিশু। শেষ জীবটির সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কম, প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এখনও আছে। অবশ্য যোগী-ঋষির সাহিত্যিক সৃষ্টি ও মতামতের মূল্য সমাজের কাছে কম, শিষ্যের কাছেই বেশী। যতদিন না সমগ্র সমাজ শিষ্য হচ্ছে ততদিন মহাপুরুষদের কথা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। সাহিত্য একপ্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকা চাই, প্রক্রিয়াটি ঠিক খেলা নয়; খেলারও উদ্দেশ্য ছিল আদিমযুগে, এখনও অন্য রূপে আছে, পরেও থাকবে, অন্য রূপে। এমন কি যোগেরও একটা উদ্দেশ্য আছে, আনন্দ কিংবা শান্তি, কিংবা স্বরাট্ হওয়া। নিষ্কাম প্রক্রিয়া কাঁটালের আমসত্ত্বের মতন কথার কথা। প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকলে সে উদ্দেশ্যের মূল্য থাকা চাই। উদ্দেশ্য বাইরের কোনো ভাব হলে একজনের হওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিতরের, কাজ থেকেই তার উৎপত্তি, অতএব উদ্দেশ্য একাধিক ব্যক্তির। উদ্দেশ্যর মূল্যও একজনের দান নয়, উদ্দেশ্যর মূল্য সম্বন্ধে জনকয়েকের মতামতে মিল থাকা চাই, নচেৎ সাহিত্য ডাকটিকিট-সংগ্রহের চেয়েও নীচুস্তরের খামখেয়াল হতো। যাঁদের শিক্ষাদীক্ষার আনন্দ পাওয়ার ও সৃষ্টির সুবিধা ছিল এতদিন তাঁরাই ছিলেন জনকয়েক। সেই ওপরতলার বাসিন্দার মতামতে মিল থাকলেই যে কোনো উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের

বলে গৃহীত হতো, সর্বসাধারণকে গ্রহণ করানো হতো, বিচার করবার সুযোগ না দিয়ে, নানাপ্রকারে। এখন জনকয়েক আর কয়েকজন মাত্র নয়, তার অর্থ আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কী আশ্চর্য! যখন সাহিত্য ছিল একটি মাত্র শ্রেণীর প্রক্রিয়া, তখন সে প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামতের প্রচারকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বলা হতো না, তখন সাহিত্য হতো সাহিত্যের জন্য। তার মধ্যে চিরন্তন মূল্যের আভাস পাওয়া যেত, আর এখন ঢের বেশী সংখ্যক লোকের মধ্যে মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মতের ঐক্যকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বলেই সাহিত্যকে জাতিচ্যুত করা হচ্ছে। আমার বক্তব্য, অধিকসংখ্যক লোকের মতামতকে সংখ্যাধিক্যের জন্য, কিংবা বিপরীত মতামত-পোষণ ও উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই প্রোপাগ্যাণ্ডা বলা অন্যায়। যাঁদের উদ্দেশ্যর সঙ্গে, স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে তাঁরা অবশ্য তাই বলবেন। তাতে এসে যায় না, তাঁরাই প্রথম পথ দেখিয়েছেন। সাহিত্য—অন্ততঃ নবযুগের সাহিত্য প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হতে বাধ্য। রামায়ণে, মহাভারতে আর্যধর্ম, ক্ষাত্রধর্মের তরফদারি আছে; রবীন্দ্রনাথেও আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার; পুরাতন সমাজের বিপক্ষে এবং এখনকার নতুন সমাজের তরফে কিছু বলতে গিয়েও ব্যাস বাল্মিকী রবীন্দ্রনাথকেও প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হতে হয়েছে। জনকয়েক যখন সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশে যায়, কিংবা জনসাধারণে কোনো কারণে, বুঝে, না বুঝে, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার দরুন একটি শ্রেণীকে স্বীকার করে নেয়, তখন সাহিত্যের প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হয়ে ওঠেন প্রফেট্। প্রোপাগ্যাণ্ডা হল জীবনস্রোতের এই ঘাটার ঢেউ।

(৪) সাহিত্য হল মানুষের মনের ক্রিয়া, মানুষ সমাজেই জন্মায়, সমাজের মধ্যে লালিতপালিত হয়, সমাজেই তার প্রতিপত্তি, মৃত্যুর পর সমাজই তার বার্ষিকী, শতবার্ষিকী উৎসব করে। সাহিত্যিকও মানুষ। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার ক্ষমতা বেশী কিন্তু তিনি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন। (মানুষ একপ্রকার জীব।) যতক্ষণ মানুষ জীব ততক্ষণ সাহিত্যিককে প্রতিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে,

নচেৎ তার বাঁচা অসম্ভব। জীবজগতের এই অভিযোজন-কর্মের কর্তা হল জীবের সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি। গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, সাধারণ মানব-সমাজে কিভাবে একটি গাছ, একটি জন্তু, একটি মানুষ বাঁচবে নিজের নিজের সমাজ ঠিক করে দেয়। কোথাও যে ব্যতিক্রম হয় না বলছি না কিন্তু ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়ম নয়, এবং জীববিজ্ঞানই বলছে—ব্যতিক্রমের বাঁচবার সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ জীবজগতে বিধান দেয়, সমাজে জীবকে এই বিধানের আনুকূল্য করতে হয়। এখন, অভিযোজন-কার্যের অতিরিক্ত কোনো কর্ম মানসিক ক্রিয়াতে প্রতিভাত হয় স্বীকার করলেও, আমি এ কথা মানতে প্রস্তুত নই যে, মনোময় কি চিন্ময় জগতের আইনকানুন জীবজগতের রীতি-নীতির প্রতিকূল। অতিরিক্ত কর্ম কিংবা ক্রিয়ার প্রভেদ থাকলেও সাধারণ মানুষের সাধারণ মানসিক ক্রিয়া থেকেই সেই প্রভেদ। কতটুকু প্রভেদ জানতে হলে কিসের থেকে প্রভেদ জানাটাই প্রথমে দরকার। প্রকৃতির নির্বাচনই সামাজিক নির্বাচনের মূলে আছে, তাদের মধ্যে অন্যপ্রকার যত প্রভেদ থাকুক না কেন। যতদূর জানা যায় ততদূর বলা চলে যে, এই মনোময় জগতে এমন কোনো আগন্তুক অসাধারণ গুণ আবির্ভূত হয় না, যার সম্বন্ধে জীবজগতের ধাপ থেকেই দৈবব্যাখ্যার অপেক্ষা বুদ্ধির পক্ষে বেশী সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা চলে না। জীববিজ্ঞান সম্পূর্ণতার দিকে আরো অগ্রসর হলে আত্মা, প্রতিভা প্রভৃতি যে কোনো আগন্তুক ও আকস্মিক গুণের আবিষ্কারের কারণ বের করা সম্ভব হয়। তখন হয়তো টের পাওয়া যায়, আত্মা কি প্রতিভা মানে মানুষের সব শক্তির পরিণত অবস্থায় সামঞ্জস্যের 'আদুরে' নাম। মোদ্দা কথা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়েই মনের কাজকে যাচাই করতে হবে, এমন কি, সাহিত্যিকেরও মনকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল তথ্য যুক্তির সাতত্য, ঐক্য নয়। অজীব, সজীব, অতিজীব, মানবাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে প্রমাণ করতে গেলে সমাজের তৈরী যুক্তির মালা ছিঁড়ে যায়। সে মালা নতুন করে সাজানো যায়, কিন্তু ছেঁড়ে না। আমি অন্ততঃ ছেঁড়া মালা পরতে রাজী নই। রসায়নে

ইয়ুরিয়া বলে একটা জিনিস আছে, হেনরী সাহেবের কাছে তার ব্যবহার আজব গোছের মনে হয়, 'ভোলার' সাহেব তাকে ভেঙে যখন গড়লেন তখন তার আজবত্ব রইল না, কেননা কোনো কালেই ছিল না। অজ্ঞানতাই আজবত্ব সৃষ্টি করেছিল। আগে মনে হতো, শুভ্র জাতির, বড়লোকের ছেলেদের একটা নতুন শক্তি আছে, তারা বিবর্তন-সোপানের উচ্চস্তরের বলেই তারা জগজ্জয়ী, বেশী বুদ্ধিমান ইত্যাদি। এখন দেখা যাচ্ছে যে, শেখবার পদ্ধতি এক, কুকুর-বাঁদর থেকে আরম্ভ করে নর্ডিক ও কোটিপতির ছেলেদের পর্যন্ত। বিজ্ঞান আমাদের বড়ই সাধারণ করে দিয়েছে, কারণ অনেক বিজ্ঞানই এখনও সমাজ থেকে বৃন্তচ্যুত হয়নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ক্রমেই কিন্তু সমাজ থেকে সরে আসছে, দার্শনিক ও অঙ্কশাস্ত্রবিদের টানের জোরে। না সরিয়ে নিলে যে তাঁদের কর্মের অবসান হয়, অন্ন মারা যায়। বর্তমান সমাজের আবিষ্কৃত জীবনযাত্রা চালাবার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজকাল নিষ্কামধর্মে পরিণত করবার চেষ্টা চলেছে।) যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁদেরই সমশ্রেণীর সাহিত্যিক স্বীকার করছেন যে, বিজ্ঞান একপ্রকার গুহ্য ধর্ম, সাহিত্যেরই মতো, অতএব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। (এই চক্রান্তের ফাঁদে অনেকেই পড়েছেন। ফল কি হয়েছে আমরা জানি, বিজ্ঞান একেবারেই অবোধ্য, যেমন সাহিত্য একেবারেই দুর্বোধ্য। এই দুইদল ও তাঁদের পরিপোষক ধনী সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে সমাজ এখন মানুষের বাইরের জিনিস, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে জীবন বহিষ্কৃত, সাহিত্যকলা সমাজ থেকে দূরীভূত, চিন্তা থেকে কর্ম, কর্ম থেকে চিন্তা, জীবন থেকে আর্ট ও বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সব হয়ে পড়ল নিষ্কাম। যেমন নিষ্কামভাবে ধনীশ্রেণী অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে এসেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসের অর্থ সমাজকে অস্বীকার করা, সমাজের পরিবর্তন না মানা, এবং সেই পরিবর্তনকে বুদ্ধির দ্বারা মানুষের অধীনে আনাতে আলস্য।) সাহিত্যিককে সমাজসত্তা মানতেই হবে, অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাঁকে মানতেই হবে নচেৎ তাঁর সাহিত্য হবে একটি শ্রেণীর স্বার্থপোষোগী

ভাববিলাস। বর্তমান সাহিত্যের এত গলদ, সে সাহিত্য উপভোগে এত বিপত্তি, সাহিত্যে আভিজাত্য-অনুভব—এসব দোষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অ-প্রত্যয়ের দরুন অর্থাৎ জীবনের প্রতি আস্থা কম থাকার দরুন, সমাজ-সত্তাকে গ্রহণ করলে স্বার্থে ঘা পড়বে এই ভয়ের দরুন। (যুক্তির সাতত্য রাখতে আমি শঙ্কিত হই না, কারণ যুক্তি হল সামাজিক আদান-প্রদানের রীতিনীতি এবং পুরানো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়লেও পুরাতন দর্শনের ভাষার সমাজ-'সত্তা'র অস্তিত্ব অটুট থাকে। আমি প্রাণবাদীর দৈবব্যাখ্যা মানি না। আত্মার বিশিষ্টতা স্বীকার করি না, বুদ্ধিতে বিশ্বাস করি, মেকানিস্টিক ব্যাখ্যায় আপাততঃ সন্তুষ্ট, সর্বক্ষেত্রেই সেই পদ্ধতি খাটাতে তৎপর, খাটাতে না পারলে অপেক্ষা করি, অধীরভাবে দৈবশক্তির কাছে ব্যাখ্যা ভিক্ষা করি না, প্রতীক্ষা করি সেইদিনের জন্য যেদিন বৈজ্ঞানিক সাহসভরে সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ, চিন্তার সঙ্গে কর্মের যোগ মেনে নিয়ে, সামাজিক কল্যাণরূপ সর্বসাধারণের উদ্দেশ্য স্বীকার করে, শ্রেণীর স্বার্থ ভুলে গিয়ে তার মার্জিত পদ্ধতি সামাজিক সমস্যার মীমাংসা-কার্যে নিযুক্ত করবে। তখন হয়তো এই যুক্তির নাম হবে অন্য, তা হোক।) আমি বিশ্বাস করি যে, সাহিত্য-সৃষ্টি কাজটাও সাহিত্যিক নামক জীবেরই এক ধরনের কাজ। সাহিত্যিক নামক জীবটির মনের উৎকর্ষ-সাধন হয়েছে, তাই বলে সে অতিজীব নয়, তাই বলে তার মনোভাব প্রকাশ করা এবং লোকের দ্বারা সে মতামত আলোচিত ও গৃহীত হওয়ার গুরু দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত নয়, অর্থাৎ সে কখনই অতি-সামাজিক নয়। প্রকাশ তাকে করতেই হবে, লোককে তাকে বোঝাতেই হবে, এবং ভাষারই দ্বারা, যে ভাষা তার একার সৃষ্টি নয়। এমন কি নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেও তাই। নচেৎ ব্যর্থতার অসাধারণত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সাহিত্যিকের মন্ত্র নয়। অতএব, জীব ও মননবিশিষ্ট জীব বলেই সমাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ তাকে বজায় রাখতে হবে। যার সঙ্গে লেনদেন তাকে বুঝতে হয়, নচেৎ ব্যবসা চলে না, বাঁচা চলে না, ঘরের মাল ঘরেই পচে। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিক নামক

মনবিশিষ্ট জীবের সংবিধান হল সাহিত্যিকের সাহিত্য-জীবন। সাহিত্যিকের মন যদি শক্তিশালী হয় তা হলে সেই মনই হবে রাজা, অন্য জীব তখন প্রজার মতন তারই কথা শুনবে। কিন্তু তখনও সেই অসাধারণ মনের সঙ্গে সাধারণ জীবের মনের সম্বন্ধে ছেদ পড়বে না। এ যেন পুরুষ-প্রকৃতি, কোনটা পুরুষ কোনটি প্রকৃতি বোঝা গেল না, কে কাকে চালাচ্ছে তাও জানা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল, দুইএর সম্বন্ধেই জীবনের উৎপত্তি। আশা করি সাহিত্যিক নিজেকে জীবন্ত জীবই ভাবেন।

(৫) রূপ ও বস্তুসত্তার মধ্যে পার্থক্য মধ্যযুগের আবিষ্কৃত স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে পার্থক্যের মতনই জীবনের সঙ্গে অনাবশ্যক, অবাস্তব এবং অপকারী। মঠের মধ্যে, পুস্তকাগারে কি পরীক্ষাগারে আবদ্ধ থাকলে এই প্রকার বিভাগ স্বাভাবিক মনে হয়। সুবিধার জন্য বিভাগ করতেই হয়। কিন্তু নিজের সুবিধা যদি বাস্তবজীবনের স্কন্ধে আরোপ করা যায়, তা হলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়, এবং জনকয়েকের সুবিধার জন্য আমরা যাই মারা। অসভ্যজাতি কেন, গ্রীক্-হিন্দুরাও গাছপালা, নদী-পাহাড়ের মধ্যে আত্মবিসর্জন করতেন, তাঁরা রূপ ও বস্তুকে একই জিনিসের ভিন্ন দিক ভাবতেন, তাই বস্তুর প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল প্রকৃত বিনয়ের। বাইরের বস্তুকে আবার জয় করবার প্রয়োজন হল, তাকে বুদ্ধির কাঠামোর মধ্যে আনা হল, পাখী গেল উড়ে, হাতে রইল তার পালক, তখন পালকই হল পাখীর প্রতিভূ, শেষে প্রমাণিত হল, হাতে যেটা সেইটাই আদত জিনিস; রূপই আসল, বস্তুসত্তা হল নকল। কিন্তু এইভাবে জীবন চালানো যায় না, কোনো আর্টই সম্ভব হয় না—**বিনয় চাই। আবার গরবও চাই।** বিনয়ের জন্য রামায়ণ, যেখানে বানর হয়ে ওঠে মহাবীর, গাছ হয়ে ওঠে মহীরুহ, যেখানে পাথর হয়ে ওঠে দেবতা, পাহাড় হয়ে ওঠে গন্ধমাদন, পাখী, লতাপাতা রামের শোকে কাঁদে। আর দাম্ভিকতার জন্য গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়, ওয়ার্ডসওয়ার্থের হাতে পড়ে প্রকৃতি মহাপ্রাণী ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়ে মহাপ্রাণ নির্গত করে, ত্রিয়ানন তৈরী

হয়, চিত্র হয় জ্যামিতি, সুর হয় অঙ্ক, স্থাপত্য হয় কলকারখানার নকল। অতি-বিনয়ও ভালো নয়, দাম্ভিকতাও ধাতে বসে না। যে ব্যক্তি সত্তাকে হৃদয়ঙ্গম করেছে সে-ই স্বাভাবিক পুরুষ। সেই স্বাভাবিক পুরুষ রূপ ও সত্তার মধ্যে আন্তরিকতা স্বীকার করে, বিলাসীর মতন আপেলের রং উপভোগ করবার জন্য খোলা কেটে টেবিল সাজায় না, আপেলই রাখে। মূর্তিগড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ণের ছটা বিচ্ছুরিত হয় সেই বর্ণই পাকা, নচেৎ বিসর্জনের সময় যে হরতেল ধুয়ে যায় তাকে কাঁচা রংই বলতে হবে। রূপ ভিন্ন সত্তাসম্ভব নয়। রূপ ও সত্তার পার্থক্য মানলে সত্তার প্রতি, রূপের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় না। দ্বিখণ্ডিত করবার পর আবার যদি খণ্ডগুলি জোড়াও যায় তা হলেও সেই আদিম, অকৃত্রিম সত্তায় ফিরে আসা যায় না। অথচ আর্টিস্টকে সেই আদিম অকৃত্রিম অখণ্ডিত সত্তায় ফিরে আসতেই হবে। 'শান্তিতে স্মরণ করলে' যে কবিতা হয় তার মধ্যে আর্টের চেয়ে পরমাত্মার সন্ধানই বেশী পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, 'রূপ ও সত্তা দু'টি ভিন্ন বস্তু',—এই দার্শনিক মতামত সম্ভব হয় সেই সময় যখন সমাজে শ্রেণী-বিরোধ ঘটে, তারই ফলে মনের ঐক্য বহুধা-বিভক্ত হয়ে যায়। সেইজন্য চিন্তার ক্ষেত্রেও বিভাগটি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগের সমাজ-তাত্ত্বিকেরা প্রায় সকলেই সমাজের রূপ ও সত্তা নিয়ে চুলচেরা তর্ক তুলেছিলেন। এই সময় যে শ্রেণী-বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল কে না জানে? সমাজের মধ্যে যতদিন ঐক্য থাকে, এমন কি শ্রেণী-বিরোধ শুরু হয়েছে না বোঝা পর্যন্ত, রূপ ও সত্তা সাধারণের কাছে পৃথক মনে হয় না। আমার সন্দেহের আর একটি সমর্থন দিচ্ছি। যুদ্ধের পূর্বে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মুখে শুনতাম—সাহিত্যের বিষয় রূপ, বিজ্ঞানের বিষয় বস্তুসত্তা। আমাদের দেশেই বস্তাপচা মালের কাটতি সম্ভব, তাই আজকাল অনেক যুবকদের মুখেই ঐ মতের পাণ্ডুর পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই। কিন্তু সত্য কথা এই, আর্ট ও বিজ্ঞানের মিল গরমিলের চেয়ে আন্তরিক—পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে উভয়েরই

উপকার হয়। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে যে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে পূর্বে বলেছি। বৈজ্ঞানিকও যদি আর্টিস্টের কাছে শিক্ষানবিসী করেন তা হলে বিজ্ঞানেরই উপকার হয়। বৈজ্ঞানিক ও আর্টিস্ট দু'জনকেই সততার পথে চলতে হয়, ফাঁকি দিলে কারুরই চলে না— যে রঙিন কাঁচের টাইল করে তারও নয়, আবার যে স্ফটিকের গঠন-প্রণালী নিয়ে পরীক্ষা করে তারও চলে না। বিজ্ঞানেরও ইতিহাস আছে, যার জন্য আইনস্টাইনের অঙ্ক বোঝা যায় না সাইবোলসন্ মরলি, মিন্‌কাউস্‌কীর কাজের সঙ্গে পরিচিত না হলে ; আবার আর্টেরও ইতিহাস আছে, যার জন্যে অবনী ঠাকুরের ছবি বোঝা যায় না অজন্তার ছবির সঙ্গে পরিচিত না হলে। দু'য়েরই ইতিহাস সমাজ নির্ণয় করে, সমাজের সঙ্গে দু'য়েরই সম্বন্ধ স্থির ও নিশ্চিত। দুইই এক প্রকারের সংযম, এবং দু'য়েতেই বাদ দিতে হয় অবান্তরকে, কিন্তু দু'য়েতেই আসল জিনিস বাদ পড়লে সবটাই নিরর্থক হয়ে পড়ে, অনর্থ ঘটায়, যেমন হচ্ছে—বিজ্ঞান পড়ছে 'ভুয়ো' দর্শনের গর্তে, আর আর্ট পড়ছে জ্যামিতির প্যাঁচে কিংবা হাজির হয়েছে বড়লোকের বৈঠকখানায়। প্রকৃত সাহিত্যিক সত্তা নিয়েই ব্যস্ত, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গঠন-প্রণালীও দেখেন। গ্যেঠে রবীন্দ্রনাথ কেবল রূপকার নন, তাঁরা সমাজ ভেঙেছেন সমাজ গড়েছেন, আবার রাদারফোর্ড, নীল বর্ পরমাণুর মডেল তৈরী করেই বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করেছিলেন। জীবতত্ত্বে বীজ নিয়ে পরীক্ষা হয়, আবার সেই বীজের সজ্জাপ্রণালী নিয়েও কল্পনা করার একান্ত প্রয়োজন আছে। আজকাল কেউ কেউ আর্ট ও বিজ্ঞানের পরস্পরের সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন, কারণ তাঁরা বুঝেছেন যে, সমাজে ঐক্য আনার একান্ত প্রয়োজন। আজকালই লোকে বুঝেছে যে, কারুশিল্প ও সাধারণ শিল্পের মূল এক ভিন্ন দুই নয়। কিন্তু আমরা তাঁদের কথা জানি না, জানলেও বুঝি না, কেননা যে সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ধরনের কথা মানুষের মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ে, সে পরিবর্তন আমাদের সমাজে হয়তো আসেনি; অন্ততঃ অমনভাবে প্রকট হয়নি।

(৬) আর একটি মাত্র বিচার-বাক্য আপনাদের দরবারে পেশ করব। ভাষা নিয়েই সাহিত্য। ভাষা প্রধানতঃ মানুষের মুখের। তলিয়ে দেখতে গেলে, বাক্‌তত্ত্বে, ঐ মুখের অধিকারীভেদ নেই। শিশুর কচি মুখ, শ্রীমুখ, পাগলের মুখ—যাই হোক না কেন, মুখ-নিঃসৃত ভাষার প্রকৃতি হল এই যে, সেটি নিতান্ত দৈহিক ক্রিয়ার অনুকল্প প্রক্রিয়া। ভাষা দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রতিভূ। কাজের বদলি কথা, কিন্তু কাজেই কথার উৎপত্তি। এক একটি কথা মূলতঃ এক একটি দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রতিরূপ সংজ্ঞা। কথার পিছনে যে চিন্তা থাকে তার প্রকৃতিই হল কার্যের পূর্বাববোধ। একেবারে অশরীরী চিন্তা নেই, শারীরিক কাজের সঙ্গে চিন্তার সম্বন্ধ সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ। যত অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ততই ভাষার পরিণতি—সুরের দিকে। তবুও দৈহিক প্রক্রিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সূক্ষ্মতম অ-বাস্তব চিন্তার পরিণতিও দৈহিক প্রক্রিয়ায়, প্রত্যেক চিন্তার বেগ প্রশমিত হয় দৈহিক অবস্থার পরিবর্তনে। যে কবি ও আর্টিস্ট সত্য কথা কন, তিনিই ঐ কথা স্বীকার করেন। ভালো গান শুনলে আমার গাল কণ্টকিত হয়ে উঠতো, আবার দাড়ি কামাতে ইচ্ছা হতো বললে লোকে হেসেছেন। সেদিন একজন বড় কবি বলেছেন, "কবিতা ভালো কি মন্দ পরীক্ষা করা যায় না, তবে যে কবিতা পড়লে গা শিউরে ওঠে—গায়ে কাঁটা দেয় তাকেই ভালো কবিতা বলি।" ক্ষুরের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর একজন সাহিত্যিক যিনি একাধারে বড় কবি ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক, তিনিও কবিতা লেখার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, কবিতা লেখবার পূর্বে দেহের যে টান টান ভাব থাকে কবিতা লেখবার পর তার অবসান হয়, এবং তাইতেই যা কিছু সাহিত্য-সৃষ্টির আনন্দ। এখন মানস-বিজ্ঞানে বলছে যে, এই পূর্বাববোধের অবস্থায় মানসিক ব্যবহারগুলি স্থিরীকৃত হয় সামাজিক ব্যবহারের আদান-প্রদানের দ্বারাই। এই সামাজিক আদান-প্রদানেই বৈজ্ঞানিকে যাকে মন বলে তার উৎপত্তি, তারপর মন দেহে আশ্রয় করে, এবং আমরা বলি, একটি বিশেষ দেহের বিশিষ্ট মন। কিন্তু মনের বিশেষত্ব বাস্তবিক পক্ষে

'অতি-সামাজিক' একেবারেই নয়। যদি আমরা অন্যের সঙ্গে কথা না কইতাম, তারা যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কইতো, যদি কারুর সঙ্গে কারুর বাক্ বিনিময় না হতো, তা হলে আমরা নিজেদের সঙ্গেও কথাবার্তা কইতে পারতাম না। আধুনিক সাহিত্যিকের মতে সাহিত্য হল নিজের সঙ্গে কিংবা নিজের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে কথা কওয়া। কিন্তু বাকের প্রকৃতি ঐ হলে কি করে তা সম্ভব? বাক্ হয় স্পষ্ট, না হয় গুপ্ত ব্যবহারের প্রতিভূ, ব্যবহারের পূর্বাববোধ ও প্রত্যক্ষতার সঙ্গে তার যোগ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের সঙ্গে বাকের ও বাক্যের সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু ঐ সম্বন্ধবিষয়ে আমরা সব সময়ে সচেতন নই। ব্যাপারটাকে বিশদ করা যাক। মানসিক ব্যবহারকে সুবিধার জন্য দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে: (১) যে ব্যবহার বাইরের নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে কোনো উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সজ্জিত; এবং (২) যে ব্যবহার ভেতরকার প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের ভাষা খামখেয়ালীর, বিকৃত মস্তিকের, সীজো-ফ্রেনয়েডের আবোল-তাবোল। এ প্রকার বাক্যের সঙ্গতি নেই বলা চলে না, সঙ্গতিটুকু কোনো বিশেষ কথা, ঘটনা কিংবা ব্যক্তির অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয় মাত্র। মনে হয় যেন সে বাক্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, যদিও বক্তার কাছে হয়তো আছে। আধুনিক লেখকেরা বলেন, তাঁদের নিজেদের ও দলের কাছে নিশ্চয় আছে। কেন তবু অসঙ্গত মনে হয় বিচার করলেই বোঝা যাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উদ্দীপক ও উদ্দীপনার সম্বন্ধে কোনো ভাষার সঙ্গে এই আবোল-তাবোল ভাষার পদ্ধতিতে পার্থক্য নেই—আছে পার্থক্য কেবল সমাজের গ্রহণশীলতায়। যে-সব উদ্দীপনায় পাগলের মুখ থেকে বাক্য বেরুচ্ছে তাদেরকে সমাজ উপযুক্ত ভাবছে না। অর্থাৎ অনুষঙ্গে কোনো দোষ নেই; তবু অসঙ্গত মনে হয় এইজন্য যে, সমাজ অর্থ-সঙ্গতিটুকু স্বীকার করছে না। এইখানে অন্ততঃ সমাজ কর্তা। অর্থ-সঙ্গতির শেষ আপীলও রুজু করতে হবে সাধারণের এজলাসে। যদি জনসমাজ সে আপীল গ্রাহ্য করে তবেই আধুনিক লেখকদের গুপ্তমন্ত্র

সাহিত্য-পদ্‌বাচ্য হবে। খানিকটা মতের ঐক্য হওয়া চাই, নচেৎ প্রকাশের কোনো মূল্য থাকে না, সাহিত্যিক মনের সংবাদেরও মূল্য থাকে না। বাক্যের মধ্যে সঙ্গতি বা যুক্তির অংশটুকু বক্তার নিজের সৃষ্টি নয়। অন্ততঃ এইখানে শুদ্ধ ব্যক্তিতন্ত্রবাদ আর টেকে না। তা হলে মোট কথা দাঁড়ায় এই যে, কি বাক্, কি বাক্যে, সামাজিক সত্তা ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যিকের চোখে আঙুল দিয়ে সামাজিক সত্তা স্বপ্রকাশ করছে না বলে স্বীকার করা চলে না যে, সামাজিক সত্তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ নেই, কিংবা কম। হাওয়া যখন স্থির তখন মানুষে হাওয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ না করলেও তার চলে, কিন্তু যুদ্ধের সময় জার্মানীতে যখন বারুদ তৈরির জন্য সোরা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন হাওয়া আনার প্রয়োজন হয়েছিল। জলের ওপর নৌকা-জাহাজ চালাবার সময় হাওয়া মানতে হয় কি না হয় সারেঙ্গসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাওয়া যায়। আজ আকাশে ঘনঘটা, ঝড় উঠেছে, তাই বলছি সব সাহিত্যিককে—আবহাওয়ার মতন এই সমাজ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করুন, নচেৎ মাঝদরিয়া পর্যন্তও পশ্চিমী সাহিত্যের মতন যেতে হবে না, কিনারার কাছে ভরাডুবি হবে। তখন সেলুনে বসে নাচগান ও ককটেল টানলে, ফষ্টিনষ্টি করলে, ঝড় লজ্জায় ইয়োলাসের থলের ভেতর আত্মগোপন করবে না। সমাজ-সত্তাকে অবহেলা করেই সব সাহিত্য হয়ে উঠেছে বেলোয়ারী চুড়ির ব্যবসা—বড়ই ঠুনকো, বড়ই হালকা, বড়ই ফাঁকা, যদিও রঙবাহার।

এই বিপদ আমাদের আরও বেশী, কারণ পুরানো কালে যে সমাজ মানুষের প্রত্যেক কর্মে বুঝিয়ে দিত যে সে আছে, সে সমাজ আজ ভেঙে গিয়েছে, সে সামাজিক সত্তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমাজ ভেঙে গিয়েছে, পড়ে রয়েছে তার টুকরো, তার মধ্যে একটি বলছে আমিই সব, অন্য টুকরো শুনতে পাচ্ছে না এই দাবি, যারা পাচ্ছে তারা মানছে না। সমাজ যখন নেই, অথচ একটিমাত্র শ্রেণী রয়েছে, তখন সেই শ্রেণীর সত্তাকে সমগ্র সমাজ-সত্তা বলে ভুল

করা স্বাভাবিক। কিন্তু এ তো চিরকাল থাকবে না, অন্য শ্রেণী মাথা তুলবে, তখন বাধবে বিরোধ। সে বিরোধের অবস্থা কারুর কারুর কাছে অবশ্যম্ভাবী মনে হলেও বিরোধ কিছু চিরন্তন নয়। শ্রেণী-বিরোধ ইতিমধ্যের ইতিহাস। শ্রেণীর সত্তা ভাঙছে, গড়ছে—তার শেষ নতুন সমাজে। শ্রেণী-সত্তাকে আশ্রয় করে বড় সাহিত্য হতেই পারে না। কোনো ব্যক্তি এই শ্রেণীর আবহাওয়াতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, কোনো সাহিত্যিক এই অবস্থায় বড় কিছু লিখতেই পারে না। খণ্ড সত্তায় যাদের আশ মেটে তাদের কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু বড় আর্টিস্ট এক একটি বৃকোদর, তাই রবীন্দ্রনাথ ছোটেন অন্যদেশে, রাশিয়ায়, ক্ষুধা মেটাতে, নতুন সমাজ দেখতে। যেদিন একটিমাত্র শ্রেণী স্ব-ইচ্ছায় সমাজের মধ্যে আত্মবিসর্জন করবে সেদিন শুভদিন—কিন্তু ইতিমধ্যে কি করা যায়? আমি প্রথমেই বলেছি বাংলা দেশে যেন নতুন শ্রেণী তৈরী হচ্ছে মনে হয়; যা প্রমাণ দিয়েছি তা ছাড়া অন্য প্রমাণও পেয়েছি। এই নতুন শ্রেণীর উত্থান ও পুরাতন শ্রেণীর পতনের মূলে যে সমাজশক্তি আছে তাকেই সাহিত্যের কাজে লাগতে হবে। সে শক্তির নাম বিজ্ঞান, অর্থাৎ নিয়তিকে বশে আনা; তার আর একটি নাম আর্থিক বৈষম্য অবসানের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা, বাঁচবার জন্য, ভালো করে বাঁচবার জন্য। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'।

এখন সাহিত্যে সামাজিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন কাঁরা? যাঁরা ঐ একমাত্র শ্রেণীর চেয়ে অন্ততঃপক্ষে ষোলগুণ সংখ্যায় বেশী যাঁরা উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাকুরে নন। যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, ইতিহাসের নিয়ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা আবিষ্কার করে নিয়তির হাত থেকে মুক্ত হতে চান, সমাজের ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করতে চান। যাঁরা তরুণ অথচ জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক। বিশেষ করে যাঁরা জমির সংস্রব ছাড়েননি; কেন না জমিই হল আমাদের সমাজ-সত্তার প্রকৃত সত্ত্ব। আমি শুনেছি পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে যাঁরা জমি চাষ করেন তাঁদের বেশির ভাগ মুসলমান। ভালো কথা,

অতএব মুসলমান সাহিত্যিকের দায়িত্বই এ ক্ষেত্রে বেশী। তাঁরা যদি কেবল আরবী ফারসী উর্দু জবান আমদানি করে বাঙলা সাহিত্য বড় করতে চান, তা হলে তাঁদের চেষ্টা সফল না-ও হতে পারে, কেন না হিন্দুরা আপত্তি করবে। কিন্তু তাঁরা যদি নতুন শ্রেণী-গঠনের ভার নিয়ে সমাজ-সত্তাকে সগৌরবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা হলে সত্যই সাহিত্যের উপকার হবে। তখন সে সাহিত্য হবে সকলের, হিন্দুরাও আর আপত্তি করবে না, আনন্দে গ্রহণ করবে, আরো বড় করতে সাহায্য করবে। কারণ হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক, সমাজ এক, দুই নয়, ভালো করে বাঁচবার ব্যগ্রতায় তারা এক, তাদের গোষ্ঠী-জীবন এক, অধিকারের চেয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধে তারা এক। তাদের চিন্তাধারা একই প্রণালীতে বয়। কিন্তু মানসিক সংস্কারে যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তাদের মূল কারণ এই মাটির সংস্রবে ও গ্রামে থাকার দরুন তাঁরা হিন্দুদের মতন অবাস্তব হয়ে পড়েননি, এখনও সত্তার সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, জমির সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে। সেই-জন্য তাঁদের ভাষায় অত প্যাঁচ নেই। লাঠির মতই তাঁদের ভাষা সোজা আসে। তাঁদের ঐতিহ্যে ধনিকতন্ত্র ফুটে উঠতে পারে নি, তাঁদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ কম, জাতি-বিভাগ কম, তাঁদের ধর্মে সামাজিক সাম্য খুব জোরেই ঘোষিত হয়েছে। আজ পূর্ববঙ্গে তাঁরা অধিকাংশই গরীব। চাকরিও তাঁরা কম করেন, শহরে তাঁরা বাস করতেও চান না। এত সুবিধা তাঁদেরই। অতএব তাঁদের কাছেই আমার প্রত্যাশা বেশী। তাঁরা ইচ্ছা করলে সমাজকে ও সাহিত্যকে গড়ে তুলতে পারেন। নতুন সমাজ তৈরী না হলে তাঁদের ক্ষতিই বেশী। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু তাঁরাও এই কাজ গ্রহণ করুন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নতুন সমাজে থাকবে না, ক্ষুধার চোটে সমস্যা মিটবে বললে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হল না। নতুন সমাজ-সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত হলে হিন্দু-মুসলমানের যে প্রকৃত মিলন ঘটবে, তারই ফলে হবে সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। বড় কাজ একত্রে না করতে পেরেই আমাদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, যেমন নতুন কাজ না পেয়েই পুরাতন শ্রেণীর

স্বাতন্ত্র্যবোধ হয়েছিল। ইতিহাসের পটভূমিকায় নটের অভিনয়-অংশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে কি করে চলবে? সাহিত্যে যে সমাজ-সত্তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সে সম্বন্ধে ঐতিহাস চেতনার প্রয়োজন। যে সেই সমাজ গড়বে, সে-ই বড় সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়তা করবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

সমাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার পর, তার সঙ্গে যুক্ত হবার পর সাহিত্যের মাত্রা ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। আমি যা বলতে চেষ্টা করলাম সেটি হল কাব্য-জিজ্ঞাসার মুখবন্ধ। 'অথ' কথাটির অর্থ পরিষ্কার না হলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যেমন কচি ছেলের আবদার মনে হয়, তেমনি সাহিত্যের বস্তু না বুঝলে কিংবা তার সঙ্গে বিযুক্ত হলে কাব্য-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যের মাত্রা-নিরূপণ নিতান্তই নিরালম্ব বিচার হয়ে উঠে। 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'। কাব্য-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে আমার বলবার বেশী কথা নেই, কেননা আমি কবিও নই, আর্টিস্ট নই। আমি আনন্দ পেতে চাই, মিলে মিশে। নমস্কার, ধন্যবাদ।

॥ পরিচয় ॥ ॥ বৈশাখ ॥ ১৩৪১ ॥

নতুন ও পুরাতন

সাহিত্যিক তর্কের অবসান হল যুবক-বন্ধুর একটি প্রশ্নে—"সত্য কথা বলুন মুখুয্যেমশাই—ভালো সন্দেশ কোলকাতা শহরে আর পান ? আমাদের সময় আধা-ছানার মণ্ডা দ্বিতীয় শ্রেণীর মিষ্টির মধ্যে গণ্য হতো, এখন যে-কোনো বড় দোকানের কাচের বাক্সে মাথা খুঁড়লেও পাবেন না, অর্ডার দিলে পরের দিন মিলতে পারে, তাও কেবল চিনির ডেলা।"

এই মন্তব্যে আপত্তি জানালাম—"কেন, আজকাল খাবার কত সুবিধা, টেলিফোনে দোকানে অর্ডার দিন, আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটরে পৌঁছে দেবে—সিঙ্গাড়া গরম, দই ঠাণ্ডা, রেফ্রিজারেটারে রাখা, টাইফয়েড-কলেরার ভয় নেই। অবশ্য দাম একটু চড়া।"

"ব্যস, ঐ পর্যন্ত। কিন্তু সিঙ্গাড়া আমাদের কালে খাবারের মধ্যে অন্ত্যজ ছিল। হাঁ, দইটা অবশ্য—কিন্তু কোয়ালিটি দেখুন, দইএর কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করেন ? সুগন্ধ, সুস্বাদ, না দইএর দধিত্ব, সেটা মোল্লারচকেই পাওয়া যেত।"

"খানিকটা মানি। আমার পৈতে ও বিয়েতে কর্তারা পেনেটির গুপো, নাটোরের মণ্ডা, তমলুকের দই খাইয়েছিলেন।"

"তেমনি ধরুন চাল। বাঁশমতি বাজারে পান ? কোনটার উন্নতি হয়েছে বলুন ?"

"তা হলে আপনার মতে রবীন্দ্রনাথই দায়ী ?"

"এক হিসেবে তাই বৈ কি। তাঁর সদ্‌গুণ কেউ নিলে না, শেষের কবিতার ভাববিলাসটাই নিলে। ফলে বুদ্ধদেব বসু। এই অবনতির গতি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন ছ'জন কবি—বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্র দত্ত। তাঁদের সামাজিক সার্থকতার জন্য তাঁরা সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট।"

"দেখুন, আমার মনে হয়, প্রমথবাবু, দেবেন সেন প্রভৃতি লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আত্মনিবেদন করেন নি। তাঁদের ধরছেন না কেন ?"

"প্রমথবাবুর সমাজ-বোধ ছিল না, তিনি ছিলেন কেবল যাকে উনবিংশ শতাব্দীতে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বলা হতো তাই।"

"সুধীন্দ্র ও বিষ্ণু ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নয় ? তাঁরা কি খুব সামাজিক ? ছ'জন কি একই ধরনের ?"

"ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যা-ই হোন না কেন, তাঁদের প্রচেষ্টার একটা সামাজিক কৃতিত্ব আছে। বিষ্ণুবাবু ও সুধীন্দ্রবাবুর মধ্যে পার্থক্য আছে—একজন ছুরি চালান, অন্যের হাতে হাতিয়ার মুদ্গর।"

আমার যুবক-বন্ধুর সঙ্গে যা কথোপকথন হয়েছিল তারই শেষাংশ যথাযথ লিপিবদ্ধ করলাম। কারণ এই যে, তাঁর মন্তব্যগুলি বিচারের উপযোগী। তিনি যাবার পর আমার অস্বস্তি এসেছে, কলম ধরে শান্তির আরাধনা করছি। বন্ধুর মতামত ঠিক অপ্রত্যাশিত কিংবা অপূর্ব নয়। কিছুকাল থেকে অনেকটা ঐ ধরনের মতামতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি বটে, কিন্তু ঐ রকম স্পষ্ট ভাষায় তার প্রকাশ পাইনি। যখন পেলাম তখন বন্ধুর বয়সের সঙ্গে তাঁর আপসোসের বিরোধ উপলব্ধি করে নীরব থাকা অনুচিত।

তাঁর সঙ্গে আমার একটা কোথায় যেন পার্থক্য রয়েছে। সেটা কি মাত্র বয়সের ? না, আরো প্রাথমিক, দৃষ্টিভঙ্গীর ? আমাদের যুবা বয়সে এমন কি ছিল যা এখন নেই, একালে এমন কি আছে যা আমাদের ছিল না ? সত্যকারের পার্থক্য আছে কি ? কিভাবে আমরা জগৎকে দেখতাম ? কিভাবেই বা এরা দেখেন ? যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে তার মূল্য কতটুকু ?

'আমাদের' বলতে অবশ্য আমার ও আমাদের দলকে বোঝাই স্বাভাবিক। আমি কি ছিলাম? আমি রুসোর মতন আত্মজীবনী লিখতে বসিনি বটে, কিন্তু তাই বলে এখনকার মনোভাব ও আদর্শ তখনকার ওপর আরোপ না করার মতন সংযম আমার আছে। ছিলাম এক কথায় 'ফাজিল' ছেলে—অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক পড়তাম না, বাজে বই পড়তাম, যা পড়তাম তার চেয়ে বেশী কিনতাম, তারও বেশী ঘাঁটতাম, ও আরো বেশী 'চাল' দিতাম। টাকার ভাবনা এক হিসেবে ছিল না, কেবল বাবা ও মা চা ও চপ্-কাটলেট, দর্জি ও বইএর দোকানের বিল শোধ দেবার সময় রাগারাগি করতেন, এইটুকু ছাড়া। চাকরিবাকরির কথা মনে উঠতো না, পড়াশুনার সঙ্গে চাকরির সম্বন্ধ আমার অজ্ঞাত ছিল। ভালো ছেলের সঙ্গে যেমন মিশেছি, বখা ছেলের সঙ্গে তেমনই, বোধ হয় একটু বেশী প্রাণ খুলে। একটা গোঁড়ামি ছিল চরিত্র সম্বন্ধে। গান শিখতাম ও ভালবাসতাম, তবে ধ্রুপদ—তার নীচুতে নামিনি। থিয়েটার, খেলাধুলোর সখ ছিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি, তবে আগ্রহ ছিল না, লোভ তো নয়ই। বন্ধুত্ব করেছি প্রাণভরে—সমবয়সীর সঙ্গে। যা কিছু রোমান্স প্রধানতঃ ওদেরই সঙ্গে। অন্যসব ছুটকো-ছাটকা—দু'এক বছরের বেশী তাদের জান্ ছিল না। কল্পনা-বিলাসী ছিলাম না, তবে কল্পনা ছিল। বাঙলা সাহিত্যের প্রতি কোনো প্রকার আসক্তি ছিল না। 'বাঙলা বই' বলতাম, বাঙলা সাহিত্য বলতাম না। স্বদেশী যুগে 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছি বটে, কিন্তু যেন মনে ধরেনি। লাঠি খেলা, সাঁতার দেওয়া, গাছে চড়া, স্বেচ্ছাসেবক হওয়া, বন্যা-প্রপীড়িতের উদ্ধার, গ্রাম-সুধার, নাইট-স্কুল, ইংরেজীতে বক্তৃতা—কিছু বাদ দিইনি বটে, কিন্তু হুজুকে পড়ে। মোদ্দা কথা পলিটিক্যাল জীব ছিলাম না।

চিন্তার দিক থেকে কোনো একটা বিশেষত্ব ছিল না। শেষ যে নামজাদা লেখকের বই পড়তাম তারই মত উদ্‌গীরণ করতাম। সেটা মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়, স্মৃতিশক্তির। একাধিক কলেজ ঘুরেছি কিন্তু প্রধাণতঃ রিপন কলেজেরই ছাত্র আমি। যখন নতুন বাড়িতে কলেজ

এল, তখন বিস্তর আধুনিক বই কেনা শুরু হয়। বিকেলবেলা ত্রিবেদী মহাশয়ের ঘরে অধ্যাপকবৃন্দের আড্ডা জমতো কৃষ্ণকমলবাবুকে ঘিরে। সেখানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা হতো, আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম। এমন আলোচনা আর কোথাও আমি অন্ততঃ শুনিনি। তার দু'টি প্রধান গুণ ছিল—গাম্ভীর্য ও বিদ্যা। ক্ষেত্রবাবু রসিকতা করতেন, কিন্তু সে-রসিকতার অন্তরে, পিছনে ও চারপাশে যে গুরুত্ব ছিল তা স্মরণ করলে এখনও মাথা নীচু হয়। এই আসরের প্রভাব আমার জীবনে ওত-প্রোত হয়ে আছে। বিশেষতঃ একটা দিক থেকে। আমার বি. এ. ক্লাসে ছিল কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক—বিজ্ঞানে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করি। ত্রিবেদীমহাশয়, গঙ্গাধরবাবু, সুরেনবাবু, জানকীবাবু, বাজপেয়ী-মহাশয় কেমিস্ট্রি পড়াতেন। ত্রিবেদীমহাশয়ের শরীর তখন ভাঙতে শুরু হয়েছে। সপ্তাহে তিনি মাত্র দু'দিন পড়াতেন। যেদিন ক্লাসে প্রথম এলেন সেদিন আমাকে একটি প্রশ্ন করেন, "Charles' Law, Avogadro's Hypothesis পড়েছ?" গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেলাম। একটু হেসে বললেন, "Law ও Hypothesis-এর পার্থক্য কি?" চুপ। "Logic পড়েছ? ওটা না পড়লে বিজ্ঞান বোঝা যাবে না।" তারপর পুরো দু'তিন মাস বিজ্ঞানের তর্কনীতির ব্যাখ্যা চলল—সেগুলি 'জগৎ কথা'য় প্রকাশিত হয়। সেই থেকে 'বিজ্ঞানে'র অর্থ আমার কাছে M. Sc., D. Sc.-র কাছে বিজ্ঞানের অর্থ থেকে পৃথক রয়েই গেল।

এই সময় আমার সঙ্গে ৺সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক শুরু হয়। তিনি তখন ম্যাণ্ডালে থেকে দেশে ফিরেছেন। জনকয়েক বন্ধু মিলে আমরা তাঁর ছাত্র হই। প্রধানতঃ বিজ্ঞান ও অঙ্কের, কিন্তু মুখ্যতঃ চরিত্রের। যুবা বয়সের দোষগুণ তখন আমার স্বভাবে ফুটে উঠছে। একটা ভাবের ঘুরপাকে জীবনটা তখন পড়েছিল। তাঁর আদর্শবাদ আমাকে উদ্ধার করলে। আমার জীবনে আমার পিতার ও সতীশবাবুর আদর্শবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। পরে অনেক অশান্তি

এসেছে তাঁদের প্রভাবে; কিন্তু আমার পরিশ্রম করবার শক্তিও তাঁদের কৃপায়। দু'জনেই ধার্মিক ছিলেন, পিতা জ্ঞানমার্গের পথিক, সতীশবাবু ভক্তিমার্গের। সতীশবাবুর ভগবানে বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়, কিন্তু সে-বিশ্বাসের ছোঁয়াচ আমায় লাগেনি। বরঞ্চ আমার পিতার জ্ঞানপন্থাই আমাকে সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ভাবপ্রবণতা থেকে রক্ষা করেছে। একটা কথা লিখতে ভুলেছি। ছেলেবেলা ছোট শহরে কাটিয়েছি; সেখানে গ্রাম ও শহর, দু'য়েরই ভালোমন্দের সাক্ষাৎ পাই। তারপর থেকে শহরবাসী। গ্রামের প্রতি যুবা বয়সে কোনো মোহ ছিল না—একেবারে শহুরে হয়ে যাই। এই তো গেল আমার মানসিক আবহাওয়া।

আমাদের দলের কথা লেখা শক্ত। পূর্বেই লিখেছি, আমার দল ছিল প্রকাণ্ড—তাতে বখা ছেলে, কুস্তিগির-খেলোয়াড়, গাইয়ে-বাজিয়ে থেকে সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন সবাই আসতো। অতএব আমাদের দলের একটা মানসিক ল. সা. গু. আবিষ্কার করা শক্ত। অবশ্য, সত্য কথা বলতে গেলে, নচেৎ যাঁরা এখন বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের ধরে অনেক কিছুই বড় বড় কথা লেখা যায়। তবে এটা ঠিক—১৯।২০ বছর থেকে ২৫।৩০ বছরের আমার পরিচিত যুবকবৃন্দ প্রমথ চৌধুরীর চারপাশে দল তৈরি করে। 'কমলালয়ে' নানাপ্রকৃতির ছেলে আসতো। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বন্ধু ছিল অবশ্য, কিন্তু সবুজপত্রের দলেরই তখন 'মন' ছিল বলা যায়। অন্ততঃ সেই দলের প্রত্যেকে তাঁর দৌলতে মন তৈরি করার সুযোগ পায়। অতএব 'আমাদের দল' বলতে সবুজপত্রের দল বলা অন্যায় নয়। এই দলের গোটা কয়েক সাধারণ মানসিক ধারার উল্লেখ করছি। বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এই দু'টোই প্রধান।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধিবাদ মানে বুদ্ধিমত্তা নয়, যদিও প্রমথবাবুর কাছে নির্বুদ্ধিতা অভদ্রতারই নামান্তর। বুদ্ধিবাদ অর্থে (১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য-স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ

অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত অঙ্গীকারের উপসিদ্ধান্ত হল বুদ্ধির স্বাধীনতা, কারণ যেটা সাধারণ অর্থাৎ অবিশেষ (সাধারণের বুদ্ধি আছে সবুজপত্রের দল স্বীকার করেনি কখনও), সেটা মুক্ত। এই স্বাধীনতা থেকে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, লেখক কর্মজীবনে কারুর দাসত্ব করবে না, সাহিত্যিক জীবনে সর্বদাই সমালোচনা করবে। সমালোচনার বিষয় অবশ্য নির্দিষ্ট ছিল না, তবে সমাজই ছিল প্রধান। পলিটিক্স-এ আমাদের আগ্রহ ছিল না, তার বদলে পলিটিক্যাল গোঁড়ামি, ধর্মের গোঁড়ামি, এমন কি বিজ্ঞানের, দর্শনের। মোদ্দা কথা কিছুই বাদ পড়েনি। ফলে লেখায় এসেছিল ফুর্তি, এবং সাহিত্যে এল প্রবন্ধ, সর্ববিষয়ে জানবার আগ্রহ। তবে নিশ্চয় মানবো যে তার বিপদও ছিল যথেষ্ট, হালকা বেহায়াপনা তার মধ্যে সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশী ছিল জীবন থেকে, বিশেষতঃ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি। বুদ্ধির চর্চায় আমরা বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবাদের সর্বনাশ ঐ করেই ঘটে, আমরাও বাদ পড়িনি।

বুদ্ধি সমাজের নেই, মানুষেরই আছে, এবং একজন মানুষেরই আছে, একটা মস্তিষ্ক দু'টো স্কন্ধে যেকালে থাকতে পারে না। তার ওপর আমাদের বাস শহরে, ভদ্র মধ্যবিত্তের সন্তান, হীরের টুকরো ছেলে, অর্থাৎ বাপমায়ের গৌরব, অথচ তাঁদের সঙ্গে বনিবনাও নেই। তার ওপর বুদ্ধিবাদের জের। অবরোহী যুক্তির ধরনই এমন যে তার সাহায্যে একমাত্র ব্যক্তিবাদেই পৌঁছানো যায়। যেই অবিশেষ চিরন্তন নিয়ম কিংবা অধিকার স্বীকৃত হল অমনি সেই নিয়ম ও অধিকারের জাগতিক প্রয়োগে কর্মক্ষেত্রে সমর্থন পাওয়া যায় না; তখন প্রত্যেক বিশেষ মাথা উঁচু করে থাকে; বাধ্য হয়ে বিশেষকেই অ-বিশেষ বলতে হয়। ব্যক্তিবাদের মূল কথা ব্যক্তির বিশেষত্ব স্বীকার করা নয়, তার সাধারণত্বের ঘোষণা করা। আমাদের দল এইসব কারণে স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলাম। অতএব আমাদের সঙ্গে বর্তমান যুবকের একটা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকতে বাধ্য। সেটা ঠিক বয়সের

জন্য হোক আর না হোক—কালের জন্য। য়ুরোপে মহাযুদ্ধই কালকে ভাগ করেছে। আমাদের মনের ওপর যুদ্ধের ছাপ স্পষ্ট ছিল না। ইংরেজ আমাদের পরাধীন করেছে, সেই ইংরেজ জার্মানের হাতে জব্দ হোক এই ছিল আমাদের ইচ্ছা। সিগারেট ও বই-এর দাম বেড়েছিল—ঐটুকু দুঃখ। যুদ্ধের সময় আমরা ভূগোল শিখি—ইতিহাস না জেনে। বিস্তর জার্মান ও ইংরেজের লেখা বই-এর চলন হয় এই সময়—তার মধ্যে নীট্‌শে ও চেম্বারলেনের বই-এর প্রভাবই যৎসামান্য স্থায়ী হয়। সবুজপত্রের দলই বোধ হয় ফরাসীর জয় কামনা করতো। প্রমথবাবুর ঐ সম্বন্ধে লেখার ওপর ইংলণ্ডের 'টাইমস্' প্রকাণ্ড টিপ্পনী লেখে। বিলেতে যুদ্ধের ফলে যে হতাশা কিংবা দুরাশা আনে সে-রকম কিছু হয়নি এখানে। মাত্র আমাদের জানবার আগ্রহ বেড়ে যায়।

সূক্ষ্মভাবে ধরতে গেলে আমাদের মানসিক ধারার দু'টি গোপন ধারার উৎস খোলে ঐ সময়। (অন্ততঃ আমার তো বটেই)। ক্রপট্‌কিন ও নিকোলের জীবতত্ত্বের আলোচনা, তার ওপর স্যামুয়েল বাট্‌লার ও বের্গসঁর রচনা পড়ে অভিব্যক্তিবাদের ওপর আমাদের যেন একটু সন্দেহ আসে কিন্তু অচিরেই তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানীর সহানুভূতিতে বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়—তবে সে-বিজ্ঞান মানে কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্স। সে যাই হোক, আমরা এই যুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় গোপন ধারাটি এই : ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে য়ুরোপের যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিপদে ও সর্বনাশে। সত্য কথা এই—যুদ্ধ আমাদের পরনির্ভরশীলতা শেখায়, তবে ইংরেজের দয়ার ওপর নয়, খানিকটা তার প্রতিজ্ঞার ওপর—যে প্রতিজ্ঞা সে বিপদে পড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই অন্ধ বিশ্বাস চিত্তরঞ্জনের ছিল। এখনও আছে, তবে আজকাল ইংলণ্ডের বদলে ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ বলা হয়। এই দু'টোর পার্থক্য আমরা জানতাম না, কারণ ঐতিহাসিক নিয়ম আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

এই জ্ঞান রুশিয়ার দান। য়ুরোপের যুবক-মনে যুদ্ধের প্রভাব যতটা, ততটা প্রভাবই রুশিয়ান বিপ্লবের আমাদের দলের মনের ওপর। তার চেয়ে বেশী বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য এখানে ১৯১৭ সালের পূর্বেকার রুশিয়া ও তার পরবর্তী রুশিয়ার পার্থক্য মনে রাখতে হবে। বাঙ্গালীর রুশিয়ার সঙ্গে ১৯১০ সালের পর থেকে একটা যোগ হচ্ছিল। অনেকগুলি মিল আমরা লক্ষ্য করেছিলাম।

(১) রুশিয়ার নিহিলিজ্‌ম্ ও বাংলার terrorism।

(২) রুশিয়ার কৃষক ও আমাদের কৃষক—উভয়ের অশিক্ষা, নির্যাতন, তুরবস্থা।

(৩) রুশিয়ার গ্রাম-সভা ও আমাদের পঞ্চায়েৎ।

(৪) রুশিয়ার আমলাতন্ত্র ও আমাদের আমলাতন্ত্র।

(৫) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজের সঙ্গে উভয়ের যোগহীনতা।

(৬) সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ইণ্টেলেক্‌চুয়ালদের বাক্যবল, নিষ্ফলতা, চা, সিগারেট, কর্মের প্রতি মোহ অথচ কর্মক্ষেত্রে নেমে দ্বিধা, চরিত্রের আন্তরিক দ্বন্দ্ব, এক কথায় হ্যাম্‌লেটিপনায় উনবিংশ শতাব্দীর রুশিয়ানদের সঙ্গে আমরা সমগোত্রের ছিলাম।

(৭) মানসিক প্রবৃত্তিতে উভয়ের আত্মকেন্দ্রিকতা। ফলে বাঙ্গালী ও রুশিয়ান যুবকের self-pity।

(৮) যুবতীদের কাছ থেকে যুবকদের অত্যধিক প্রত্যাশা। স্ত্রী-জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চধারণার মূলে একই রকমের আত্মবিশ্বাসের অভাব।

(৯) তার ওপর ও-দেশে যেমন স্ল্যাভোফিলিজ্‌ম্ ও কস্‌ম-পলিট্যানিজ্‌ম্—এদেশেও তাই। আমাদের আর্যামি ও সায়েবিয়ানা ও শেষে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা।

১৯১০ সাল উল্লেখ করেছি, কারণ এই সময় সেন ব্রাদার্স ছোট্ট দোকান খোলেন বহুবাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। প্রমথ সেন ও ৺ভোলানাথ সেন এই সময় থেকে আমাদের বিদেশী, বিশেষতঃ রুশিয়ান, সুইডিশ, নরুইজীয়ান, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের

খোরাক যোগাতে শুরু করেন। বাঙলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই সেন ব্রাদার্সের বই-এর দোকানের কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে।

কিন্তু ১৯১৭ সালের পূর্বে বাঙ্গালীর সঙ্গে রুশিয়ার সম্পর্ক রোম্যান্টিক। তারপর ও-দেশে গোলমাল বাধল। কানাঘুষো অনেক কিছু আমরা শুনলাম, প্রথমে কিছুই বুঝিনি। একটা কিছু ভীষণ কাণ্ড ঘটছে সন্দেহ হয়েছিল।

১৯১৭ কিংবা '১৮ সালে আমার হাতে Kropotkin-এর *French Revolution* আসে। সেই পড়ে বিপ্লব সম্বন্ধে আমার অনেক ধারণা একেবারে উল্টে যায়। ১৭৮৯ সালেই যে বিপ্লবী শক্তির প্রকৃত উৎস, অর্থাৎ কৃষির চাহিদা নষ্ট হয়, এই তথ্যটি আমার মনকে ভিন্নগামী করে। তারপরই, ১৯১৯ সালে আমি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ি, যেন নতুন জীবন সঞ্চারিত হল। ১৯২২ সালে কার্ল্ মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' শুরু করি। এর আগে হেগেলের *Philosophy of History*, Buckle, Guizot প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। বেশ মনে আছে নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনের গলদ দেখাতে গিয়ে, স্বরাজ-পার্টিকে মধ্যবিত্তের চক্রান্ত বলে, চম্পারণের ইতিহাস পঞ্চাশ বছর পূর্ব হতে টানার ফলে একটি ছোট্ট সভায় আমি ভীষণ অপদস্থ হই। তারপর সরকার বাহাদুর মীরাট মোকদ্দমা চালালেন। যুবক সম্প্রদায় সব রুশিয়ার ভক্ত হল। কেউ কেউ তাঁদের মধ্যে মার্ক্স্, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্ট্যালিন, বুখারিন, প্লেখানফ্ পড়েননি তা নয়, তবে বেশির ভাগ বাঙ্গালী যুবক নতুনত্বের মোহে প্রথম প্রথম কমিউনিজ্মে বিশ্বাসী হন।

অবশ্য পড়া না-পড়ায় কিছু আসে যায় না। যুদ্ধের সময় চোখের সামনে অনেক গরীব বড়লোক হয়ে যায়—রাতারাতি। ১৯১৯ সাল থেকে সেই টাকা কলকারখানায় প্রযুক্ত হল। শেয়ার পিছু শতকরা ১০০০৲ টাকা মুনাফা কোনো কোনো কোম্পানি সে সময় দিয়েছে। মজুরদের মজুরি কিছু বেড়েছিল, কিন্তু নিতান্ত অসম অনুপাতে।

ফলে ধর্মঘট শুরু হল, তারপর ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে চমক লাগে। এই পনের বছরের মধ্যে ভারতের ইতিহাস চৌধূনের লয়ে এগিয়েছে। আত্মরক্ষার সমিতি থেকে শুরু করে, জাতীয় সংগ্রামে যোগদানের মধ্য দিয়ে এসে আজ শ্রমিক-সঙ্ঘ আপনার ঐতিহাসিক নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এমন চাহিদাও শুনেছি যে মজুর-সভা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে। সে যাই হোক—ঐ পনের বছর শ্রমিক-আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলন পাশাপাশি চলতে থাকে। দু'টির মধ্যে আদান-প্রদান চলে। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে আশানুগত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অনুসন্ধানের ফলে চোখে পড়ল একটি মজার ঘটনা। ধনিকশ্রেণী বোম্বাই ও কোলকাতা, নাগপুর ও দিল্লীতে কংগ্রেসকে গ্রেপ্তার করেছে। বাংলা দেশের প্রত্যেকেই ছোট্টখাট্ট জমিদার ও সেইসঙ্গে কেরানী। বাংলায় কংগ্রেস জোর পায়নি—জনসাধারণ, অর্থাৎ কিষাণ-মজুরদের কাছ থেকে। অল্পদিনের মধ্যে কংগ্রেস-আন্দোলনে ভাঁটা পড়ল। দু'টি সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স আন্দোলনই ব্যর্থ হল। দুর্বলতা আবিষ্কারের চিহ্ন গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট।

ঠিক এই সময় দেশের মানসিক আবহাওয়া পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায়। পূর্বোক্ত দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ল। জওহরলালজী এই বিশ্লেষণে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু একটু ভাসা ভাসা ভাবে। তিনি সোশিয়ালিজ্‌মের প্রধান মন্তব্যগুলি তাঁর অনবদ্য ভাষায় জাহির করলেন। কিন্তু তাঁর রচনায় ভেতরের কারণটি ধরা পড়ল না। কংগ্রেস যে স্বদেশী ধনিকতন্ত্রের হাতে আত্মদান করেছে, এবং সেইজন্য যে Civil Disobedience অসার্থক হল—একথা তিনি বলতে সাহস পাননি। সেটা তাঁর ভদ্রতা ও ব্যক্তিগত লয়ালটি। কিন্তু সত্য কথা গোপন রইল না ছেলেদের কাছে। করাচি কংগ্রেস থেকে একাধিক যুবকের কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হল। তাঁরাই এখনকার বামমার্গী, এবং তাঁরাই

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক। এঁদেরই সঙ্গে পুরাতনের ঝগড়া। এঁরাই, অনেকের মতে, দেশের মজ্জাগত গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা সব কিছুই ভাঙতে বসেছেন।

আমি এই আধুনিকদের জানি। বয়সে তাঁরা অনেকেই ছোট। সেটা কিন্তু বড় কথা নয়। বড় কথা হল 'সময়', তার চেয়েও 'কাল'। অবশ্য কালের দর্শন এঁরা জানেন না—সেটা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সেই কালের একটা গুণ অর্থাৎ গতি, যাকে ইতিহাস বলা হয় সেইটাকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছেন। আমাদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য এইখানে—আমরা কালাতিপাত করতাম, এঁরা কালের নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন। সচেতন অর্থে বুদ্ধির খেলা নয়, মোটেই নয়, জীবনের অনুভব। জীবনের প্রধান বিকাশ কর্মে, তাই কর্মজীবনে যে অনুভূতি সম্ভব তারই সাহায্যে এঁরা সচেতন। আমরা চেতনা অর্থে মস্তিষ্কের ক্রীড়া বুঝতাম, এঁরা চেতনা অর্থে কর্মান্তে যে প্রতীতি জমে ওঠে তাই বোঝেন। এটা মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

তারপর উপসিদ্ধান্তগুলি সহজে এসে যায়। বুদ্ধির প্রাধান্য, তার স্বাধীন অস্তিত্ব, তার সর্বকালীন সর্বজনীন আইনকানুন, সেই সঙ্গে বুদ্ধিমানের বিশেষ অধিকার—কোনো কিছুই আর মানা চলে না। তার বদলে স্বীকার করতে হয় ইচ্ছাশক্তিকে, কর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যকে, ঘটনার বিশেষত্বকে, তার পারম্পর্যের দুর্নিবারতাকে, বস্তুজগতের অস্তিত্বকে, তার প্রাথমিকতাকে ; মোটামুটি এই অঙ্গীকার-গুলিই আজকালকার যুবকদের মানসিক প্রতিজ্ঞা। বলা বাহুল্য—আমরা এসব বুঝি না। আমাদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা বুদ্ধির কূটতর্ক তুলি—দর্শনের গলদ দেখাই। তাতে এঁদের কি-ই বা আসে যায়। আমরা আপসোস করেই যাব, এঁরা কাজ করেই যাবেন।

কাজ করতে হলে একলা হয় না। আমরা ভেবেছি একলাই কাজ করা সম্ভব, অবশ্য বড় বড় কাজ। এই সেদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই মনের কথা বললেন, "আর্টিস্ট ভীষণ একাকী"। আর্টিস্ট যেকালে মানুষের মধ্যে দেবতা, তখন সাধারণ বুদ্ধিমানও ভীষণ

নিঃসঙ্গ। কোনো আধুনিক একাকিত্বের সম্মান দিতে পারেন না। তিনি বলেন মাতৃগর্ভেও জীব একলা নয়, মৃত্যুর পরেও মহাত্মাদের সঙ্গ। ইতিমধ্যে মানুষ সামাজিক। কিন্তু সমাজ এক ধাতুর নয়, স্থানু নয়। সমাজ চলে হোঁচট খেতে খেতে ক্ষিদের তাগিদে, সে-তাগিদ মেটাবার প্রক্রিয়ায়। সমাজ এই প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ, যার হাতে ক্রিয়া-পদ্ধতি ন্যস্ত সেই হল নেতা। অতএব সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্কুলের ভালো ছেলে আর মাস্টারের মতন নয়। তাই সমাজের প্রতি কর্তব্য হচ্ছে তাকে নতুন করে গড়ে তোলা। এই সৃষ্টিকার্যে যতটা জ্ঞানের প্রয়োজন ততটা নব্যতান্ত্রিক স্বীকার করেন। তারপর? দেখা যাবে। আমাদের সমাজ ছিল যেন একটা বন্ধ দরজা, যার বিপক্ষে আমরা মাথা খুঁড়তাম। আমাদের বিরোধ ছিল প্রতিরোধ। দরজা খুললেই আমরা স্বর্গরাজ্য পাব, তারপর কি মজা! যা কিছু কষ্ট এই ঠেলাঠেলিতে। আজকালকার ছেলেরা বিরোধ অর্থে versus বোঝেন না, ক্রমবর্ধমান পরিক্রমায় বিরোধের পরিধি ও গুণ বেড়ে চলেছে। তাই এঁদের মুখে চোখে, মনে কাজে শান্তি নেই। ভাববিলাসের সময় নেই এঁদের, গরীব দুঃখী খেতে পাচ্ছে না বলে নয়, (আমিও গায়ের শাল এক খোঁড়াকে দিয়েছি), বিরোধের অবসান নেই এই জ্ঞানে। বাড়িতে বাপমা, স্কুলে মাস্টারমশাই, কলেজে অধ্যক্ষ, বাইরে ধনিক, জমিদার, গভর্নমেণ্ট, সমাজে পণ্ডিতমশাই ও বৃদ্ধের দল। শান্তি কোথায়? তাই এঁরা বলেন শান্তি স্বার্থান্ধের আবিষ্কার।

এই মনোভঙ্গীতে যে যুক্তি আছে সেটা প্লেটোর নয়, অ্যারিস্টটলের নয়। নীচে থেকে এই যুক্তি ওপরে ওঠে প্রতিপদে ঘটনাকে শ্রদ্ধা জানাতে জানাতে। চোখ খুললেই দেখা যাচ্ছে—সব মানুষ সমান অবস্থার নয়, কারুর সুবিধা আছে, কারুর নেই, কেউ বাপের কিংবা শ্বশুরের জোরে খায়, কেউ নিজের জোরেও দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। কেবল চাকরির সুযোগ নয়, ক্ষিদে মেটাবার সাধারণ অধিকার এক শ্রেণীর আছে, অন্য শ্রেণীর নেই। এসব প্রত্যক্ষ ঘটনা, যাদের

দেখে চোখ ফেরানো অন্ধের চিহ্ন। আমরা কিন্তু এদের রাজপথে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতন দেখতাম। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপরে যুবকদের যুক্তি গড়ে ওঠে। এইটাই মুখ্য, মানসিক বিচার গৌণ। আমাদের ছিল বিপরীত। অবরোহী যুক্তিতে প্রত্যক্ষটা ব্যতিরেক বড় জোর।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের যা ছিল তা এঁদের নেই। কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীই পৃথক। অতএব অভাব-আপসোসের কথা ওঠেই না। অতএব পার্থক্যটা সত্যই আছে। এখন প্রশ্ন তার মূল্য কতটুকু।

মূল্যবিচারে নিজেকে সামলাতে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। একেবারে বাদ দিলেই ভালো হয়, তবে সেটা একপ্রকার অসম্ভব। মূল্যবিচারের তত্ত্ব নিয়ে আমি ২।৩ বছর নষ্ট করেছি, কোনো কূল-কিনারা পাইনি। পণ্ডিতের মতামত সব ভুলে যেটুকু থিতিয়েছে সেটা কিম্ভূতকিমাকারের। তার মোদ্দা কথা এই: চিরন্তন মূল্য নেই, সেটা ঘুরতে ঘুরতে ওপরে ওঠে কিংবা নীচে নামে। উন্নতি-অবনতি আদর্শ অনুসারে, আদর্শও স্থির নয়। তবে গতির একটা মোটামুটি নিয়ম আছে, সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও। যে-ঘটনা গতিরোধ করে, যে-গতি প্রধান গতিপথের বাধা সৃষ্টি করে সে-ঘটনা ও সে-গতির মূল্য কম। অতএব আপেক্ষিকতার দিক থেকে পার্থক্যের মূল্যবিচার করতে হবে। বুদ্ধির বিচারে আধুনিক কর্মবাদ প্রভৃতি টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিবাদী নন তাঁদের কি ক্ষতি? মহা মহা অর্থশাস্ত্রবিদ্ যাঁদের মতামত না জানলে আধুনিক পণ্ডিত হওয়া যায় না, তাঁরা তর্ক করে বলে দিয়েছেন planning, collective economy হয় না, কারণ দামের হিসেবে বাধে। এ-ধারে হয়ে গেল প্ল্যানিং, সব কিছু। অতএব যাঁরা বুদ্ধিবাদী না হয়েও বুদ্ধিমান তাঁদের তরফ থেকেই তাঁদের ও আমাদের পার্থক্যের মূল্যবিচার করতে হবে।

এধারে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেল। তাই তাড়াতাড়ি শেষ করি। পার্থক্যের মূল্য খুবই বেশী। কারণ এর জন্য আমরা বাধা সৃষ্টি করছি

ও তাঁরাই বাধা বোধ করছেন। দু'টি মাত্র উপায় আছে—এক, আমাদের আত্মহত্যা, আরেক, তাঁদের আরো অগ্রসর হওয়া। তাঁদের অসম্পূর্ণতা যেদিন ঘুচবে সেদিনই আমরা হব অবান্তর। কল্পনা খাটিয়ে কিভাবে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন বাতলাতে পারি। নিশ্চয় ঠিক হবে না, হতে পারে না। বন্ধু আশা করি প্রবন্ধের এই অংশটুকু পড়বেন না। প্রয়োজন নেই, কারণ আমার সমালোচনা তাঁর সম্বন্ধে খাটে না। ধারাবাহিকভাবে আমার বক্তব্য সাজাচ্ছি।

(১) ধরা যাক্ বুদ্ধিটা সর্বস্ব নয়, কিন্তু ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য অন্য কোনো শক্তি অমন কার্যকারী নয়। ইতিহাস তৈরি করবার জন্য ব্রজেন্দ্র শীল না হলেও চলে, আবার নব্য নৈয়ায়িকও অবান্তর, কিন্তু ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্, ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্, ফিউড্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতি ধরতাই বুলিতে কি মাথা ঘুলিয়ে যায় না? ওগুলো প্রায় 'হিং টিং ছট'এ-র মতন হয়ে উঠেছে। ঐগুলোর কি প্রকৃতি এক? ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ধনতন্ত্র কি একপ্রকার সমাজ তৈরি করে? মধ্য-য়ুরোপের ফিউ-ড্যালিজ্‌ম্ আর রুশিয়া ও ভারতের ফিউড্যালিজ্‌মের মধ্যে তফাৎ কি ও কতটুকু? রোমের সাম্রাজ্যবাদ আর এখনকার সাম্রাজ্যবাদ কি এক ধাতুর? মোটামুটি এক জানি। সে হিসেবে আমরা সবাই জানোয়ার। একটু কোথায় গরমিল আছে, সেটার জন্য সমাজগঠনও এক ছাঁচের হয় না। কতকটা জোর দিয়ে এই বিশেষত্বকে ইতিহাসের নিয়মে ফেলা যায় এ-জ্ঞানটুকু না থাকলে যুবকরাই বিপদে পড়বেন—তাঁদের কাজেরই অসুবিধা হবে। যদি তাঁরা আরো একটু বেশী বিশ্লেষণ করেন তবে তাঁরা বুদ্ধিসর্বস্ব হয়ে পড়বেন না নিশ্চয়, আরোহী যুক্তি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। আমার সন্দেহ হয়েছে যতটা inductive, history-minded ও বৈজ্ঞানিক নতুনত্ব তাঁদের কাছে দাবি করে ততটা তাঁরা মেটাতে পারছেন না। এটা ইচ্ছা করলেই পারা যায় কিন্তু। আমরা পারিনি, আমাদের দৃষ্টি ওধারে যায়নি, এঁরা পারছেন না, দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়। চোখ ভালো হলে যে চরিত্রহানি হয় তা বোধ হয় ঠিক নয়।

(২) স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মনে হয় যুবকদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট। স্বাধীনতা বলতে আমরা ডাইসী সাহেবের পুস্তকে যা লেখা আছে তাই বুঝতাম—অর্থাৎ নড়ে চড়ে বেড়াবার, যা-তা কথা কইবার, যার-তার সঙ্গে মেশবার, যা-ইচ্ছে বেচা-কেনার স্বাধীনতার যোগফল। আমার সন্দেহ হয়েছে যে এর বড় বেশী ধারণা এখনও জন্মায়নি। মোদ্দা কথা এই—স্বাধীনতা সাম্যবাদের লেজুড় তখনও ছিল এখনও আছে। মৈত্রীর ভাবটা এখনও সুদৃঢ় হয়নি। হলে স্বাধীনতার বনাম-ভাবটা কেটে যাবে। সেজন্য সভা সমিতি ধর্মঘট অনেক সব হচ্ছে, কিন্তু সেই মেকানিক্যাল ধরনে। নচেৎ এখনও প্রেমের কবিতা কাগজে বেরোয়। নভেলে নায়ক ভিনজাতের মেয়েকে বিবাহ করতে ক্ষেপে ওঠে। গলায় দড়ি! অবশ্য আমরা যা করতাম তার চেয়ে এঁরা শতগুণে পুরুষ। এঁরা বাঁচবার স্বাধীনতাও চান। দুঃখ এই, ভুলে যান যে ওঁরা না বাঁচলে আমরা বাঁচি না। বিশ্বাসটা মজ্জায় প্রবেশ করেনি—তাই এই রসগোল্লা মার্কা সাহিত্য। তাই বাধ্য হয়ে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্র দত্ত কড়াপাকের কবিতা লেখে। সুধীন্দ্র জানে যে তার নিজের বাঁচা-মরা চেকোস্লোভাকিয়ার ইতিহাসের ওপরও নির্ভর করে। বিষ্ণু অতটা জানে না, যতটুকু জানে তাতেই সে সঙ্কুচিত হয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে আঘাত করে, অভিমানীর মতন। দু'জনেই পরাধীন, তাই মৈত্রী-বন্ধনে স্বাধীন হতে চায়। অবশ্য স্বাধীন হতে পারলে না কেউই। তবে সুধীন্দ্র পথটা জানে। আমাদের সময় এই প্রকার দাম্ভিক কবিতা অসম্ভব ছিল। প্রসারের দম্ভ আমরা জানতাম না। কিন্তু সুধীন্দ্রের পর! মৈত্রী কোথায়? মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে!

ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মেয়েরা যেমন বলেন, "বেশ তোমরা খুব ভালো, আমরা খুব খারাপ, এই তো! আচ্ছা, দেখা যাবে!" এই বলেই প্রবন্ধ শেষ করি।

॥ পরিচয় ॥ ॥ পৌষ ॥ ॥ ১৩৪৫ ॥